আঁধার রাতের বন্দিনী

আমীরুল ইসলাম

আঁধার রাতের বন্দিনী-১

১

রচনা

আমীরুল ইসলাম

সম্পাদনা

মুহাম্মদ মুহিউদ্দীন

প্রকাশনায়

নাঈমা প্রকাশনী

আরও পিডিএফ বই পেতে ভিজিট করুন
www.pdfislamibook.blogspot.com

আঁধার রাতের বন্দিনী-১

রচনা
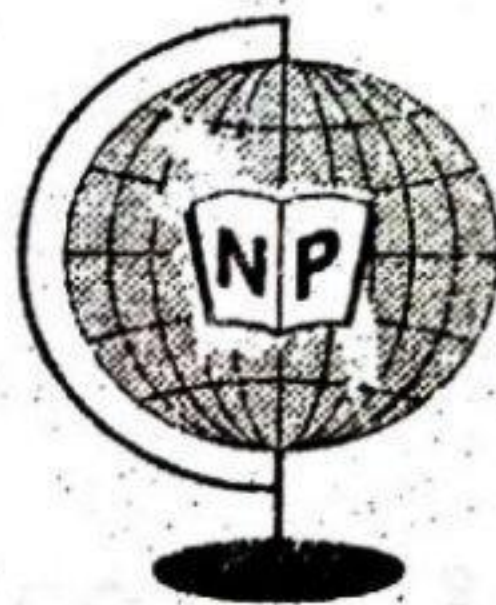
আমীরুল ইসলাম

সম্পাদনা

মুহাম্মদ মুহিউদ্দীন

প্রকাশনায়

নাঈমা প্রকাশনী

বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রথম প্রকাশ

সেপ্টেম্বর ২০০২

দ্বিতীয় প্রকাশ

মার্চ ২০০৩

তৃতীয় প্রকাশ

জুন ২০০৬

কম্পিউটার কম্পোজ

মুজাহিদ গওহার

জি, গ্রাফ কম্পিউটার

গ্রাফিক্স

মোঃ আজাদ

মুদ্রণ

কালার সিটি

মূল্য ঃ ১৭০.০০ টাকা মাত্র।

একশত সত্তর টাকা মাত্র।
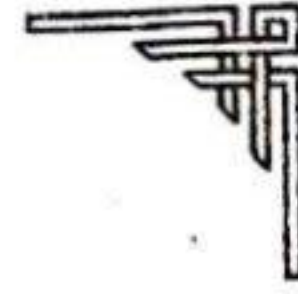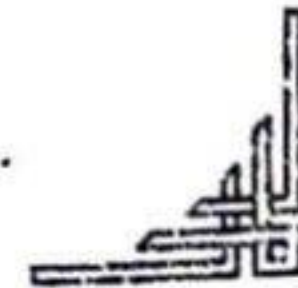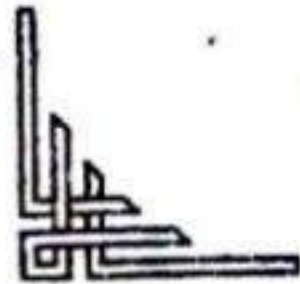
নযরানা

তাদের তরে–

যাদের তপ্ত শোণিত ধারায়

জ্বালিয়েছে দ্বীনের বাতি,

তাদেরই স্মরণে কাঁদিছে ভূবন

ফুঁপিয়ে দিবস রাতি।

ওদেরই পথে চলতে যারা

জোট বেঁধেছে আজ,

বলছি ওদের সাবাস বন্ধু

ভয় নেই, নেই লাজ।

ভূমিকা

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য, যিনি আমাদেরকে তার সত্য ধর্ম ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় দান করেছেন। তিনি একমাত্র মাবুদ। তিনি ব্যতীত অন্য কেউ উপাসনার উপযুক্ত নন। তিনি আমাদেরকে দান করেছেন হেদায়াতের জন্য পবিত্র কুরআন।

রহমত ও পরিপূর্ণ শান্তি বর্ষিত হোক হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উপর, যিনি জীবনের ২৩টি বছর দুনিয়াতে অক্লান্ত পরিশ্রম করে কাফির, মুশরিক আর বেঈমানদের নির্যাতন-নিপীড়ন বরদাশত করে আরবের বর্বর জাতিকে আল্লাহর দ্বীন শিখিয়েছেন। শিখিয়েছেন সভ্যতা, মানবতা, উদারতা ও সহনশীলতা। যিনি ছিলেন সর্বকালের, সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব ও সর্বশ্রেষ্ঠ সমরবিদ। আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য তাঁকে তাঁর প্রাণপ্রিয় সাহাবায়ে কেরামসহ সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হয়েছে। যিনি তার জীবনে ২৭টি যুদ্ধে ফিল্ডমার্শাল (কমান্ডার ইন চীফ) হিসেবে যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন।

অফুরন্ত শান্তি বর্ষিত হোক তার পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন ও সাহাবাগণের উপর এবং সমস্ত উম্মতের উপর।

পৃথিবী নামক গ্রহের উত্তর সীমান্তে রাশিয়া নামক দেশে (সোভিয়েত ইউনিয়ন) লেনিন নামক এক ফেরাউনের আবির্ভাব ঘটে। ১৯১৭ সালের নবেম্বর মাসে লেনিন 'কেউ খাবে কেউ খাবে না; তা হবে না, তা হবে না' এই মুখরোচক স্লোগানটি নিয়ে রাজনীতিতে আত্মপ্রকাশ করেন। তার যাদুময় স্লোগানের গভীর রাগিনীতে গরীব শ্রেণীর মানুষেরা সুর মিলিয়ে গান ধরে।

এবার তার কণ্ঠে ২য় স্লোগান ধ্বনিত হল– 'দুনিয়ার মজদুর এক হও'। এ স্লোগানের মূর্ছনায় শ্রমিকগণ নাচতে আরম্ভ করল। ওরা ভেবেছিল, ধনী আর গরীব সবাইকে করে দেবে এক সমান। কেউ আর গরীব থাকবে না, ফলে সমাজে হানাহানির অবসান ঘটবে। ফিরে আসবে শান্তির মহাপ্লাবন।

লেনিন তার কমিউনিজম মতাদর্শের প্রসার করতে গিয়ে আমাদের মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর দেয়া রাজনীতি, সমাজনীতি ও অর্থনীতি বাদ দিয়ে সমাজতন্ত্র নামক মতবাদ প্রতর্বন করেন। পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর পরিপন্থী শাসন ব্যবস্থা চালু করেন।

যারা একত্ববাদে বিশ্বাসী, দ্বীনদার, পরহেজগার, ইসলামের অনুরাগী, তারা কমিউনিজমকে অর্থাৎ সমাজতন্ত্রকে মেনে নিতে পারেননি। কারণ, ইসলাম আর কমিউনিজমের মধ্যে রয়েছে আপোসহীন সংঘাত। তারা এ কুফরী মতবাদ মানতে পারেননি বিধায় তাদের উপর নেমে আসে জুলুম-নির্যাতন, নিপীড়ন ও উৎপীড়নের স্টীমরোলার। এ অবর্ণনীয় নির্যাতন থেকে দেশ, জাতি ও মুসলমানদেরকে মুক্ত করতে, দ্বীনকে দুনিয়াতে গালিব করতে যারা সশস্ত্র জেহাদে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, তাদের মধ্যে হযরত আনোয়ার পাশা শহীদ (রহঃ)-এর নাম সর্ব শীর্ষে। এছাড়া আরো যারা জিহাদী পরচম উড্ডীন করেছিলেন, তাদের মধ্যে বীরাঙ্গনা ছায়েমা মালাকানী ও খোবায়েব জামবুলীর নাম স্মরণীয়। তাদের বীরত্ব-গাঁথা আজ ইতিহাসের পাতা থেকে খসে পড়েছে।

বীরাঙ্গনা ছায়েমা মালাকানী ও খোবায়েব জামবুলীর বীরত্বের কাহিনী ও খোদায়ী মদদ নিয়েই 'আঁধার রাতের বন্দিনী' নামক এই উপন্যাসের সৃষ্টি। উপন্যাসটি শুধু উপন্যাস-ই নয়, এর মধ্যে রয়েছে পবিত্র কুরআন-হাদীসের আলোকে জিহাদের জরুরী মাসআলা-মাসায়েল ও কলাকৌশলেরও বর্ণনা।

বইটি পাঠ করে যদি মুসলিম সমাজে জিহাদের অনুপ্রেরণা সঞ্চার হয়, তবে আমাদের প্রচেষ্টাকে স্বার্থক বলে মনে করব। আমরা এ বইখানা ত্রুটিমুক্ত রাখার চেষ্টা করেছি। তারপরও যদি কোন স্থানে কোন ভুল পরিলক্ষিত হয়, তবে অবগত করলে চিরদিন কৃতজ্ঞতাপার্শ্বে আবদ্ধ থাকব।

এই বইটি প্রকাশ করতে যারা আমাকে সহযোগিতাদান করেছেন, আল্লাহ তাদেরকে প্রতিদানে ধন্য করুক।

হে আল্লাহ! এই গ্রন্থটিকে কবুল কর এবং একে নাজাতের উছিলা বানাও। আমীন।

বিনীত

আমীরুল ইসলাম

[এক]

অন্যদিনের মত আজও গোসল ও খানাপিনা সেরে কিতাবাদী-খাতা-কলম নিয়ে ছাত্রাবাস হতে ক্লাসরুমে প্রবেশ করি। ক্লাস শুরুর আর মাত্র পাঁচ মিনিট বাকি। ছাত্ররা নিজ নিজ আসনে বসে হুজুর আগমনের পথ-পানে অধীর আগ্রহে চেয়ে আছে। দপ্তরী তৃতীয় তলায় ঝুলান ঘন্টায় দশটি আঘাত হানার সাথে সাথে প্রথম প্রিয়ডের হুজুর ক্লাসে আসবেন। কিন্তু আজ অন্যদিনের মত ঘন্টাধ্বনি শোনা যায়নি। এল পাগলা ঘন্টার বিপদধ্বনি। পাগলা ঘন্টা শোনার সাথে সাথে ছাত্ররা যার যার কিতাবাদী যথাস্থানে রেখে দিয়ে ছুটল মসজিদপানে। এক এক করে অল্পক্ষণের মধ্যেই মসজিদটি কানায় কানায় ভরে গেল। এখন কেউ আর রুমে নেই, নেই আঙ্গিনায়।

বড় হুজুর মলিনমুখে মিম্বরের হাতলে হাত রেখে আমাদের দিকে ফিরে দাঁড়ালেন। তার চোখ দু'টি লাল, অশ্রুভেজা। তিনি ক্ষীণ আওয়াজে ভাঙ্গা ভাঙ্গা সুরে বললেন, "বাবারা! দরূদ-এস্তেগফার পড়ে খুব বিনয়ের সাথে একাগ্রচিত্তে দোয়ায়ে ইউনুস পাঠ কর। দেশের পরিস্থিতি খুবই ভয়াবহ।"

আমরা নিয়মানুযায়ী দরূদ-এস্তেগফার পড়ে গুন্ গুন্ শব্দে 'লা ইলাহা ইল্লা আন্তা সুব্হানাকা ইন্নী কুন্তু মিনায যোয়ালিমীন' পড়তে লাগলাম। এক ঘন্টা অতিবাহিত হওয়ার পর হিসাব করে দেখা গেল, সোয়া লাখেরও অধিক পড়া হয়েছে। বড় হুজুর আবার উচ্চস্বরে দরূদ-এস্তেগফার পড়ে আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি আরম্ভ করে দিলেন। 'আমীন! আমীন!' রবে মসজিদ প্রকম্পিত হয়ে উঠল।

দীর্ঘ মুনাজাত শেষে বড় হুজুর মিম্বরে দাঁড়িয়ে বললেন, "হে আমার আজীজ তালাবা ও সহকারী আসাতিজাবৃন্দ! সমরকন্দের জামে মসজিদের খতীবসহ দশ-বারজন আলেমকে কমিউনিস্টরা ধরে নিয়ে এক জায়গায় বিবস্ত্র করে ব্রাশফায়ারে শহীদ করে দিয়েছে।" শুনে শত

শত ছাত্রের জবান থেকে 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' বেরিয়ে এল। হুজুর আরো বললেন, "ওরা শহরের বড় বড় বেশ কয়েকটি মাদ্রাসার ওস্তাদ-ছাত্রদেরকে ধরে নিয়ে গেছে। তাদেরকে কোথায় কিভাবে রেখেছে, তার সন্ধান আজও মেলেনি। আমাদের মাদ্রাসাসহ আরো কয়েকটি মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষকদের নামও তালিকাভুক্ত করেছে। কম্বিং অপারেশন চালিয়ে দু'-একদিনের মধ্যে আমাদেরকেও ধরে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা চলছে। থানার একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার মাধ্যমে আমি এ সংবাদ পেয়েছি। তাই আজ থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য মাদ্রাসা বন্ধ ঘোষণা করা হল। তোমরা নিজ নিজ দায়িত্বে ছামানাপত্র নিয়ে অল্প সময়ের মধ্যে মাদ্রাসা ত্যাগ কর। দ্বিতীয় নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত নিজ নিজ বাড়ীতে অবস্থান করতে থাক আর খুব বেশী বেশী দোআ করতে থাক।"

এতটুকু বলতে না বলতে বড় হুজুর অবোধ বালকের ন্যায় হাউ-মাউ করে কেঁদে ফেললেন। সবার চোখে পানি, সকলের চেহারায় মলিনতার ছাপ।

ঠিক এই মুহূর্তে অচেনা এক যুবক জুতা পায়ে পবিত্র মসজিদে ঢুকল। পরনে তার হাফপ্যান্ট, গায়ে হাফশার্ট, বুকে লাগান কাস্তে-হাতুড়ি মার্কা স্টিকার। মোটা মোটা গোঁফ, চোখ দু'টি টকটকে লাল, হাতে হ্যান্ডমাইক। কটিদেশে ঝুলান ইয়া বড় খঞ্জর। দেখলেই মনে হয়, সে যেন নরখাদক-জল্লাদ। মসজিদে প্রবেশ করেই হ্যান্ড মাইকটি অন্ করে তেজোদ্দীপ্ত কণ্ঠে বলতে শুরু করল, "হে এদেশের আবর্জনা-জঞ্জাল মৌলবাদী ও রুহানীরা! আমাদের চরম ও পরম মুক্তিদাতা লেনিনের আদর্শ গ্রহণ কর। তবেই তোমরা পরম সুখে এদেশে বসবাস করতে পারবে। এখন আর মরুদেশের ধর্ম, মোহাম্মদের ধর্ম এদেশে চলবে না। মিস্টার লেনিন, স্টালিন আর কার্ল মার্কসের মতবাদ, চিন্তা ও আদর্শ ছাড়া অন্যসব মতবাদ অচল। কেউ যদি এর বিরোধিতা কর, তবে তার পরিণাম হবে খুবই ভয়াবহ।"

যুবকটি এ কথাগুলো বলল সমরকন্দের ঐতিহ্যবাহী বিদ্যাপীঠ জামিয়া আরাবিয়ার শাহী মসজিদে দাঁড়িয়ে কয়েক ডজন ওস্তাদ ও শত শত ছাত্রের সম্মুখে। কেউ মাথা উঁচিয়ে বুক ফুলিয়ে চোখ রাঙ্গিয়ে

পাপিষ্ঠ যুবকের কথার উত্তর দিতে হিম্মত পেলেন না। হিম্মত হল না প্রতিবাদ জানানোর। তার বক্তৃতার জবাব দেয়ার জন্য আমি অগ্নিশর্মা হয়ে দাঁড়াতে চাইলাম, কিন্তু পাশের ছাত্রদের বাধার কারণে তা পারলামনা। খুব কষ্ট করেই হজম করতে হল সে দৃশ্য। যুবকটি বিনা বাধায়, বিনা প্রতিরোধে যাতে বলে নিরাপদে মসজিদ ত্যাগ করল।

ওস্তাদ-ছাত্ররা নিঃশব্দে যার যার রুমের দিকে মন্থর গতিতে অগ্রসর হতে লাগল। কারো মুখে হাসি নেই, ভাষা নেই; আছে শুধু আঁখি-ভরা পানি। মুহূর্তের মধ্যে কে যেন হৃদয়ের আনন্দ কেড়ে নিয়ে গেল। নিয়ে গেল গালভরা হাসি আর কিতাব পড়ার গুন্ গুন্ রব। মাঝে-মধ্যে দু'-একজন ছাত্র অবুঝ মনকে বুঝ মানাতে ব্যর্থ হয়ে হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে। একে অপরের দিকে অপলক নেত্রে তাকিয়ে কি যেন অবলোকন করছিল। সেই করুণ দৃশ্য আমি আজও ভুলতে পারিনি।

সকলেই যার যার রুমে প্রবেশ করে নিজ নিজ কিতাবাদী ও কাঁথা-বালিশ গুছিয়ে গাট্টি তৈরীর কাছে ব্যস্ত। আমি সবগুলো রুম ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম। অল্পক্ষণের মধ্যে ছাত্ররা নিজ নিজ ছামানা কাঁধে বা মাথায় বহন করে চোখের পানিতে আলবিদা জানিয়ে গৃহাভিমুখে যাত্রা করল।

আমার সেদিন আর বাড়ী যাওয়ার সুযোগ হল না। কারণ, সমরকন্দ থেকে জামবুল বহু দূরের পথ। রেলগাড়ীতেও দু'-তিনদিন সময় লেগে যায়। তাই পরদিন সকাল সাতটার ট্রেনে যাবার মনস্থির করলাম। দিনের সূর্য্য ক্রমশই পশ্চিমাকাশে পালাবার রাস্তা খুঁজছে। সমস্ত মাদ্রাসায় আমার মতো হতভাগা সাত-আটজন ছাড়া আর কোন ছাত্র নেই। আর আছেন দু'তিনজন ওস্তাদ।

দারে জাদীদের বাগানের কোলঘেঁষে আমি যখন পশ্চিমদিকে যাচ্ছিলাম, তখন আমার ওস্তাদ জালাল উদ্দিন বুখারী আমাকে হাতের ইশারায় ডাকলেন। আমি তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে আস্‌সালামু আলাইকুম বলে তার পাশে দাঁড়ালাম। ডাকার কারণ জিজ্ঞাসার পরিবর্তে আমার হৃদয়ের গভীর থেকে অবোধ বালকের ন্যায় কান্নার রোল বেরিয়ে এল। হুজুর আমার মনের ভাব বুঝতে পেরে আমাকে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করলেন। তিনি ভাঙ্গা ভাঙ্গা কণ্ঠে বললেন, "বাবা! আল্লাহ জানেন কোন্ মুহূর্তে কি ঘটে যায়। জানিনা এটাই জীবনের শেষ

মুলাকাত কিনা। ইসলামের এ চরম দুর্দিনে মুসলমানদের বিশেষ করে আলেম-ওলামাদের কি অবস্থা হয়?" তিনি এক পর্যায়ে নিজেকে সামলাতে না পেরে উচ্চস্বরে কেঁদে ফেললেন। তারপর আত্মসংবরণ করে বললেন, "গত তিনদিন আগে বুখারা থেকে বেশ কয়েকজন নামকরা আলেমকে বলসেভিকরা ধরে নিয়ে সাইবেরীয়ার তুষারাঞ্চলে প্রেরণ করেছে। সেখানে শুধু বরফ আর বরফ, জনমানবের চিহ্নমাত্র নেই।" তারপর আমার মাথায় তার পবিত্র হাত বুলাতে বুলাতে বললেন, "বাবা! মাদ্রাসায় বেশী সময় অবস্থান করো না, বাড়ী ফিরে যাও। কিতাবাদী যতটুকু পড়া হয়েছে, তা মুতালাআ কর। আর আল্লাহর নিকট বেশী বেশী দোয়া করতে থাক।"

এই উপদেশগুলো দিয়ে তিনি তার রুমে চলে গেলেন। আমি আবার পূর্বের ন্যায় প্রতিটি রুম ঘুরে-ফিরে দেখছিলাম। হায়! যেখানে সকাল-সন্ধ্যা, ভোর-বিহানে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের গুন্ গুন্ রবে জামেয়ার আকাশ-বাতাস মুখরিত থাকত, রুমে রুমে চলত বিভিন্ন বিষয়ের কিতাবাদীর তাকরার; সেখানে আজ বিরাজ করছে নীরবতা, নিস্তব্ধতা ও খাঁ খাঁ পরিবেশ। মসজিদ-মাদ্রাসার আকাশচুম্বি ইমারতগুলো যেন স্বজনহারার বিরহ বেদনায় আর্তনাদ করছে। এমন এক করুণ দৃশ্য অবলোকন করা আমার পক্ষে একেবারে অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল, যা আমি কোনদিন ভাবতেও পারিনি। তাই আমিও রুমাল অশ্রুসিক্ত করতে করতে নিজ কক্ষে ফিরে এলাম। এমনি এক অবর্ণনীয় বেদনা বক্ষে ধারণ করে ছটফট করে রজনী পোহালাম।

[দুই]

ফজরের নামায আদায় করে রুমে গিয়ে ছামানাপত্র গুছিয়ে টাঙ্গায় চড়ে সকাল সাতটা বাজার বিশ মিনিট আগেই রেল স্টেশনে পৌছলাম। মাদ্রাসা থেকে বেরিয়ে আসা আমার জীবনের এক বেদনাদায়ক অধ্যায়। অশ্রুসজল নয়নে মাদ্রাসার দিকে তাকিয়ে শেষবারের মতো নেত্রযুগলের তপ্ত অশ্রু উপহার দিয়ে বেরিয়ে আসলাম। স্টেশনে এসে জামবুলের টিকিট সংগ্রহ করে ট্রেনের অপেক্ষায় একটি বেঞ্চে বসলাম। অন্যদিনের মতো স্টেশনে তেমন লোকজন নেই। কেমন যেন একটা নীরবতা-নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে।

ট্রেন সকাল সাতটায় স্টেশনে আসার কথা থাকলেও দু'ঘন্টা বিলম্বে এসে দাঁড়াল। আমি আমার ছামানাপত্র নিয়ে একটা সীট দখল করে বসলাম। আমার পাশের সীটে দু'তিনজন হুজুর উপবিষ্ট। সামনের সীটে কয়েকজন যুবক বসে সিগারেট টানছে। মাত্র কয়েক মিনিট পর গার্ড বাঁশি বাজিয়ে সবুজ নিশান নাড়তে লাগল। গাড়ীটি প্রলয় শিংগা ফুঁকিয়ে সবগুলো চাকা একযোগে গড়িয়ে গড়িয়ে চিরচেনা পথে এগিয়ে চলল। বন-বাদার, মাঠ-ঘাট পেরিয়ে গন্তব্যের উদ্দেশ্যে পাগলের মতো ছুটে চলছে। দু'চারটি স্টেশন পেরিয়ে ট্রেন বড় একটি স্টেশনে এসে দাঁড়াল।

ট্রেনটি দাঁড়ানোর সাথে সাথে কমিউনিস্ট যুবকরা প্রতিটি কম্পার্টমেন্টে গিয়ে তল্লাশি চালায়। দাড়ি-টুপিওয়ালা হুজুর বা মাদ্রাসা ছাত্র পেলে ধরে নিয়ে যায়। সারাটা ট্রেনে এক আতংক বিরাজ করছিল। ট্রেনটি প্রতিটি স্টেশনে ত্রিশ-চল্লিশ মিনিট করে বিলম্ব করছে। আমার সামনের সীটের বখাটে যুবকরা আমার পাশের হুজুরদেরকে 'মৌলবাদী-রুহানী' শব্দ প্রয়োগের মাধ্যমে ব্যঙ্গ করতে লাগল। কেউ বলছে, "ও মোল্লা! এত বড় দাড়ি দিয়ে কি কর? দাড়ির সেবা-যত্ন করতে যে তৈল ব্যবহার কর, তা কোথায় পাও?" আবার কেউ বলছে, "বাপরে বাপ, এত বড় জামা! মোল্লারাই কাপড়ের দর বাড়াচ্ছে।" এ ধরনের নানা ব্যাঙ্গাত্মক কথা ও অট্টহাসিতে কম্পার্টমেন্ট প্রকম্পিত।

আমি হুজুরদের জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা কোথায় যাবেন? হুজুর উত্তর দিলেন, ছামারগান।

ছামারগান এখনো বহুদূর। সবটুকু পথ পাড়ি দেয়া দুরূহ। তাই হুজুরগণ পরস্পর পরামর্শ করে সামনের স্টেশনে নেমে অন্য উপায়ে বা পদব্রজে বাকি পথ অতিক্রম করার সিদ্ধান্ত নিলেন। তারা আমাকেও পরামর্শ দিলেন, "বাবা! অবস্থা খুব সঙ্গীন, তুমিও রেলপথে না গিয়ে অন্য পথ তালাশ কর।"

আমি উত্তর দিলাম, "হুজুর, তাকদীরে যা আছে, তা-ই হবে, এর বেশী কিছু নয়।" এসব আলাপ করতে করতে ট্রেনটি উলিশিয়ান স্টেশনে এসে দাঁড়াল। সাথে সাথে হুজুরগণ ঝটপট ট্রেন থেকে নেমে পড়লেন। আমি আল্লাহর উপর ভরসা করে একাকী বসে রইলাম।

রাত এগারটা। পেটে ক্ষুধার অনল দাউ দাউ করে জ্বলছে। ক্ষুধার

তাড়না সইতে না পেরে একপা-দু'পা করে কম্পার্টমেন্টের পর কম্পার্টমেন্ট পার হয়ে কেন্টিনে গেলাম। আমি মেসিয়ার থেকে খাবার এবং কোন্‌টার দাম কত জেনে নিলাম। তারপর হাত-মুখ ধুয়ে ডাইনিং টেবিলে গিয়ে বসলাম। মেসিয়ার এসে কি খাব জিজ্ঞেস করল। আমি বললাম, ভাই আমি তো মুসাফির, যেতে হবে বহুদূর, অর্থকড়িও তেমন নেই। কাজেই অল্প পয়সার মধ্যে সামান্য কিছু খানা দাও।

মেসিয়ার চার আনা দামের দু'টি রুটি আর চার আনা দামের একটি গোস্তের কাবাব, মোট আট আনার খাবার পরিবেশন করল। আমি বিস্‌মিল্লাহি ওয়া আলা বারাকাতিল্লাহ বলে খেতে লাগলাম। এগুলো খেতে না খেতে মেসিয়ার আরো কিছু খাবার এনে বলল, "এসব খাবারও আপনার জন্য, এগুলোও খেয়ে নিন।" আমি বললাম, না ভাই, আমার কাছে এত পয়সা হবে না। মেসিয়ার বলল, "আপনাকে পয়সা দিতে হবে না। আপনার পাশে যে ভদ্রলোকটি বসে খানা খাচ্ছিলেন, উনি পয়সা পরিশোধ করে দিয়ে বলে গেছেন আপনাকে এসব দিতে।"

আমি অনেক ভেবে-চিন্তে সবগুলো খানা খেয়ে নিলাম। খানা খেয়ে কম্পার্টমেন্টে আসার পথে এক ভদ্রলোক আমাকে ডাকলেন। আমি ঘাড় ফিরিয়ে দেখি, খাবার গাড়ীর সেই ভদ্রলোক। আমি একটু এগিয়ে গিয়ে সালাম-মুসাফাহা করে জিজ্ঞেস করলাম, জনাব! আমাকে ডাকছেন কেন?

ভদ্রলোকটি তার স্নেহমাখা হাতটি আমার মাথায় বুলিয়ে হাসিমুখে জিজ্ঞেস করলেন, বাবা! তুমি কোথায় যাবে?

বললাম, জামবুল।

তোমার সাথে আর কেউ আছেন?

বললাম, কেউ নেই, আমি একা।

বাবা! জামবুল তো বহুদূর। দু'তিন দিনের পথ। কোথা থেকে এলে?

বললাম, সমরকন্দ থেকে।

সেখানে কি কর তুমি?

বললাম, লেখাপড়া করি।

এতসব প্রশ্ন করার পরও ভদ্রলোক আরো কিছু জানতে চাইলেন। আমি এক এক করে তার প্রশ্নের উত্তর দিলাম। এক পর্যায়ে ভদ্রলোক

কাতর স্বরে বললেন, "বাবা! দেশের অবস্থা খুবই নাজুক! আলেম-ওলামা, পীর-মাশায়েখ, দ্বীনদার, পরহেজগার ও মাদ্রাসার ছাত্রদের উপর চলছে বলসেভিকদের জুলুম-নির্যাতন। তুমি একা এতদূর পথ কি করে যাবে? তুমি যে তালেবে এলেম, তা তোমার নূরানী চেহারাই প্রমাণ করছে।" এই বলে তিনি তার ব্যাগ থেকে একটি শার্ট আর একটি প্যান্ট বের করে আমাকে বললেন, "যাও, তোমার পোশাক পাল্টিয়ে এগুলো পরে নাও। তাহলে কেউ তোমাকে মাদ্রাসার ছাত্র বলে সহজে চিনবে না।"

সুন্নতী পোশাক শরীর হতে আলাদা করা আমার পক্ষে ছিল বেদনাদায়ক। তবু মুরুব্বী মানুষ বারবার পীড়াপীড়ি করায় পোশাক পরিবর্তন করতে বাধ্য হলাম। টয়লেটে গিয়ে পোশাক পাল্টিয়ে আসলে ভদ্রলোকটি কাস্তে-হাতুড়ি মার্কা একটি স্টিকার আমার বুকের পকেটে পিন দিয়ে এঁটে দিলেন। অতঃপর কিছু উপদেশ দিয়ে বললেন, "আমি কাজাকিস্তান পর্যন্ত যাব। কোন অসুবিধা হলে আমাকে জানাবে। আর খাওয়া-দাওয়া আমার সাথে করবে। খাওয়ার সময় আমার এখানে চলে আসবে।"

ভদ্রলোকের অমায়িক ব্যবহারে আমি আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ি। বিপদে এমন বন্ধু পাওয়া ক'জনের ভাগ্যে জুটে? তাই আল্লাহর প্রশংসা করতে করতে আমার কম্পার্টমেন্টের সীটে এসে বসলাম। দু'পা সামনে বাড়িয়ে দিয়ে ঘুমের কোলে ঢলে পড়লাম।

ফজরের ওয়াক্ত। গাড়ী আশেকাবাদ স্টেশনে এসে দাঁড়াল। টিটির কাছ থেকে জানতে পারলাম, এখানে মাল উঠানামা হবে। গাড়ী ছাড়তে দেড়-দু'ঘন্টা বিলম্ব করবে। এ সুবাদে মসজিদে গিয়ে নামায পড়ে নেয়া যায়। তাই ট্রেনে থেকে নেমে রেলওয়ে জামে মসজিদের দিকে চললাম। মসজিদে গিয়ে দু'চারজন মুসল্লী ছাড়া আর কোন লোক আশপাশে দৃষ্টিগোচর হল না। ইমাম-মুয়াজ্জিনেরও কোন হদিস নেই।

আযান হয়েছে কিনা, এক মুসল্লীকে জিজ্ঞেস করায় তিনি চুপি চুপি বললেন, "আজ দু'দিন হল এ মসজিদের ইমাম ও মুয়াজ্জিনকে কমিউনিস্টরা মসজিদের ভেতরেই শহীদ করে দিয়েছে। ঘাতকরা লেনিনের প্রাইভেট গুন্ডাবাহিনী।

শহীদের তাজা খুনে এখনো মসজিদ সিক্ত। আজান, ইকামত,

জামাত সবই বন্ধ হয়ে গেছে। মুসল্লীরাও আসে না। অগত্যা আমি নিজেই আযান দিয়ে বারান্দায় সুন্নত পড়তে দাঁড়িয়ে গেলাম। আমার দেখাদেখি আরো তিন-চারজন মুসল্লী এলো। তারপর জামাতের সাথেই দু'রাকাত ফরয আদায় করলাম।

মোনাজাত সেরে মসজিদের গেটে আসার সাথে সাথে গোঁফওয়ালা এক যুবক চোখ দু'টো কপালে তুলে জিজ্ঞেস করল, "আযান কে দিয়েছে? নামায কে পড়াচ্ছে? কার এতবড় বুকের পাটা? কে সে ব্যক্তি? মাত্র দু'দিন হল এ মসজিদ থেকে দু'জন মৌলবাদী রূহানী শয়তানকে পশুর মত জবাই করে বেহুদা কাজ থেকে ঘরটি মুক্ত করেছি। আবার কোত্থেকে অবাঞ্ছিত হতভাগা এসে উচ্চস্বরে আযান নামক শব্দগুলো শুনাল? সে কি জানে না, দু'দিন পর মসজিদ নামক ঘরটিকে আমরা ক্লাব বানাব! এখানে আমোদ-প্রমোদ হবে, এখানে চলবে নাচ-গান, বসবে পানশালা ও মদের আসর।"

যুবকের অকথ্য বকাবকি আমার বুকে অস্থিরতার অনল প্রজ্বলিত করে দিল। নির্বাক আননে বিষবাক্য এনে দিল। ঘুমন্ত সিংহ শাবকের গায় অসির খোঁচা হানল। আগপাছ চিন্তা করার সামান্যতম ফুরসত না পেয়ে আমি ব্যাঘ্রের হুংকার ছেড়ে বললাম, "হে পাপিষ্ঠ নরাধম! আমাদের পবিত্র মসজিদ শহীদের খুনে লাল করে দিয়ে ক্লাব আর মদ্যশালায় রূপান্তরিত করবে? নর্তকীদের আড্ডাখানা বানাবে? মদপান করে নাচ-গান করবে? আর মুসলমানরা শুধু গ্যালারীর দর্শক সেজে নীরবে সয়ে যাবে? তা কখনো সম্ভব নয়।"

কথাগুলো বলতে না বলতে আমার উপর নেমে এল কমিউনিস্ট হায়েনাদের অসহনীয় নির্যাতন। মুহূর্তের মধ্যে আমি অজ্ঞান হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লাম। সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে দেখি আমি হাসপাতালের বেডে শায়িত। কে বা কারা আমাকে হাসপাতালে নিয়ে গেছে, তা জানি না। আমার পাশে ডাক্তার ও কয়েকজন লোক দাঁড়ান। রক্তে জামা-কাপড় ভিজে আছে। মাথায় ও হাতে ব্যান্ডেজ বাঁধা। কে যেন হাত দিয়ে তুলির সাহায্যে রক্তগুলো মুছে দিচ্ছে। তাকিয়ে দেখি ট্রেনের সেই ভদ্রলোক। একটু পরে কয়েকজন ধরাধরি করে আমাকে নিয়ে গেল ট্রেনে। শুইয়ে দিল ঐ ভদ্রলোকটির সীটে। তিনি আমার একপাশে বসে

আমাকে ধরে রাখলেন। গাড়ী তার চিরাচরিত অভ্যাস অনুযায়ী গন্তব্যের উদ্দেশ্যে ছুটে চলল।

আমি আমার অবস্থা জানতে চাইলে ভদ্রলোকটি এক দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, "ট্রেন ছাড়ার বেশী দেরী দেখে নাস্তা করার জন্য আমি মসজিদ মার্কেটের মুসলিম হোটেলে যাচ্ছিলাম। মসজিদের প্রধান ফটকে লোকজনের ভীড় আর হৈ চৈ শুনে এগিয়ে গেলাম। গিয়ে দেখি রক্তাক্ত অবস্থায় তুমি বেঁহুশ হয়ে মাটিতে পড়ে আছ। লোকমুখে শুনতে পেলাম, বলসেভিকরা তোমাকে আযান দেয়ার অপরাধে মারধর করে চলে গেছে। আমি চার-পাঁচজন লোক নিয়ে চিকিৎসার জন্য তোমাকে হাসপাতালে নিয়ে যাই। বেশকিছু টাকার বিনিময়ে ডাক্তারগণ ক্ষতস্থান সেলাই করে, ব্যান্ডেজ বেঁধে ভাল চিকিৎসা দান করেন। তারপর তোমার জ্ঞান ফিরে আসে।" ভদ্রলোকটি পিতৃসুলভ সান্ত্বনা দিয়ে আমার মনোবল চাঙ্গা করেন। কাজাকিস্তান পৌঁছা পর্যন্ত তিনি আমার পরিচর্যা করেন।

ট্রেনটি কমিউনিস্টদের অনেক অত্যাচার সয়ে বিশ্রাম নিতে নিতে নির্ধারিত সময়ের চেয়ে একদিন বিলম্বে কাজাকিস্তানে এসে পৌঁছল। ট্রেনটি স্টেশনে পৌঁছার কিছু আগেই ভদ্রলোকটি কান্নাজড়িত কণ্ঠে আমাকে বললেন, "বাবা! আমার তো হায়াত ফুরিয়ে গেছে। এখানে আমি নেমে যাব। তুমি কোন চিন্তা করো না, স্বয়ং আল্লাহর হাতে তোমাকে সোপর্দ করে যাচ্ছি। মনভরা ব্যথা নিয়ে বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হয়ত আবার দেখা করাতে পারেন। ডাক্তারের দেয়া ওষুধগুলো নিয়মিত খেয়ে যাবে। আপাতত বিশ্রামে থেকো, কোন শক্ত কাজ করো না। অল্প দিনে ইনশাআল্লাহ সুস্থ হয়ে যাবে।" তারপর তিনি বেশকিছু ফল, রুটি, পানি ও কিছু টাকা দিয়ে বললেন, "সময়মত খাবার খাবে, প্রয়োজনে এ অর্থ খরচ করবে। যাই বাবা। আল্লাহ হাফেজ...।"

দুপুর সোয়া বারটায় ট্রেনটি আমাকে নিয়ে কাজাকিস্তানের রাজধানী আলমাআতা অভিমুখে ছুটে চলল। মাঠঘাট, বনবাদার, সেতু, কালভার্ট পাড়ি দিয়ে প্রায় পাঁচ দিনে আলমাআতা হয়ে আমার নিজ গ্রাম জামবুল এসে থামল। স্টেশন থেকে আমার বাড়ী তিন ক্রোশ দূরে। টাংগা দিয়ে যেতে হয়। কুলির সাহায্যে লাগেজপত্র ট্রেন

থেকে নামিয়ে টাঙ্গায় নিয়ে গেলাম। টাঙ্গা ছুটছে ঠক্ ঠক্ ঠক্। বহুদিন পর বাড়ী যাচ্ছি। এক অনাবিল শান্তিতে হৃদয় পুলকিত। আম্মু হয়ত আমার আগমনের পথপানে চেয়ে আছেন। হয়ত অনেক জিনিস নিজে না খেয়ে আমার জন্য যত্ন করে রেখে দিয়েছেন। হয়ত আমাকে দেখার অভিলাসে প্রহরের পর প্রহর অঘুম নয়নে এন্তেজার করছেন। দেশের নাজুক পরিস্থিতির কারণে হয়ত জায়নামাযে বসে দোআ করছেন।

আমি এসব চিন্তা করতে করতে কখন যে বাড়ীর নিকট এসে গেলাম, তা ভাবতেও পারিনি। টাঙ্গাওয়ালা বললেন, "বাবা! তুমি বাড়ী এসে গেছ, জলদী নাম।" একা একা খুব কষ্ট অনুভব করছিলাম। তাই টাঙ্গাওয়ালা আমার লাগেজপত্র বাড়ীতে পৌঁছিয়ে দিল। আমি বাড়ীতে প্রবেশ করলাম। আমার সালামের শব্দ শুনে আম্মু একরকম দৌড়ে কাছে এলেন। রক্তমাখা কাপড়-চোপড় আর মাথায় ব্যান্ডেজ দেখে তিনি কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। আমি আম্মুকে অনেক বুঝিয়ে সান্ত্বনা দিলাম ও ধৈর্যধারণ করতে বললাম। আম্মু আমাকে আলতোভাবে তার নরম বিছানায় শুইয়ে দিলেন।

আম্মু এক এক করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সবকিছু জানতে চাইলেন। আমিও শান্তভাবে আমার অবস্থা, মাদ্রাসার হালত ও তাসখন্দ, সমরকন্দ, বুখারা, তাজিকিস্তান, উজবেকিস্তান, কাজাকিস্তান, তুর্কমেনিস্তানের বর্তমান পরিস্থিতির বর্ণনা করলাম। আমিই মায়ের একমাত্র আদরের সন্তান। আমার এক ভাই এক বোন পাঁচ বছর আগে মারা যায়। এখন আমিই বাবা-মায়ের একমাত্র সম্পদ, একমাত্র স্বপ্ন। তাই আমিই তাদের সবগুলো ভালবাসার একচ্ছত্র উত্তরাধিকারী। এ ভালবাসার মধ্যে অন্য কোন শরীক নেই। দুঃখ-কষ্ট কি জিনিস, তা অনুভব করার সুযোগ আমার হয়নি কোনদিন।

[তিন]

দাদা আমীরজান বাগদাদী ছিলেন সে যুগের বড় আলেম। তিনি বাগদাদের ঐতিহ্যবাহী মাদ্রাসায়ে নেজামিয়ায় অধ্যয়ন করেন। তিনি কয়েকটি ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। পবিত্র কুরআন-হাদীস ছাড়াও এল্‌মে ফেকাহ, এল্‌মে মান্তেক, এল্‌মে ফাছাহাত, এল্‌মে বালাগাত ও এল্‌মে তাসাউফে গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তিনি বহুদিন

অধ্যাপনার কাজে নিয়োজিত ছিলেন। সমাজসেবায় তিনি ছিলেন অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। চারদিকে বইত তার সুনামের ঢেউ।

তিনি ছিলেন হযরত জালাল গোরখী (রহঃ)-এর মুরীদ। নক্‌শেবন্দী তরীকায় তিনি অনেক রিয়াজত-মুজাহাদা করেন। মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত তিনি মারেফাতের ময়দানেই বিচরণ করেন। হযরত জালাল গোরখী নক্‌শেবন্দী (রহঃ) তাকে খেলাফত প্রদান করে দ্বীনের দাওয়াত দেয়ার জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রেরণ করেন। তিনি বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন অঞ্চলে বহু মসজিদ-মাদ্রাসা ও খান্‌কা প্রতিষ্ঠা করেন। তার অলৌকিক বহু ঘটনাবলী এখনো লোকমুখে শোনা যায়।

অনেক দেশ সফর করে তিনি জামবুলে আসেন। এখানে তিনি ইসলাম প্রচার করেন। অনেকেই তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে ধন্য হয়েছেন। এখনো জামবুলের মানুষ ধর্মানুরাগী। জামবুলের শিক্ষা-দীক্ষা, কৃষ্টি-কালচার, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বিবেচনা করে বাগদাদ থেকে হিজরত করে জামবুলে আসেন। জামবুলকেই তিনি স্থায়ীভাবে বসবাস করার উপযুক্ত স্থান মনে করেন।

এখানে তিনি কারুকার্য্যখচিত একটি বিশাল মসজিদ নির্মাণ করেন। তারই পাশে প্রতিষ্ঠা করেন বাগদাদের প্রসিদ্ধ মাদ্রাসায়ে নেজামিয়ার অনুকরণে বিশাল একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। মসজিদটির সামান্য দক্ষিণে খনন করেন বিশাল এক দীঘি। এই দীঘিকে কেন্দ্র করেই খান্‌কা, হেফজখানা ও মেহমানখানা তৈরী করেন। তারই অদূরে চার ফুট উঁচু দেয়ালবেষ্টিত বিরাট এলাকা নিয়ে স্থাপন করেন মানুষের আখেরী বাসস্থান। দাদা আমীরজান নক্‌শেবন্দী এখন ওই গোরস্তানেই শায়িত। তিনি রেখে গেছেন অনেক শাগরেদ, মুরীদ, ভক্ত ও গুণগ্রাহী।

আমার পিতা ইউসুফ জামবুলী শহীদ (রহঃ) মাধ্যমিক শিক্ষা দাদাজানের কাছে শেষ করে উচ্চ ডিগ্রীর জন্য বাগদাদ, সমরকন্দ ও বুখারার বড় বড় মাদ্রাসা থেকে একেক বিষয়ের উপর জ্ঞান অর্জন করেন। আধ্যাত্মিক বিষয়াদী দাদাজানের সান্নিধ্যে থেকেই চর্চা করেন। তারপর দাদাজানের পরামর্শক্রমে কাজাকিস্তানের রাজধানী আল্‌মাআতা জামেউল উলুম বিশ্ববিদ্যালয়ের জিম্মাদার হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। আমি আট বছর বয়সে আব্বাজানের নিকট পবিত্র কুরআন

হেফ্জ শেষ করে সমরকন্দ জামিয়া আরাবিয়ায় ভর্তি হয়ে নিয়মিত লেখাপড়া করতে থাকি। সেখানে আট বছর লেখাপড়া করে জালালাইন জামাতে উত্তীর্ণ হই। বয়স আঠার। দাড়ি-গোঁফ এখনো গজায়নি। সবেমাত্র যৌবনে পদার্পণ করেছি। জীবনের স্বপ্ন আলেম হব। দেশের জন্য, জাতির জন্য গৌরবময় ইতিহাস সৃষ্টি করব। কমিউনিজমের অগ্রযাত্রা পদানত করে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা করব। তাছাড়া আরো লক্ষ আশা বুকে লালন করে আসছিলাম। আমার সহস্র আশা আজ মুকুলেই ঝরে পড়ার উপক্রম।

আম্মুর বিছানায় কেটে গেল বারটি দিন। এ সময়ে বাহির জগতে কি হচ্ছে না হচ্ছে তার কোন বার্তা কর্ণকুহরে প্রবেশ করেনি। এমন বদ্ধঘরে জীবনে আর কোন দিন আবদ্ধ হইনি। এতদিনে শরীর অনেকটা সুস্থ হয়েছে। ক্ষতস্থান শুকিয়ে গেছে প্রায়। বিষ-বেদনা তেমন অনুভব হয় না। তাই বাড়ীর চার দেয়ালের ভেতরই একটু হাঁটাহাঁটি করি। বিকেলবেলা বাড়ীর বাইরে যেতে চেয়েছি কয়েকদিন। কিন্তু আম্মু যেতে দেননি কমিউনিস্টদের ভয়ে।

এদিকে গ্রাম থেকে শহরে, শহর থেকে গ্রামে কোন লোকজন যাতায়াত করছে না। তাই আব্বুর কোন খবরাখবর পাচ্ছি না। আম্মু বারবার আব্বুর আগমনের পথপানে চেয়ে থাকেন। একদিন গভীর রাতে আম্মু চিৎকার দিয়ে ঘুম থেকে উঠে বসলেন। আম্মুর চিৎকারে আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়। কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কি হয়েছে আম্মু? কাঁদছেন কেন? তিনি কাঁপতে কাঁপতে বললেন, "আমি একটি অশুভ স্বপ্ন দেখেছি বাবা। জানি না, তোমার আব্বা কেমন আছেন, কি তার অবস্থা। স্বপ্নে দেখলাম, আমার মাথার উড়নী প্রচণ্ড ঝড়ে উড়িয়ে নিয়ে গেছে।"

শুনে আমি আম্মুকে মিছামিছি সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করলাম। আম্মু কিছুটা শান্ত হয়ে আমাকে ঘুমিয়ে পড়ার নির্দেশ দিলেন। আমি গিয়ে শুয়ে পড়লাম। একটু পরে আবার ভেসে আসল তার কান্নার আওয়াজ। আমি আবার তার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। তিনি আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, "বাবা! জানি না তোমার আব্বার কি অবস্থা। মনে হয় আমাদের ফেলে তিনি পরপারে বিদায় নিয়েছেন। হয়ত হায়েনারা তোমার আব্বাকে শহীদ করে ফেলেছে। আমার শরীর কাঁপছে, বুক ফেটে যাচ্ছে, ঠোঁট

শুকিয়ে আসছে।” তারপর তিনি আমার কথা, দেশের কথা ও দ্বীনের চিন্তা করতে লাগলেন। এর মধ্যদিয়ে কেটে গেল রজনী।

রাতের পাখীরা পালক ঝেড়ে উড়তে লাগল। মোরগ ডাকছে, বুলবুলিরা গান ধরেছে, পূর্বগগন ক্রমশই রাঙ্গা হয়ে উঠছে। মুয়াজ্জিন আগের মতো আজান দিচ্ছে না। আজানের শব্দ শুনলেই কমিউনিস্ট হায়েনারা মুয়াজ্জিনকে প্রহার করে। তাই প্রায় এক মাস যাবত কাজাকিস্তানের আকাশ-বাতাস আজানের মধুর ধ্বনি শুনতে পাচ্ছে না। আমরা মা-বেটা অজু-এস্তেঞ্জা সেরে নামায আদায় করলাম। নিজ গৃহে বন্দী অবস্থায় কেটে গেল অনেকদিন।

আব্বাজানের খোঁজ-খবর নেয়ার জন্য আমি অনুমতি চাইলে আম্মু রাজি হলেন। আগামীকাল খুব ভোরে আলমাআতা যাওয়ার চূড়ান্ত ফয়সালা হল। আমি আম্মুকে বললাম, কাল ভোরে আব্বাজানের নিকট আলমাআতা তো অবশ্যই যাব। আজ দেশের হালচাল জানার জন্য জামবুল শহর থেকে একটু ঘুরে আসি। আমার কথায় আম্মু রাজি হলেন। নাস্তা-পানি খেয়ে টাঙ্গা চড়ে জামবুলে গেলাম। শহরের অলি-গলি ঘুরে ঘুরে দেখলাম। গাড়ী-ঘোড়ার ভীড় নেই, নেই কোন কোলাহাল। হাটবাজার, রাস্তাঘাট ফাঁকা। মনে হল, এ যেন এক ভূতুড়ে নগরী। এ দৃশ্য আমার হৃদয়ে প্রচন্ড আঘাত হানল। বেশী সময় শহরে কাটান সমীচীন মনে করলাম না। তাই বাড়ী ফিরছি বুকভরা ব্যথা নিয়ে।

সামান্য পথ অতিক্রম করতেই খারকানী চাচার সাথে দেখা। তিনি আমাদের পাশের মহল্লার একজন গাঁধা ব্যবসায়ী। তিনি এক শহর থেকে গাঁধা খরীদ করে অন্য শহরে বিক্রি করতে যান। গাঁধার পাল নিয়ে প্রায়ই আলমাআতা যেতেন। তাই তার কাছ থেকে আব্বাজানের কথা জানতে চাইলাম। তিনি বললেন, “বাবা! সেখানে খুব গরম অবস্থা। কমিউনিস্টরা বহু আলেম-ওলামাকে ধরে নিয়ে গেছে। কাউকে গরম তেলে, কাউকে আগুনে জ্বালিয়ে, কাউকে হাত-পা বেঁধে পানিতে ডুবিয়ে, আবার কাউকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে, কাউকে রাস্তার পাশে বড় গাছে পেরেক মেরে শহীদ করে দিচ্ছে। বেশকিছু দ্বীনদার-পরহেজগার মানুষকে ধরে নিয়ে গেছে সাইবেরিয়ায়। জ্বালিয়ে দিয়েছে অসংখ্য ঘরবাড়ী। লুটে নিয়েছে মুসলমানদের দোকানপাট। যে সমস্ত মুসলমান

লেনিনের আদর্শ গ্রহণ করেছে, তারা সবাই বহাল তবিয়তে আছে। শুনেছি, তারা হায়েনার মত মা-বোনদের ইজ্জত লুণ্ঠন করছে।"

চাচার কথা শুনে আম্মুর স্বপ্নের কথা মনে হল। আমার শরীর কাঁপছে, শক্তি-সাহস লোপ পাওয়ার উপক্রম। চাচার কথায় আমার একিন হয়ে গেল যে, আব্বাজানকে ওরা নিশ্চয় শহীদ করে দিয়েছে। কারণ, কাজাকিস্তানের বিখ্যাত বিদ্যাপীঠ জামেউল উলুম একটি মার্কাজে দ্বীন। উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মহাপরিচালক আল্লামা ইউসুফ জামবুলীকে ছেড়ে দেবে, তা হতে পারে না। নিশ্চয়ই ওরা তাকে শহীদ করে দিয়েছে। বাড়ী গিয়ে এ সংবাদ আম্মুকে শুনালে হয়ত আমাকে আব্বুর খোঁজে যেতে দেবেন না। তাই বাড়ীতে গিয়ে এসব কিছুই শুনাইনি। বরং বলেছি, আলমাআতা যেতে পারব। কোন অসুবিধা হবে না। খবর মোটামুটি ভাল।

[চার]

১৯২৯ সাল। ফেব্রুয়ারী মাসের ১৪ তারিখ। ভোরবেলা আম্মুর সাথে নাস্তা খেয়ে আব্বুর খোঁজে আলমাআতার উদ্দেশ্যে জামবুল ত্যাগ করব। আম্মু বারবার আমার দিকে অশ্রুসজল নয়নে তাকিয়ে ক্ষীণ আওয়াজে বলছিলেন, "বাবা! তোমার আব্বুকে হয়ত বা পাবে না। আমি তোমাকেও হারাতে বসলাম কিনা কে জানে!" আম্মুর বয়স ষাটের কোঠায়। স্বাস্থ্য তেমন ভাল নয়। শরীর খুবই দুর্বল। বৃদ্ধা জননীর হৃদয়বিদারক কথাগুলো আমার হৃদয়ে খুব আঘাত হানল। আমার আঁখি যুগলের কোণ বেয়ে প্রবাহিত হচ্ছে অশ্রুধারা।

আমরা উভয়ে কান্না সামলিয়ে নিলাম। আম্মু পথ খরচের জন্য আমার হাতে কিছু টাকা তুলে দিয়ে বললেন, "বাবা! এগুলো প্রয়োজনে খরচ করো। ইসলামের ভাগ্যাকাশে কাল মেঘ পরিলক্ষিত হচ্ছে। এ ঘনঘটা ও অমানিশা কখন ঘুচবে, তা একমাত্র আল্লাহ জানেন। বাবা! দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য, মুসলমানদের দুঃখ-দুর্দশা ঘুচানোর জন্য, বঞ্চিতদের অধিকার ছিনিয়ে আনার জন্য তোমাকেই এগিয়ে আসতে হবে। তোমাকেই হতে হবে ইসলামের নির্ভীক সিপাহসালার। অকাতরে প্রাণ বিলিয়ে দেয়ার চেয়ে কাফের, বেঈমান, নাস্তিক ও মুর্তাদদের বিরুদ্ধে জিহাদ করে, ওদেরকে খতম করে শাতাদাতবরণ করা অধিক

শ্রেয়। বাবা! তোমার মা শুধু আমি একজন নই। আমার বয়সী সকল মুসলমান মহিলাই তোমার মায়ের সমান। তাদের ইজ্জত রক্ষা করা তোমার উপর ফরয। আলেম-ওলামা, পীর-মাশায়েখগণ এত সস্তায় জীবন বিকাবে, তা হতে পারে না। তোমাকে সাহসিকতার সাথে এগিয়ে যেতে হবে। তুমি তোমার আব্বার খবর নিয়ে জলদী ফিরে এসো। শুনেছি, তুর্কমেনিস্তানে আনোয়ার পাশা যুবকদেরকে জিহাদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন, মুজাহিদ বাহিনী গঠন করেছেন। কিছু কিছু যুদ্ধও নাকি করছেন। তিনি নাকি জিহাদ করা বর্তমান সময়ে ফরযে আইন ফতোয়া দিয়েছেন। তার বাহিনী নাকি তাসখন্দ, সমরকন্দ ও বোখারায় জিহাদ করছে। তোমাকেও আমি আনোয়ার পাশার নিকট পাঠাব। তুমি তার দলে ভর্তি হয়ে জিহাদ কর। মসজিদ-মাদ্রাসা, আলেম-ওলামা ও মা-বোনদের ইজ্জত রক্ষা কর।"

আমি কান পেতে আম্মুর কথাগুলো শুনছিলাম। চোখে-মুখে তার প্রতিশোধের আগুন। বুকে দ্বীনের ভালবাসা। মুখে বীরাঙ্গনা খানছা (রাঃ)-এর বাণী। আমার মনে হচ্ছিল, এ যেন বর্তমান জামানার খাওলা, ছুমাইয়া, উম্মে জিয়াদ, উম্মে আম্মারা ও আম্মা আয়েশা ছিদ্দীকা (রাঃ)। তার তেজোদীপ্ত ভাষণ আমার নিকট অমৃত সুধার মত লাগছিল। আমি আম্মুকে বললাম, এই তো সেদিন ওলামায়ে কেরাম আনোয়ার পাশার বিরুদ্ধে ফতোয়া লিখে বোখারার অলিতে-গলিতে ঝুলিয়ে দিয়েছেন। তাকে সন্ত্রাসী বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাকে কোন ধরনের সাহায্য-সহযোগিতা না করা, আশ্রয় না দেয়ার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। আম্মু আমার কথা শুনে স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি ভ্রু-কুঞ্চিত করে বললেন, "মাখলুকের ফতোয়ার দরকার নেই। আল্লাহ নিজেই মুফতী হয়ে ফতোয়া প্রদান করেছেন জিহাদ করার জন্য।" আম্মার কথাগুলো আমাকে দিয়েছে নতুন দিগন্তের সন্ধান।

আমি আম্মুর আঁচল আঁকড়িয়ে ধরে শপথ নিয়েছি, প্রতিজ্ঞা করেছি, বেঈমানদের বিরুদ্ধে জিহাদ চালিয়ে যাব। আম্মু আমাকে বিদায় দিয়ে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন। আমিও সালাম জানিয়ে আলমাআতার দিকে পা বাড়ালাম। আম্মু আবার পেছন দিক থেকে ডেকে বললেন, "বাবা! যথাসম্ভব বড় বড় সড়কে না গিয়ে সাধারণ রাস্তায় যেও।

গ্রাম্যপথ অনেকটা নিরাপদ। এটাই তোমার জন্য আমার আখেরী নসীহত।" আমি জামবুল শহরে গিয়ে দেখি, ট্রেন চলাচল বন্ধ। টাঙ্গা ছাড়া আর কোন বাহন নেই। অনেক দূরের পথ। একটানা যাওয়া যাবে না। বদলিয়ে বদলিয়ে যেতে হবে। আমি আল্লাহর নাম নিয়ে টাঙ্গায় উঠে বসলাম। টাঙ্গা ঘন্টাধ্বনি বাজিয়ে ছুটল খট্ খট্, খট্ খট্।

দু'দিন, দু'রাত পার হল। পরদিন সকাল ৮টায় আলমাআতায় পৌঁছলাম। সেখান থেকে সামান্য দক্ষিণে গেলেই জামেউল উলুম বিশ্ববিদ্যালয়। শহরে লোক চলাচল তেমন নেই। নেই গাড়ী-ঘোড়ার কোলাহল। দু'একটি দোকানপাট খোলা থাকলেও কেনাকাটা তেমন নেই। মাঝে-মধ্যে পুলিশের গাড়ী টহল দিচ্ছে। দু'একটি খণ্ড খণ্ড মিছিল এলোপাতাড়িভাবে শহর প্রদক্ষিণ করছে। সকলের হাতে কাস্তে-হাতুড়িখচিত নিশান। তারা শ্লোগানে শ্লোগানে আসমান-জমিন কাঁপিয়ে তুলছে–

দুনিয়ান মজদুর ঃ এক হও, এক হও।
কেউ খাবে আর কেউ খাবে না ঃ তা হবে না, তা হবে না।
নারী-পুরুষ এক সমান ঃ সাম্যবাদীর শ্লোগান।
মৌলবাদ নিপাত যাক ঃ সমাজতন্ত্র দিচ্ছে ডাক।
ইসলামকে কবর দাও ঃ কাস্তে-হাতুড়ি হাতে নাও।

এগুলো ছাড়াও আরো অনেক ধরনের শ্লোগান দিচ্ছে। সবগুলো এখন মনেও নেই। আমার পরনেও নাসারাদের পোশাক। বুকে কাস্তে-হাতুড়ি মার্কা স্টিকার। হাতে লেনিনের ফটো অংকিত ডায়েরী। হঠাৎ কেউ দেখে মৌলবাদী বা রূহানী হিসেবে চিহ্নিত করতে মুশকিল হবে।

আমি আস্তে আস্তে জামেউল উলুমের দিকে যাচ্ছি। মাদ্রাসার প্রায় কাছাকাছি পৌঁছলে এক পথচারী আমার হাত ধরে বললেন, "বাবা! কোত্থেকে এসেছ?" লোকটাকে দেখে একটু চেনা চেনা মনে হল। বয়স পঞ্চাশের কোঠায়। আমি অচেনার ভান করে বললাম, আমার বাসা কারজল কলোনী। পথচারী মুচকি হেসে আমার জামা-কাপড়ের দিকে বারবার তাকিয়ে কি যেন আবিষ্কার করছেন। তারপর একটু জোর করেই তার বাসায় নিয়ে গেলেন। হাম্মামখানার দরজা খুলে কাপড়, সাবান ও গামছা দিয়ে বললেন, "বাবা! বহু দূর থেকে এসেছ, গোসল করে খানা খেয়ে বিশ্রাম নাও, আলাপ পরে হবে।"

লোকটির ব্যবহারে আমার বুঝতে একটুও বাকি রইল না যে, তিনি আমাকে চেনেন। আমি মাদ্রাসায় যেতে চাইলে তিনি নিষেধ করে বললেন, "বিকেলে তোমাকে নিয়ে যাব। এখন বিশ্রাম কর।" আমি নিরুপায় হয়ে গোসল করে খানাপিনা সেরে বিছানায় গা এলিয়ে শুয়ে পড়লাম।

অল্পক্ষণের মধ্যে নিদ্রা এসে কাবু করে আমাকে অচেতন বানিয়ে দিল। একটানা দু'তিন ঘন্টা ঘুমিয়ে জেগে দেখি দু'টো বেজে গেছে। ঝটপট অজু করে যোহরের নামায আদায় করে দুপুরের খানা খেয়ে নিলাম।

ঘরওয়ালা খুব শান্ত মেজাজের। মুচকি হাসি তার চিরাচরিত অভ্যাস। আলাপে খুব রসাল। মাদ্রাসার কথা জানতে চাইলে তিনি এক দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "বাবা! মাদ্রাসায় গিয়ে কোন লাভ নেই। গত এক সপ্তাহ হল কম্যুনিষ্টরা রাজধানী আলমাআতায় বসবাসরত আলেম-ওলামাদেরকে মসজিদ-মাদ্রাসা, খান্‌কা, ঘরবাড়ী ও রাস্তাঘাট থেকে ধরে সাইবেরীয়ার বরফাঞ্চলে নিয়ে গেছে। নিয়ে গেছে বহুসংখ্যক মা-বোনদের। গতকাল সন্ধ্যায় জামেউল উলুমের বেশ ক'জন ছাত্র-শিক্ষক ও আরো কিছু নারী-পুরুষকে নিয়ে গেছে পূর্বদিকের গ্রামের পরিত্যক্ত এক জমিদার বাড়ীতে। সেখানে দিনে-দুপুরে কোন লোক যেতে ভয় পায়। প্রাচীন আমলের জমিদার বাড়ী এখন বনবনানীতে ভরে গেছে। সাপ, বিচ্ছু আর হিংস্র হায়েনাদের আবাসভূমি। ওদেরকে নেয়ার বেশ কিছুক্ষণ পরে অনেকগুলো গুলীর শব্দ শুনেছি। মনে হয় ব্রাশফায়ারে সবাইকে শহীদ করে দিয়েছে। ওদের সাথে আমার আদরের দুলাল মাদ্রাসা পড়ুয়া ছাত্র তমিজ দুয়ায়েভকেও নিয়ে গেছে। ওদের হালত দেখার মত সাহস হারিয়ে ফেলেছি।" এই বলে লোকটি ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। তাকে সান্ত্বনা দেয়ার মতো কোন ভাষা আমার অন্তরে সঞ্চিত ছিল না। লোকটির কথায় আমার আর বুঝতে বাকি রইল না যে, আব্বুকেও ওরা রেখে যায়নি। নিশ্চয়ই হায়েনারা আমার আব্বুকে শহীদ করে ফেলেছে।

আম্মুর স্বপ্নের ব্যাখ্যা যথাযথই প্রতিফলিত হয়েছে। আমি তার কাছ থেকে জানতে চাইলাম, এখন কি মাদ্রাসা বন্ধ? নাকি কেউ আছে?

তিনি বললেন, "না, মাদ্রাসায় এমন কেউ নেই, আছে লাল ফৌজের সদস্যরা। কাউকে ওদিকে যেতে দেয় না।"

কথাগুলো শোনামাত্র আমার ধমনিতে খালিদ ইবনে ওলিদের শোণিতধারা প্রবাহিত হতে লাগল। প্রতিশোধের আগুন জ্বলে উঠল। এক অসহনীয় বেদনায় কূলহীন পারাবারে সাঁতার কাটছি। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম প্রতিশোধ নেয়ার।

আমি জামেউল উলুমের হেফ্জ বিভাগে দু'তিন বছর পড়েছি। আশপাশের বাসাবাড়ী, বাড়ীঘর, দালানকোঠা, পথঘাট, অলিগলি সবই আমার পরিচিত। পার্শ্ববর্তী এলাকার গ্রাম্য পথঘাটও অচেনা নয়। চোখ বন্ধ করেও ঘুরে আসতে পারব কয়েক গাঁ। অনেক বাধা-বিপত্তি এড়িয়ে আলমাআতা এসে পৌঁছেছি। যেভাবেই হোক আব্বুর সঠিক সংবাদ নিতে হবে। তার লাশ খুঁজে বের করতে হবে। মনের সংকল্প মজবুত থেকে মজবুত হতে লাগল। হতভাগিনী আম্মু সংবাদের অপেক্ষায় পথপানে চেয়ে আছেন। আব্বুর সংবাদ আম্মুকে পৌঁছিয়ে বোখারার দিকে পা বাড়াব। আনোয়ার পাশার মুজাহিদ বাহিনীতে যোগ দিয়ে খোদাদ্রোহীদের চিরতরে নিপাত করতে হবে।

এসব চিন্তার মধ্যদিয়ে এক সময় দিনমণি আঁধারে লুকিয়ে গেল। সারাটি দিবস পার হয়ে গেল, অথচ কোথাও থেকে কোন আযানের ধ্বনি কানে এলো না। একসময় আলমাআতার মিনারে মিনারে আযান প্রতিধ্বনিত হতো। আজ নীরব-নিস্তব্ধ। আমি মাগরিবের নামায ঘরে পড়ে নিলাম। তারপর কুরআন তিলাওয়াত করে দেশ-জাতি ও বৃদ্ধা আম্মুর জন্য দোয়া করলাম। দোয়া শেষ করলে গৃহকর্তা ফিরে এলেন এবং আমার অবস্থা জানলেন। অতপর শহরের বর্তমান অবস্থা বর্ণনা করলেন।

আমি বললাম, চাচা! কিছুক্ষণ পর আমি আমার আব্বুর খোঁজে ঐ গ্রামে জমিদার বাড়ী যাব। সেখানে আব্বুকে তালাশ করে দেখব, তিনি শহীদ হয়েছেন, না বেঁচে আছেন। যদি শহীদ হয়ে থাকেন, তবে দাফনের ব্যবস্থা করব।

আমার কথা শুনে তিনি তার চোখ দু'টি কপালে তুলে বললেন, "বেটা! এত দুঃসাহস করা ঠিক হবে না। ওখানে দেও-দানবের আস্তানা। অনেক কাঠুরিয়া সেখানে ভয়ে প্রাণ হারিয়েছে। দিনে-দুপুরেও এর আশপাশে মানুষ যায় না। পার্শ্বেই রয়েছে পুরনো শশ্মান। তাছাড়া রাতটা

ঘুটঘুটে অন্ধকার। একা একা ওখানে যাওয়া আমি ঠিক মনে করি না।"

চাচার কথাগুলো আমার কাছে তিক্ত মনে হচ্ছিল। আমি তাকে স্যাহস দিয়ে বললাম, দুনিয়া থেকে একদিন না একদিন বিদায় নিতেই হবে। মউত থেকে পাশ কেটে থাকা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। আমি আপনার দোয়া ও অনুমতি কামনা করি।

এসব আলাপ-আলোচনার মধ্যে এশার সময় হয়ে গেল। দু'জনে নামায পড়ে নিলাম। নামায শেষে তিনি অন্দর বাড়ীতে চলে গেলেন। একটু পরেই খানাসহ আমার কামরায় এসে বললেন, চল বেটা খানা খেয়ে নেই। এক সাথে দু'জনে খানা খেলাম। তিনি নিজ হাতে খানা পরিবেশন করলেন। আহার সেরে নাছারাদের পোশাক পরিধান করলাম। চাচাকে ডেকে বললাম, আমার জন্য খাছ করে দোআ করবেন। অনেক তকলিফ দিয়েছি, ক্ষমা করবেন। চাচা চোখের পানি মুছে বললেন, "বাবা! যেখানেই যাও, যা কিছু কর, সংবাদ দিও। আবার ফিরে এস, এটা তোমার বাড়ী, কোন সংকোচ মনে করো না। তুমি আমার বন্ধুর ছেলে। তোমার আব্বার সাথে ছিল আমার অকৃত্রিম ভালবাসা। তুমি হয়ত চেন না। তুমি আমার ছেলেতুল্য।"

এসব উপদেশ দিয়ে তিনি আমাকে দোআ করে বিদায় দিলেন। আমি আঁধারে মিলিয়ে গেলাম।

[পাঁচ]

রাত আনুমানিক দশটা। লোক চলাচল ক্রমশই কমে আসছে। চলছি একা অজানার সন্ধানে। শহরের প্রধান সড়ক ছেড়ে দক্ষিণের কাঁচা পথ ধরে চলছি। প্রায় এক কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে বাঁ-দিকে চলে গেছে পায়ে চলা মেঠো পথ। এ পথেই পরিত্যক্ত জমিদার বাড়ী যাওয়া সহজ। মাঝে-মধ্যে দু'চারটি বাড়ী থাকলেও লোকজন ঘুমের ঘোরে অচেতন। হঠাৎ হঠাৎ খেকশিয়ারের হুক্কা হুয়া আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। আবার কোথাও কোথাও কুকুরের কর্কশ বকুনী রাতের নীরবতা ভঙ্গ করছে। দূর আকাশে দু'একটি তারা মিটিমিটি জ্বলছে। মনে হচ্ছিল, কালো চাদরে রাত্রিটা যেন আবৃত। দু'হাত দূরে কোন কিছু দেখার সাধ্য নেই। আমি বিড়ালের মত পা ফেলে সামনে এগিয়ে চললাম। হরিণের মত সাবধানতা সিংহের মত বাহাদুরী নিয়ে চলছি।

আমার একমাত্র সফরসঙ্গী আল্লাহ। কখনো কখনো কলাবাদুরের ডানার পত্ পত্ শব্দে ছাতি দুরু দুরু কাঁপছে। পা সামনে এগুতে চায় না। আবার দূর থেকে ভুতুম! ভুতুম! এক ভয়ানক আওয়াজ ভেসে আসছে। শিশুকালে এ আওয়াজ শুনে মায়ের আঁচলে লুকাতাম। আহ! কি ভয়ংকর আওয়াজ! এসব ভয়-ভীতির পাহাড় ডিঙ্গিয়ে অনেকদূর অতিক্রম করেছি। পল্লী এলাকা প্রায় শেষ। আর অল্প কিছু পথ সামনে এগুলেই সেই অরণ্যভূমি, যেখানে প্রাচীন আমলের জালিম রাজার রাজপ্রাসাদ। আশপাশে বাড়ী-ঘর নেই, নেই কোন জনপদ। আল্লাহর গজবে অত্যাচারী রাজা বংশধরসহ ধ্বংস হয়ে গেছে শত বছর আগে। এখন আছে শুধু লাল ইটের দালান-কোঠায় ধ্বংসাবশেষ।

যুগ যুগ ধরে সে স্মৃতি বহন করে চলেছে এলাকাটি। বিশাল বিশাল কক্ষ, তার ভেতর যেন অমানিশার অন্ধকার। সে সমস্ত দালান-কোঠার অভ্যন্তরে রয়েছে নানা প্রজাতির কাঁটাযুক্ত গাছ-গাছালি। আবার ছাদে ছাদে রয়েছে অসংখ্য বট ও পাকুড় গাছ। দূর থেকে তাকালে মনে হয় এ যেন ঘন জঙ্গল। হাঁটতে হাঁটতে একেবারে নিকটে চলে আসলাম। তারপর খুব সতর্কতার সাথে আব্বুর মরদেহ তালাশ করতে লাগলাম।

হঠাৎ ভেসে আসল মানুষের কণ্ঠস্বর। হৃদপিণ্ড কেঁপে উঠল। পা থেমে গেল। এদিকে-ওদিক তাকাতে লাগলাম, কিন্তু কিছুই দেখতে পেলাম না। সত্যিই কি তা মানুষের আওয়াজ? নাকি ভূত-পিচাশের আওয়াজ! কিছুই ঠাহর করতে পারছি না। হঠাৎ অস্পষ্ট সুরে 'আল্লাহ, আল্লাহ, বাঁচাও, বাঁচাও, রক্ষা কর' এসব আওয়াজ শুনতে পেলাম। এতক্ষণে আমার হৃদয়ে দৃঢ়বিশ্বাস জন্মেছে যে, নিশ্চয়ই এটা মানুষের কণ্ঠস্বর। হয়ত কোন বন্দী বা বন্দিনীর কণ্ঠ থেকে তা ভেসে আসছে।

আমি আস্তে আস্তে সেদিকে এগিয়ে চললাম। ঘন অন্ধকারে বৃক্ষের সাথে রজ্জুতে বাঁধা এক হতভাগা। আমি তার নিকটে গেলে সে করুণ সুরে আরজ করল, স্যার! আমাকে ব্রাশফায়ারে দুনিয়া থেকে বিদায় করে দিন। এ কষ্ট আর সইতে পারছি না। খুব ছোট আওয়াজ, নরম সুর। শুকনো পাতার মর্মর ধ্বনি শুনে লোকটি আমাকে সৈন্য মনে করেছে। তাই বন্ধনের কষ্ট সইতে পারছে না বিধায় ফায়ার করে হত্যা করে দিতে অনুরোধ করছে।

আমি লোকটির নিকটে গিয়ে বন্ধন খুলে দিয়ে বললাম, ভাই, আমি সৈন্য নই। আমি একজন মুসলমান। আব্বুর খোঁজে এসেছি। বন্দী বন্ধনমুক্ত হয়ে কাঁপতে কাঁপতে মাটিতে বসে পড়লেন। শক্ত করে বাঁধার কারণে রক্ত চলাচল বন্ধ ছিল। আমি আলতোভাবে তার বন্ধনের স্থানগুলোয় হাত বুলিয়ে দিলাম। তারপর ব্যাগ থেকে কিছু কিসমিস বের করে খেতে দিলাম। তিনি কিসমিস খেয়ে পানি পান করে জঠর জ্বালা কিছুটা নিবারণ করলেন।

আমি তার পরিচয় জানতে চাইলে তিনি কান্না সংবরণ করে বললেন, "বাবা! আমার নাম রাসূল খান বুলন্দি। আমি জামিউল উলুম বিশ্ববিদ্যালয়ের সানি মুহাদ্দিস।"

এতটুকু শুনেই আমি তাকে চিনে ফেললাম। তিনি আমার মুহ্তারাম ওস্তাদ। প্রায় পনের পারা কুরআন শরীফ তার নিকট মুখস্ত করেছি। আমিও তার নিকট আমার পরিচয় দিলাম। আমার পরিচয় পেয়ে তিনি কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন এবং আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। অশ্রুবর্ষণ করে বুকের আগুন নেভানোর চেষ্টা করলেন। হৃদয়ের ব্যথা চেপে রেখে বললেন, "বাবা! তুমি যে সুদূর জামবুল থেকে অনেক কষ্ট করে ছুটে আসলে এ বিজন বনে আমাকে মুক্ত করতে! সত্যিই তুমি আল্লাহর অলী।"

হুজুরের কাছ থেকে আব্বুর সংবাদ জানতে চাইলে তিনি কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, "বাবা! তোমার আব্বাকে জনমের মতো হারিয়েছ। তিনি আর আমাদের মাঝে নেই। তিনি বিশ্ববাসীকে ছেড়ে জান্নাতে চলে গেছেন। গতকাল শতাধিক আলেম ও তালেবে এলেমকে ওদিকের নির্জন কক্ষে নির্মমভাবে শহীদ করে দিয়েছে কমিউনিস্ট হায়েনারা।"

আব্বুর সংবাদ শোনামাত্র আমার মনে হল মাথায় বজ্র পতিত হয়েছে। কে যেন আমার অজান্তে বিষমাখা তীর নিক্ষেপ করে আমার কলিজা বিদীর্ণ করে দিয়েছে। আমি সংজ্ঞাহীন অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়লাম। বাকরুদ্ধ অবস্থায় বেশ কিছুক্ষণ ভূতলে ছটফট করলাম। দুনিয়াটা যেন অসাড়, নিঃসঙ্গ মনে হচ্ছিল। কালবৈশাখীর ছোবল যেন উড়িয়ে নিয়ে গেছে আমার জীবনের সব আশা-ভরসা। বন্ধনহীন

অপ্রতিরোধ্য প্লাবনের ন্যায় প্রবাহিত হচ্ছে অশ্রুধারা। এ অবস্থায় অতিবাহিত হল তিমিরাচ্ছন্ন রজনীর এক-দেড় ঘন্টা। আমার মোহ্‌তারাম উস্তাদ রসূল খান বুলন্দী নিজেও সান্ত্বনা দেয়ার ভাষা হারিয়ে ফেলেছেন। তবু অনেক খোঁজাখুঁজির পরে পবিত্র কালাম থেকে ধার করে নিয়ে এলেন সান্ত্বনার বাণী— 'ছবরকারীদের সাথে আল্লাহ্ থাকেন'।

হুজুরের মুখে এতটুকু শুনে আমি নিজেকে সামলিয়ে নিলাম। তারপর হুজুরকে পুরো ঘটনা বলার জন্য অনুরোধ করলে তিনি বললেন, "বাবা! আমাদেরকে মেষপালের ন্যায় হাঁকিয়ে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে গতকাল সন্ধ্যায়। ছাত্র-শিক্ষক ছাড়াও বেশকিছু সাধারণ নারী-পুরুষ ছিল। আমি মুক্তির পথ খুঁজছিলাম। এক পর্যায়ে রাস্তার পাশে বসে পড়ি। সবাই আগে আগে চলছে। আমার পেছনে যে সৈন্য আছে, তা জানতাম না। সে সৈন্যদের নজর এড়ান সম্ভব হয়নি। সৈন্যরা আমার হাত-পা বেঁধে ফেলে। তারপর গাছের সাথে মজবুত রশিতে বেঁধে ফায়ার করে। ভাগ্যক্রমে আমার শরীরে ফায়ার লাগেনি। আল্লাহ হেফাজত করেছেন। কিছুক্ষণ পর একসাথে গর্জে উঠল থ্রি-নট-থ্রি, স্টেনগান, এসএলআর ও ক্লাশিনকভ। ব্রাশফায়ারের প্রলয়ংকরী আওয়াজ জমিন কাঁপিয়ে তুলেছে। মনে হল, অরণ্যের কোন প্রাণী এ এলাকাতে নেই। ধারণা হল, কেউ আর বেঁচে নেই। নরপশুরা ওদেরকে হত্যা করে কিছু লাশ বিবস্ত্র করে, কাপড়গুলো পুড়িয়ে ফেলল। এ অন্ধকারে বড় হুজুরের লাশ খুঁজে পাওয়া যাবে না বলে মনে হয়।"

আমি হুজুরকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি একা বাসায় যেতে পারবেন কি?

তিনি বললেন, "হ্যাঁ পারব।"

আমি বললাম, হুজুর! রাত প্রায় শেষ, জলদী এ স্থান ত্যাগ করা দরকার। কে জানে আবার কোন্ বিপদ এসে হাজির হয়।

তিনি বললেন, "তুমি একা এখানে থেকে কি করবে? তুমিও সাথে চল।"

আমি বললাম, হুজুর! উভয়ে এক পথে না গিয়ে ভিন্ন পথে যাব।

হুজুর চলে গেলেন।

[ছয়]

রাত আনুমানিক তিনটা। আল্লাহর উপর ভরসা করে আমি আস্তে আস্তে শহীদদের লাশ দেখতে অগ্রসর হলাম। সামনে একটু অগ্রসর হয়েই অনুভব করলাম, মৃদুমন্দ অনিল হিল্লোল সমস্ত এলাকায় ছড়িয়ে দিয়েছে এক জান্নাতী খুশবু। এমন মনোমুগ্ধকর পাগলকরা সুবাস যা দুনিয়ার কোন নাসিকা কোনদিন গ্রহণ করেনি। আমার হৃদয় সাক্ষ্য দিল, এ নিশ্চয়ই শহীদের রক্তের সুঘ্রাণ। কামরার নিকট গিয়ে দেখি, লাশগুলো মুক্তার মতো ঝলমল করছে।

লাশগুলো এত গাদাগাদী অবস্থায় পড়ে আছে যে, কোন্‌টা কার লাশ, তা শনাক্ত করা মুশকিল। অনেকগুলো লাশ ব্রাশফায়ারে ক্ষতবিক্ষত। একা একা টানাটানি করে আব্বুর লাশ উদ্ধার করা অসম্ভব। তাই লাশগুলো সামনে নিয়ে জানাযা পড়ে নিজেকে ধন্য মনে করলাম। আব্বুর জন্য হৃদয়ের গভীর থেকে বেরিয়ে আসল– "আব্বু.. ও আমার আব্বু! তোমার পাগল ছেলে তোমার খোঁজে এসেছে।" আহ! কেউ আমার ডাকে সাড়া দিল না। তিনি আর ধূলির ধরায় নেই।

রাত বেশী নেই। আমার অরণ্যে রোদন কে শুনবে? কিছুক্ষণ পরই ভোরের রবি সমস্ত আঁধার নাশিয়ে পূর্বাকাশ রাঙ্গিয়ে উদিত হবে। সেনাবাহিনী আবার আসতে পারে। কোন্ বিপদ ঘটে যায় কে জানে। তাই এ স্থান ত্যাগ করে অন্যত্র যাওয়ার চিন্তা করছি।

হঠাৎ শুনতে পেলাম উত্তরের দেয়াল ঘেঁষে লাশের স্তূপের ভেতর থেকে ক্ষীণস্বরে কে যেন 'আল্লাহ্ আল্লাহ' যিকির করছে। আমি অত্যন্ত কৌতূহলে ভয়ে ভয়ে প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে সামনে এগিয়ে গেলাম লাশের স্তূপের পাশ দিয়ে। অনেক কষ্ট করে বেশক'টি লাশ টেনে সরালাম। তারপর আরো একটি লাশ সরানোর চেষ্টা করলে একটু ঝাঁকুনি লাগল। আমি বুঝতে পারলাম, এ লোকটি গুরুতর আহত এবং জীবিত। আমি তাকে কক্ষের বাইরে নিয়ে এলাম। হাত-পায়ের বন্ধন খুলে দিলাম। তারপর একটু নড়াচড়া করতেই উহ্ আহ্ শব্দ করল। আমি তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, ভাই, তুমি ভয় পেয়ো না, আমি তোমার উদ্ধারকারী, তোমাকে মুক্ত করতে এসেছি। এখন আর তোমার কোন ভয় নেই। জিজ্ঞেস করলাম, ভাই, তোমার শরীরে কোন গুলী লেগেছে

কি? সে মাথা নেড়ে জানান, কোন গুলী তাকে আঘাত করেনি।

দু'তিন দিনের অনাহারে লোকটির শরীর দুর্বল। আমি কিসমিস আর পানি বের করে দিলাম। লোকটি বেশ কয়েক মুঠো কিসমিস খেয়ে পানি পান করল। আমি তাকে আরো একটু দূরে নিয়ে গেলাম। একটি বৃক্ষের নীচে বসিয়ে অভয় দিলাম। এখন সে অনেকটা শান্ত ও সুস্থ। একটু একটু করে হাঁটতে সক্ষম। লোকটি আমাকে খুব দোআ করতে লাগল এবং আল্লাহর প্রশংসা করল।

লোকটি মৃদু স্বরে বলল, "ভাই, আপনাকে আরো একটু কষ্ট করতে হবে। আশা করি মনে দুঃখ নেবেন না। কাজটি হল, ওখানে দরজার নিকট দু'টি সৈন্যের লাশ পড়ে আছে। তাদের নিকট রয়েছে অত্যাধুনিক দু'টি হাতিয়ার ও গোলা-বারুদ। রয়েছে গ্রেনেড, মাইন, পিট্টু, বেল্ট, জুতা, লাইনার, বাঁশি ও জামা-কাপড়। ওসব মালামাল এক্ষুণি নিয়ে আসুন। এগুলো আমাদের অনেক কাজে লাগবে।"

আমি লোকটির কথায় এগিয়ে গেলাম। তারপর সমস্ত মালামাল নিয়ে এলাম। খুলে নিয়ে এলাম লাশ দু'টোর পরনের কাপড়-চোপড়ও।

লোকটি বলল, "ভাইজান এখানে দেরী করা বিপজ্জনক। ভোর হয়ে গেছে। চলুন, অন্ধকার কাটার আগেই নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যাই।"

কোথায় যাব? কোথায় নিরাপদ আশ্রয় পাব, তা নিয়ে দু'জন শলা-পরামর্শ করলাম। লোকটি বলল, "এ অবস্থায় লোকালয়ে যাওয়া ঠিক হবে না। চলুন, আমরা গভীর অরণ্যে আশ্রয় নেই। বনের হিংস্র জানোয়াররা আমাদের শত্রু নয়, আমাদের শত্রু হল আশরাফুল মাখলুকাত- মানুষ।" আমি মাথা নেড়ে সম্মতি জ্ঞাপন করলাম।

তিনি আমাকে আরো জানালেন, "ভাইজান! আপনি আমাকে সুনিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছেন, আল্লাহ আপনাকে জাযায়ে খায়ের দান করুন। আমি আমার বংশে একা। পরিবার-পরিজনকে কমিউনিস্ট হায়েনারা শহীদ করে দিয়েছে। বাড়ীঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে। আমার সংসারে আর কেউ জীবিত নেই। দুনিয়াতে থাকতে হলে দ্বীন নিয়ে, ইসলাম নিয়ে বেঁচে থাকতে চাই। অন্যথায় আল্লাহর দুশমনের বিরুদ্ধে জিহাদ করে শাহাদাতের অমৃত সুধা পান করতে চাই। আমি দেশে ফিরে যেতে চাই না।"

তিনি আরো বলেন, "এ বনের দক্ষিণে ছোট্ট একটি নদী আছে। চলুন আমরা নদীর তীরে ঘন জঙ্গলের অভ্যন্তরে গিয়ে অবস্থান নিই। সময় সুযোগে যে কোন দিক যেতে পারব।"

আমি লোকটির কথায় সম্মতি জ্ঞাপন করলাম। সমমনা একজন সাথী পাওয়া খুবই কষ্টকর। লোকটির পরামর্শ কতই না চমৎকার। তাকে সাথে রাখতে বাধা কিসের? এসব ভেবে-চিন্তে ছামানাগুলো কাঁধে তুলে নিলাম। তারপর লোকটির হাত ধরে দু'জনে নদীর দিকে এগিয়ে চললাম। কিছু রাস্তা অতিক্রম করতেই সুমধুর কল কল ধ্বনি শুনতে পেলাম। নদী অতি নিকটে। নদীর কূলে ঘন বন, সেখানে লোকজনের যাতায়াত নেই। নীরব-নিস্তব্ধ। মাঝে মধ্যে নীরবতা ভেঙ্গে বন্য পশুগুলো তর্জন-গর্জন করে এদিক-সেদিক ছুটাছুটি করে আর দলে দলে নদীতে পানি পান করতে আসে। একদিকে নরপশুর চেয়ে বন্যপশু ভাল। কারণ, ওরা জঠর জ্বালা নিবারণ করতে অন্য পশুর উপর আক্রমণ করে বসে। আর মানবরূপী পশুরা হীনমনোবৃত্তি চরিতার্থ করার নিমিত্তে অন্য মানুষের উপর আক্রমণ করে। প্রভূত্বপ্রিয়তা মানুষকে মহান আল্লাহর দাসত্ব থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। রবকে ভুলে গিয়ে নিজেই ঘোষণা করে, আনা রাব্বুকুমুল আলা। কাজেই এ সমস্ত নরপিচাশদের থেকে বন্য পশুরা সহস্র গুণে উত্তম। তাই বন্য হায়েনাদের ডর-ভয় দিল থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছিল। ওরা যে আমাদের পড়শী, ওরা যে আমাদের বিপদ দিনের সাথী, তা কবুল করে নিয়েছি। তারপর একটি স্থান নির্বাচন করে সেখানে ছামানাপত্র রেখে দিলাম।

ফজরের নামায পড়ার জন্য অযু-এস্তেঞ্জা সেরে দু'রাকাত সুন্নত পড়ে জামাতের জন্য বসে রইলাম। লোকটি বলল, "ভাইজান! আমার একটু বিলম্ব হবে। আপনি নামায সেরে বিশ্রাম নিন। সারারাত তো ঘুমাতে পারেননি।" আমি ওর জন্য অপেক্ষা না করে নামায আদায় করে ঘুমিয়ে পড়ি।

আমি একটানা তিন-চার ঘন্টা ঘুমিয়ে জাগ্রত হয়ে দেখি, সৈনিকদের রক্তমাখা পোশাক গাছের ডালে ঝুলছে। লোকটি নদীর পানিতে ওগুলো ধৌত করে শুকাতে দিয়ে নিজে একটু দূরে একটি গাছের নীচে ঘুমে অচেতন। আমি তার স্বাস্থ্যের অবস্থা জানার জন্য

নিকটে গেলাম। গিয়ে দেখি, এ তো মানুষ নয়, পুরুষও নয়। এ যেন জান্নাত থেকে পালিয়ে আসা হুর। বৃক্ষের ফাঁক দিয়ে সূর্যের কিরণ এসে তার চেহারায় পড়েছে। এতে যেন তার চেহারার কমনীয়তা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। ও যেন একটি ফুটন্ত কুসুম। কাল কেশদাম কটিদেশ পর্যন্ত বিছিয়ে রয়েছে। নাসিকাটা যেন কোন সুদক্ষ কারিগর নিপুণ হাতে তৈরী করেছে। আঁখিযুগল যেন বনের চঞ্চলা হরিণী থেকে চুরি করে সংগ্রহ করেছে। আঙ্গুলের মাথাগুলো যেন আঙ্গুরের থোকা। সুঠাম গড়ন, উন্নত বক্ষদেশ। এ যেন ইউসুফের জুলায়খা, মজনুর লায়লা, ফরহাদের শিরী।

দীর্ঘক্ষণ অপলক নেত্রে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে আমি ভাবনার সাগরে হারিয়ে গেলাম। লাবণ্যময় চেহারাটা যেন চেনা চেনা মনে হয়। সে যেন আমার খুব কাছের মানুষ। আসলে কিন্তু পুরোটা চিনতে পারছি না। না, আসলে সে মানুষ নয়, মানবরূপী ফেরেশতা, না হয় রূপসী পরী। এখানে কেন তার আগমন? কে নিয়ে এল ওকে বেহেশতের দুয়ার খুলে?

এই তরুণীকে দেখলে মহান আল্লাহর কথা স্মরণ হয়, যিনি তাকে এত সুষমামণ্ডিত করে সৃষ্টি করেছেন, তিনি কত সুন্দর! যার সৃষ্টি এত মনভোলা, মনোলোভা, এত সুন্দর; তার সৌন্দর্যের কি তুলনা হয়! পার্শ্বে বসে আমি এসব চিন্তায় বিভোর। হঠাৎ পার্শ্ব পরিবর্তন করে সে বামদিক থেকে ডানদিক ঘুরল। এমন সময় ডাগর দু'টি আঁখি খুলে সে আমার দিকে তাকাল। তাকিয়েই চিৎকার করে বলে উঠল, "ইয়া.. তুমি খোবায়েব জামবুলী! খোবায়েব ভাইয়া! তুমি যে এখানে? কোত্থেকে এলে এ বিজন বনে? তুমি কি মুক্তির পয়গাম নিয়ে এসেছ? তুমি কি তোমার অসহায়া বোনটিকে জালিমের হাত থেকে মুক্ত করতে ছুটে এসেছ? আল্লাহ কি তোমাকে প্রেরণ করেছেন মুসলিম জাতিকে উদ্ধার করতে? তুমি এসেছ দ্বীনকে রক্ষা করতে? বললে না ভাইয়া, তুমি কোথা থেকে এলে?"

এবার আমি সুন্দরীকে আবিষ্কার করেছি, সে যে আমার হেফজ জীবনের সাথী। দু'তিন বছর আমরা একই সাথে আলমাআতা জামেউল উলুমে হেফজ বিভাগে পড়াশোনা করেছি। নাম ছায়েমা মালাকানী। নাজেরার বছর ওদের বাসায় জায়গীর ছিলাম। ওর আব্বা

একজন দ্বীনদার, পরহেজগার লোক। বড় আলেম না হলেও শরীয়তের জরুরী মাসআলা-মাসায়েলে খুবই পাকা ছিলেন। গ্রামের একটি মসজিদের ইমাম ছিলেন তিনি। ছায়েমা আমার চেয়ে বয়সে দু'এক বছরের ছোট হবে। বর্তমানে আমার বয়স আঠার। ছায়েমার ষোল কি সতের হবে। ওর সাথে দেখা নেই প্রায় দশ-এগার বছর হবে। তাই প্রথমে চিনতে একটু কষ্ট হয়েছে। সে তার আব্বা-আম্মা ও ভাই-বোনের শাহাদাতের করুণ কাহিনী আমাকে শুনাল। আমিও তাকে আব্বুর মর্মান্তিক ও হৃদয়বিদারক শাহাদাতের খবর, দেশের অবস্থা এবং নিজের ইতিহাস শুনালাম।

[সাত]

ছায়েমা মালাকানী আমাকে অনুনয়-বিনয় করে বলতে লাগল, "ভাই খোবায়েব! তুমি আমাকে একা ছেড়ে কোথাও চলে যেও না। আমার মাথা গোঁজার ঠাঁই নেই। তুমিই তো আমাকে মৃত্যুর হাত থেকে কেড়ে এনেছ। আমার দুনিয়াতে আর কোন আশা বাকি নেই। দুনিয়ার সব আশা-আকাঙ্খা স্বপ্ন-সাধ আমার ধুলায় মিশে গেছে। এখন ইসলামের জন্য জিহাদ করেই জীবনের যবনিকা টানতে চাই। তাই শাহাদাতের অমৃত সুধা পান করে রক্তমাখা ভূষণে আল্লাহর সমীপে হাজির হতে। আমি চাই, আমার তাজা খুনে ইসলামের কালেমাখচিত ঝাণ্ডা তামাম জাহানে উড্ডীন করতে। আমি চাই, হযরত ছুমাইয়া (রাঃ)-এর মত শাহাদাতবরণ করতে। আমি চাই, ইসলামের দুশমনদের দুনিয়ার বুক থেকে জাহান্নামে নির্বাসন দিতে। তামাম তাগুতি শক্তিকে পদানত করে ইসলামকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে। আমি চাই, গোটা মুসলিম বিশ্বের বিজয় ছিনিয়ে এনে মজলুম মানবতার মুক্তি দিতে। নির্যাতিত-নিপীড়িত মা-বোনদের ইজ্জত রক্ষা করতে। আমি চাই, এতিম, বিধবা, পঙ্গু, অনাথ-অনাথিনীর মলিন মুখে হাসি ফুটাতে। আমি চাই, কাফির-বেঈমানদের বন্দীশালার লৌহ কপাট চূর্ণ করে সকল বন্দী-বন্দীনীকে উদ্ধার করে তাদের স্বজনদের কাছে ফিরিয়ে দিতে। আমি চাই, সন্তানহারা মায়ের বুকফাটা আর্তনাদের পরিবর্তে আনন্দের হাসি দেখতে। আমি চাই, দুঃখী ও অসহায় মানুষের চোখের পানি মুছে সান্ত্বনার বাণী শোনাতে।"

বীরাঙ্গনা ছায়েমা মালাকানী তেজোদীপ্ত কণ্ঠে তার অভিপ্রায়গুলো দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বর্ণনা করছিল। আমি তার বর্ণনাভঙ্গি ও ঈমানী জযবা দেখে হতভম্ব হয়ে গেলাম। মনে হল, আমি নবজীবনের সন্ধান পেয়েছি। আমার চিরঘুমন্ত প্রাণে সাড়া জাগিয়েছে ছায়েমা। সুপ্ত ঈমানে শাণ দেয়ার মতো অসাধারণ যোগ্যতা তার মাঝে লুকিয়ে আছে, যা কোনদিন ভাবতেও পারিনি। ওর কথাগুলো সত্যিই যাদু-মন্ত্রের ন্যায় চমকপ্রদ। এমন সাহস দানকারী তরুণী সমাজে খুঁজে পাওয়া এতো সহজ নয়। তার জ্ঞান-গরিমা ও বুদ্ধির প্রখরতা দেখে আমি বিস্মিত।

আমি ভাবছিলাম, এ কি সেই ছায়েমা, যার সাথে আমি শৈশবে খেলা করেছি! একি সেই খুকী, যার সাথে দু'তিনটি বছর পবিত্র কুরআন শরীফ হেফজ করেছি! যার সাথে প্রায়ই ছবক নিয়ে প্রতিযোগিতা হত। একি সেই ছায়েমা, যে সুরেলা কণ্ঠে হামদ্, নাত, তারানা, গজল, কাছিদা, কবিতা আবৃত্তি ও ক্বেরাত পাঠ করে প্রথম প্রাইজগুলো নিয়ে নিত। যার সুর লহরীতে ভাবুক নিজেকে হারিয়ে ফেলত, সে কি আজ জিহাদের দুর্গম পথে, খুনরাঙ্গা পিচ্ছিল পথে অগ্রণীর ভূমিকা পালন করতে বজ্রশপথ নিয়েছে? এই কিশোরীর জিহাদের স্পৃহার কথা শুনে বিস্মিত হবে না, এমন কে আছে!

এসব চিন্তা করতে করতে উঁচু বৃক্ষের মাথার উপরের সূর্যটা কখন যে ঢলে পড়েছে, তা টেরও পাইনি। হঠাৎ ছায়েমা আমাকে বলল, "ভাইয়া! যোহরের সময় হয়ে গেছে; গোছল সেরে নামায পড়ে নিন। আমি গোছলের জন্য নদীতে চলে গেলাম।

গোছল সেরে কাপড় পাল্টিয়ে দু'চার কদম সামনে অগ্রসর হতেই আমার শরীর শিউরে উঠল। চেয়ে দেখি, একটু দূরে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত এক সৈনিক আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমি প্রায় সংজ্ঞাহীন, কিংকর্তব্যবিমূঢ়। জীবন নিয়ে পালাতে পারলেই বাঁচি। তাই জীবন বাজি রেখে ঊর্ধ্বশ্বাসে দিলাম এক দৌড়।

হঠাৎ ছায়েমার কোমল কণ্ঠস্বর ভেসে আসল আমার কানে, "খোবায়েব ভাইয়া! খোবায়েব ভাইয়া! তুমি কোথায় যাচ্ছ? কোথায় যাচ্ছ তুমি আমাকে একা ফেলে এ বিজন বনে? অমন করে পালাচ্ছ কেন? ফিরে আস। আমায় একা ফেলে যেও না!" আমি ভয়ে ভয়ে একবার

ঘাড় ফিরিয়ে চেয়ে দেখি, সৈন্যটি আমাকে অনুসরণ করছে। আমার দিকে দৌড়িয়ে আসছে। আমি আরো জোরে পাগলা ঘোড়ার মত প্রাণপণে ছুটছি। ঘন জঙ্গলের অন্তপুরে এক ঝোপের অভ্যন্তরে মিছামাছি আশ্রয় নিয়েছি। কর্মকারের তাদানির মত আমার পেট উঠানামা করছে। আর নাসিকার ছিদ্র পথে হাজার মাইল বেগে নিশ্বাস বেরিয়ে আসছে। কেউ দেখলে হয়ত মনে করত সাইমুম আরম্ভ হয়েছে। হাত-পা অবশ, মাথা ঘুরছে, ছাতি কাঁপছে, ঠোঁট শুকিয়ে গেছে। তবুও আল্লাহর শুকরিয়া, অল্পতে বেঁচে গেছি। মনে মনে ভাবছি, এতদূর হয়ত ধাওয়া করবে না। এসব ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মনে পড়ল, আমার অসহায়া বোন হাফেযা ছায়েমা মালাকানির কথা।

হায়! দুমশনের হাত থেকে ছিনিয়ে এনে মেয়েটাকে আবার বুঝি হায়েনার মুখের কাছে ছেড়ে এসেছি। হে আল্লাহ! তুমি আমায় ক্ষমা কর। ছায়েমা আমার অবলা-অসহায় মজলুম বোন। তুমি ছায়েমাকে হেফাযত কর। আমি তোমার কুদরতি হাতে তাকে সোপর্দ করলাম। তুমি আমাকে হেফাজত কর।

একটু পরেই শুকনো পাতার মর্মরধ্বনি কানে আসল। শরীর শিউরে উঠল। আবর ছাতি কাঁপা আরম্ভ হল। তাহলে কি সৈন্যটি আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে? নড়াচড়া বিলকুল বন্ধ। হঠাৎ দেখি, রণসাজে সুসজ্জিত হয়ে সেনা জওয়ানটি ক্ষণে ক্ষণে বৃক্ষের উপরিভাগে তাকাচ্ছে, আবার বসে বসে নীচে কি যেন খুঁজছে। আমাকেই যে খুঁজে বেড়াচ্ছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। আমি ভয়ে ভয়ে উচ্চারণ করতে লাগলাম- 'অজাআলনা বাইনা আইদীহিম ছাদ্দাও অমিন খালফিহিম ছাদ্দান ফাআগশাইনাহুম ফাহুম লা ইবছিরুন। আল্লাহুম মাকফিনাহু বিমা শিতা, আল্লাহুম্মা ইন্না নাজআলুকা ফী নুহুরিহিম, অনাউযুবিকা মিন সুরুরিহিম।'

পেছনে চেয়ে দেখি গ্রীবা নেড়ে নেড়ে এক অভিনব ভঙ্গিতে এক সৈনিক ফিল্ড মার্শালের মতো, বীর বাহাদুর জেনারেলের মত ঘুরে ঘুরে আমাকে তালাশ করছে। এবার আর রক্ষা নেই। এবার একদম নিকটে। আমি চোখ বুজে মৃত লাশের মতো পড়ে আছি। চেয়ে দেখি বসে বসে সে তালাশ করছে।

হঠাৎ সে আমাকে আবিষ্কার করে ফেলল। তাই অট্টহাসিতে বন-

বাদার মাঠঘাট মুখরিত করে তুলছে। হায় আল্লাহ! ও যে বীরঙ্গনা ছায়েমা! ছায়েমা আমার অবস্থা দেখে হেসে কুটপাট। সে ভর্ৎসনা করে বলছিল, "আ-হা-রে আমার বীর পুরুষ! আলেয়ার প্রদীপ দেখে আগুন লাগছে, আগুন লাগছে বলে হৈচৈ জুড়ে দিয়েছ। মনে হয় যেন সিংহ সাদৃশ শিকারী বিড়াল।"

ওর কথাগুলো আমাকে লজ্জিত করে দিল। কিন্তু জবাব দেয়ার কোন ভাষা আমার অভিধানে মওজুদ ছিল না। ওর কাছে সত্যিই আমি পরাজিত। ওর বিচক্ষণতা ও বুদ্ধির প্রখরতা দেখে আমি অবাক। সে যে একজন সুন্দরী তরুণী, তা টের পাবে এমন কে আছে? ছায়েমা দু'ঠোঁটে মুচকি হাসির রেখা টেনে বলল, "বাহাদুর ভাই! এবার ইঁদুরের গর্ত থেকে বেরিয়ে আসুন, চলুন নামায আদায় করে নেই, সময় যে বয়ে যাচ্ছে।"

আমি ঝোপের ভেতর থেকে বেরিয়ে ছায়েমার অনুসরণ করলাম। রাস্তা যেন শেষ হচ্ছে না। এতদূর চলে এসেছি তা ভাবতেও পারিনি। আধা ঘন্টা পর পূর্বের স্থানে ফিরে এলাম। অযু করে নামায পড়ে নিলাম। ছায়েমাও তার নির্বাচিত বৃক্ষের আড়ালে গিয়ে নামায আদায় করল। পেটে ক্ষুধার অনল দাউ দাউ করে জ্বলছে। খাবার অতি সামান্য– কয়টি খেজুর আর দু'মুঠো কিসমিস। দু'জন মিলে ওগুলো খেয়ে বাকি উদর পূর্ণ করলাম নদীর পানি পান করে।

ছায়েমা আমার পাশে বসে জীবনের অনেক খুঁটিনাটি বিষয় জানতে চাইলে এক এক করে সব বলতে লাগলাম। কথার ফাঁকে লজ্জার পাহাড় ডিঙ্গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, ছায়েমা! আমরা তো দু'টো অস্ত্র পেলাম, পেলাম গোলা-বারুদ, গ্রেনেড ও ডিনামাইট। কিন্তু ব্যবহার কিভাবে করতে হয়, তা তো জানিনা। কি করে ব্যবহার করব বল তো বোন? ছায়েমা চোখ দু'টি কপালে তুলে মুখ বাঁকা করে বলল, "তুমি আবার কেমন পুরুষ? তুমি নাকি কাফির-বেঈমান আর মুর্তাদদের সাথে যুদ্ধ করার শপথ নিয়েছ? অথচ অস্ত্র চালনা শিখনি! তবে কিসের মুজাহিদ তুমি? পবিত্র কুরআন শরীফে কি আল্লাহ বলে দেননি যে, "আর প্রস্তুত কর তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যা কিছু সংগ্রহ করতে পার নিজের শক্তি-সামর্থের মধ্য থেকে এবং পালিত ঘোড়া থেকে, যেন প্রভাব পড়ে

আল্লাহর শত্রুদের উপর এবং তোমাদের শত্রুদের উপর, আর তাদেরকে ছাড়া অন্যদের উপর, যাদেরকে তোমরা জান না, আল্লাহ্ তাদেরকে চিনেন। বস্তুত আর যা কিছু তোমরা ব্যয় করবে আল্লাহর রাহে, তা তোমরা পরিপূর্ণভাবে ফিরে পাবে এবং তোমাদের কোন হক অপূর্ণ থাকবে না।" (সূরা আনফাল ঃ আয়াত নম্বর ৬০)

কেউ সুন্নত তরক করলে তাকে ফাসেক ফতোয়া দেয়া হয়। অথচ ফরয তরক করলে ফাসেক বলা হয় না। আজকাল তো দেখা যায়, ইমাম সাহেবও অস্ত্র চালাতে জানেন না। মাওলানা, মুহাদ্দেস, মুফতী, পীর-মাশায়েখ এবং সাধারণ মুসলমানগণ যুদ্ধের কলাকৌশল শিখেননি। এ যে একটি ফরয তরক করা হচ্ছে, এর জন্য কোন আফসোস বা অনুশোচনা নেই। গুনাহকে যদি কেউ গুনাহ্ মনে না করে, তবে তওবা নসিব হয় না। নাউযুবিল্লাহ!

শুনেছি বুখারা-তাসখন্দের অনেক বড় বড় মাদ্রাসার ছাত্ররা গোপনে গোপনে আনোয়ার পাশাার নিকট জিহাদী তরবিয়ত নিয়ে তৈরি হচ্ছে। জিহাদের ফান্ডে চাঁদা দিচ্ছে। আর সে কারণে মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ নাকি তাদেরকে মাদ্রাসা থেকে বের করে দিচ্ছে। খানা বন্ধ করে দিচ্ছে, নাম লিস্ট করে লাল ফৌজদের নিকট ধরিয়ে দিচ্ছে। আহ! কি করুণ ইতিহাস! যারা আল্লাহর ফরয হুকুম পালন করার জন্য যুদ্ধের ট্রেনিং নিচ্ছে, তাদের সাথে এ ধরনের ব্যবহার করা হচ্ছে! সন্ত্রাসীর খাতায় নাম লিস্ট হচ্ছে। তাদের অপরাধ, তারা কাফের, বেঈমান, নাস্তিক, মুরতাদ ও জিন্দিকদের সাথে যুদ্ধ করে।

বায়ু বের হলে ওযু ভঙ্গ হয় বিধায় পুনঃ অজু করতে হয়। এ মাসআলা শিখে যদি কোন ছাত্র আমল না করে, অর্থাৎ বায়ু নির্গত হওয়ার পর অযু না করে কোন ছাত্র যদি নামায আদায় করে, আর যদি ওস্তাদগণ জানতে পারেন, তবে কঠোর শাস্তি প্রদান করেন। দুঃখের বিষয়, অসংখ্য জিহাদের আয়াত ও হাদীস অধ্যয়ন করে যদি কেউ জিহাদ না করে, তবে ওস্তাদগণ তাকে শাসন করেন না। পবিত্র জিহাদ তরক করার কারণে আজ তাসখন্দ, সমরকন্দ, বোখারা, তাজাকিস্তান, উজবেকিস্তান, তুর্কিস্তানসহ আরো অনেক ভূখণ্ডে চলছে মুসলিম নিধনের মহড়া। বন্ধ করে দিচ্ছে মসজিদ, মাদ্রাসা, গীর্জা ও মন্দির। কোন ধর্মের

প্রতি কমিউনিস্টরা শ্রদ্ধাশীল নয়। ইসলামের কর্ণধার ওলামায়ে কেরাম জিহাদকে নির্বাসন দিয়েছেন। তাই দ্বীনের ধারক-বাহক ওলামা-তালাবাদের উপরই আসছে আযাব। নবী জামানায় এক লক্ষ বা সোয়া লক্ষ ছাহাবা ছিলেন। তাদের মধ্যে জিহাদের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেননি বা জিহাদ করেননি, এমন একজন ছাহাবার নাম কুরআন-হাদীসে পাওয়া যায় না।

সাইয়েদুল মুরসালীন রাহমাতুল্লিল আলামীন খাতামুন নাবিয়্যীন আমীরুল মুজাহেদীন হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) জীবদ্দশায় সাতাশটি জিহাদের ফিল্ড মার্শাল হিসেবে স্বশরীরে দায়িত্ব পালন করেছেন। এসব ঘটনা কি আমাদের নিকট আদর্শ নয়? দুনিয়ার ইতিহাসে তিনি ছিলেন সবচেয়ে বড় সমরবিদ। নবীয়ে দুজাহা (সাঃ) মসজিদে নববীর মধ্যে শুধু নামায-রোযা, হজ্ব-যাকাতের নসিহতই করেনি, জিহাদের অনুশীলনও করেছেন। আম্মা আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ)কে নিয়ে মহানবী প্রাণভরে জিহাদের অনুশীলন অবলোকন করেছেন। উম্মত আজ এমন গুরুত্বপূর্ণ ফরয আমলকে ভুলতে বসেছে।

ছায়েমার জবান থেকে এমন জ্ঞানগর্ভ আলোচনা শুনে আমি অবাক হয়ে গেলাম। সে আরো বলল, "খোবায়েব ভাই! শুনুন, সেদিন আমাদের মহল্লায় কমিউনিস্ট হায়েনারা প্রবেশ করে একের পর এক ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে দিয়েছে। বন্দী করেছে শতাধিক নারী-পুরুষ। এর মধ্যে আলেম ও তালেব এলেমের সংখ্যা বেশী। কমিউনিজম গ্রহণ না করাই হল তাদের অপরাধ। বন্দীদের মধ্যে আমিও একজন। আমাদেরকে নিয়ে এল সেনা ছাউনীতে। গ্রেফতারের সাথে সাথে আমি আমাকে মহান রাব্বুল আলামীনের কাছে সোপর্দ করে দিলাম। ইজ্জত-আব্রুর হেফাজতের জন্য খুব বেশি দোআ করলাম। হায়েনারা আমাদেরকে সেনা ছাউনীতে এনে বেদম প্রহার আরম্ভ করল। নারী-পুরুষের বুকফাটা চিৎকারে আকাশ ভারী হয়ে উঠছিল। এক পর্যায়ে যুবতীদের বিবস্ত্র করে পিতা-মাতার সামনে গণধর্ষণ করতে লাগল। উহ! কি করুণ ঘটনা। আলেমদের দাড়ি কেটে দিগম্বর করে প্রহার করছে। বেশ ক'জন সাথে সাথে শহীদ হয়ে জান্নাতবাসী হয়েছেন।

তারা আমাদেরকে তিনদিন সেনা ছাউনীতে রাখে। তারপর ভেড়ার

পালের মত এ বিজন পরিত্যক্ত ভবনে নিয়ে এল। আমার সামনে অনেককেই শহীদ করা হল। আমি আমার উড়নীতে চেহারা ঢেকে সব দেখেছি। ওরা কিভাবে অস্ত্র খোলে, কিভাবে ফিট করে, ম্যাগজিন খোলা-লাগানো, গুলী ভরা, ফায়ার করলে গুলী কেন আটকে যায়– এসব বিষয় খুব ভালভাবে প্রত্যক্ষ করেছি। আশা করি আমি অস্ত্র চালাতে পারব, কোন অসুবিধা হবে না। অস্ত্র মোছা, তেল লাগান, পার্টসে পার্টসে খোলা ও ফিট করা আমার জন্য কোন ব্যাপার নয়। থ্রি-নট-থ্রি, স্টেনগান, মেশিনগান, শর্টগান, ক্লাশিনকভ, একে-৪৭ রাইফেল, এসএলআর, এসএমজি, এমজি, রকেটলাঞ্চার ইত্যাদি অস্ত্র সম্পর্কে আমাকে কারো নিকট জিজ্ঞেস করতে হবে না। তাছাড়া গ্রেনেড নিক্ষেপ কিভাবে করতে হয়, তাও দেখেছি। তবে ডিনামাইট ও মাইন ফাটান শিখতে পারিনি।"

ছায়েমা যখন অস্ত্রের নামগুলো ফর ফর করে বলছিল, তখন আমি ওর মুখের দিকে হা করে তাকিয়ে রইলাম। তারপর ছায়েমা এসএলআরটি হাতে নিয়ে তা খুলল এবং লাগিয়ে দেখাল। কিভাবে ফায়ার করতে হয়, কিভাবে নিশানা ঠিক করতে হয়, এসব আমাকে শেখাল। আমিও তার সামনে বারবার খুলেছি ও ফিট করেছি। তবে প্রথম প্রথম একটু অসুবিধা হচ্ছিল। তারপর সবই ঠিক হয়ে যায়। এগুলো শেখার পর সাহসে-আনন্দে বুক ভরে গেল, যা জীবনে কোন দিন পাইনি। আমি আল্লাহর শোকর আদায় করতে লাগলাম।

[আট]

আমি অল্পক্ষণেই সায়েমার কাছ থেকে অস্ত্র চালানোর সব কলাকৌশল শিখে নিলাম। এখন একটা ফায়ার করে অভিজ্ঞতা যাচাই করতে মনে বিরাট কৌতূহল জাগল। তাই কাকিং হেন্ডেল টেনে স্টিগারে শাহাদাত অঙ্গুলী বাড়িয়ে দিয়ে একটি টান দেব। ছায়েমা আমার অভিপ্রায় বুঝতে পেরে চোখের পলকে লক্ টেনে আমার হাত চেপে ধরল এবং বলল, "খোবায়েব ভাইয়া! তুমি একি করছ? তুমি বোকা নাকি। দু'তিন কিলোমিটার দূরে সেনা ছাউনী। ফায়ারের শব্দ শোনা মাত্র শকুনীর মত ঝাঁকে ঝাঁকে ছুটে আসবে সেনাবাহিনীর সৈন্যরা। গুলী বৃষ্টিতে ঝড়ে যাবে বৃক্ষরাজির পত্রপল্লব।"

আমি ছায়েমার কথায় অবুঝ মনকে কিছুতেই প্রবোধ মানাতে পারলাম না। তাই লক্ পেছনে টেনে শাহাদাত অঙ্গুলী সামান্য টান দিতেই বিকট আওয়াজে বেরেল দিয়ে বেরিয়ে গেল একটি গুলী। বন্য পশু-পাখি গুলীর শব্দে হুমড়ি খেয়ে এদিক-ওদিক ছুটাছুটি আরম্ভ করল। আমিও আনন্দে আত্মহারা।

বুদ্ধিমতী ছায়েমা আমাকে প্রবোধ দিয়ে বলল, "ভাইজান! যা হওয়ার হয়ে গেছে। এখন আর মিছামিছি চিন্তা করে লাভ নেই। চলুন, আমরা অতি তাড়াতাড়ি এ স্থান ত্যাগ করি। অন্যথায় আমাদেরকে লাল বাহিনীর হিংস্র থাবায় পড়তে হবে।"

আমি ছায়েমার কথামত ছামানা গুছিয়ে তার পদাংক অনুসরণ করলাম। হাঁটতে হাঁটতে বেশ কিছুদূর গিয়ে একটি নীচু জায়গায় বিরতির রেখা টানলাম। একদিকে প্রবাহিত হচ্ছে খরস্রোতা নদী। অপরদিকে রয়েছে বিশাল পাহাড়। তারই মাঝখানে আশ্রয়ের উপযুক্ত জায়গা বেছে নিলাম। এখানে দুশমন এত সহজে আক্রমণ করতে আসবে না। যদিওবা আসে, তবে জীবন নিয়ে পালাবার সময়টুকু তাদের ভাগ্যে জুটবে না। এখন আমরা অনেকটা নিশ্চিন্ত। তাই দু'জনে বসে জীবনের সব কিচ্ছা-কাহিনী আর গল্প-গুজব করছি। একজনে বলি আর অপরজন শুনি, পালাক্রমে চলছে আমাদের গল্প-গুজব।

এমনই এক আনন্দঘন মুহূর্তে হঠাৎ দেখলাম, ডজনখানেক সৈন্য খুব সতর্কতার সাথে নদীর কূল ঘেঁষে আমাদের দিকে আসছে আর এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। এ দৃশ্য দেখার সাথে সাথে ছায়েমা হাতে অস্ত্র তুলে নিল। আমিও তাকে অনুসরণ করলাম। ছায়েমা তিমছা হালতে (কুমিরের মত) ফায়ার পজিশনে চলে গেল। আমিও তাই করলাম। এতক্ষণে দুমশন আমাদের রেঞ্জের ভেতরে এসে গেল। ছায়েমা একযোগে ফায়ার করার ইঙ্গিত দিল। আমরা দু'জনে 'অমা রামাইতা ইয রামাইতা অলা-কিন্নাল্লাহা রামা' বলে ট্রিগার টেনে ধরলাম। মুহূর্তে গর্জে উঠল এসএলআর। চোখের পলকে এক ঝাঁক গুলী কেড়ে নিল বারজন বেঈমান লাল সেনাদের জান। ঝাঁঝরা করে দিল হায়েনাদের বক্ষদেশ। লুটিয়ে পড়ল ধরাতলে। আমরা আনন্দে আত্মহারা। আমরা আল্লাহর শোকর আদায় করতে করতে সেজদায় লুটিয়ে পড়লাম।

ছায়েমা আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল গনীমত কুড়ানোর জন্য। গনীমত হিসেবে আমাদের হস্তগত হল তিনটি রাইফেল, চারটি স্টেনগান, দু'টি ক্লাশিনকভ, একটি এসএলআর, দু'টি এলএমজিও পাঁচটি গ্রেনেড। ম্যাগজিন ষাটটি, গুলীর বাক্স বারটি, পানির বোতল বারটি, হাতঘড়ি সাতটি, চিনি-মিশ্রিত ভুট্টার ছাতু প্রায় পাঁচ কেজি, ডলার দু'হাজার তিনশ'। তাছাড়া কাপড়-চোপড়, বেল্ট, জুতা, লাইনার, টুপি ও হেলমেট– সব মিলে ওজন হবে প্রায় দুই মণ।

এসব মালামাল সামলানো আমাদের জন্য ছিল খুবই কষ্টকর। তবু হেফাজত করতে হবে। দু'জনে মিলে অল্প অল্প করে মালগুলো বহুদূরে সরিয়ে নিয়ে গেলাম। তারপর আল্লাহর শুকর আদায় করতে লাগলাম। আল্লাহর দরবারে কাতর হয়ে প্রার্থনা করলাম, হে আল্লাহ! তোমার খাছ রহমতে নিরস্ত্র অসহায় বান্দা-বান্দীদের বিজয় দান করেছ। এ সহজ বিজয়ের আশা আমরা কোনদিন করিনি। এ বিজয় তোমার, এ বিজয় তোমার দ্বীনের। হে আল্লাহ! আমাদেরকে জিহাদের পথে তোমার মর্জি মতে পরিচালিত কর।

ছায়েমার বিচক্ষণতা, বুদ্ধিমত্তা, সাহসিকতা, দূরদর্শিতা, ভদ্রতা, মানবতা, উদারতা, সহিষ্ণুতা, লজ্জাশীলতা ও খোদাভীরুতা ছোটকাল থেকেই। অর্থাৎ, ছাত্রী জীবনেই তার চরিত্রে এসব গুণাবলী ফুটে উঠেছে। আমরা তো কোনদিন কল্পনাও করিনি, ছায়েমা একদিন হবে দেশপ্রেমিক-দ্বীনপ্রেমিক। সে যে হবে উম্মে জিয়াদ, উম্মে আম্মারা, বিবি খানছা ও ছুমাইয়ার স্থলাভিষিক্ত, তা কে জানত। কিন্তু ছাত্রী জীবনেই ছাত্র-শিক্ষক, পাড়া-প্রতিবেশী সবাই তাকে আদর করত, ভালবাসত। এখন ছায়েমা ছোট্ট খুকী নয়, টলমল যৌবনের অধিকারিনী। তাকওয়া ও পরহেযগারী আগের তুলনায় অনেক গুণ বেড়ে গেছে তার। তাছাড়া এখন সে অনাথিনী, অসহায়িনী ও দুঃখিনী। একমাত্র আল্লাহর আশ্রয়ে দিনাতিপাত করছে। জিকির, তিলাওয়াত, ইবাদত-বন্দেগী, দোআ প্রার্থনা, তওবা ও শোকরগুজারিতে লিপ্ত থাকে প্রায় সময়। অলসতার ছোঁয়া তাকে সহজে কাবু করতে পারে না।

একজন মুজাহিদের মধ্যে কি কি গুণ থাকতে হয়, তা বর্ণনা করতে গিয়ে ছায়েমা বলল, "খোবায়েব ভাই! আমরা তো দ্বীনের

মুজাহিদ। আমাদের কি কি গুণ থাকা দরকার, তা আল্লাহপাক তার কালামে এভাবে বলেছেন–

"তারা তওবাকারী, এবাদতকারী, শোকরগোজার, দুনিয়ার সাথে সম্পর্কচ্ছেদকারী, রুকু ও সিজদা আদায়কারী, সৎকাজে আদেশ দানকারী, মন্দ কাজ থেকে নিবৃত্তকারী এবং আল্লাহর দেয়া সীমানাসমূহের হেফাজতকারী। তুমি সুসংবাদ দাও ঈমানদারদেরকে।" (সূরা তওবা ঃ আয়াত ১১২)

এসব নছিহত করতে করতে ছায়েমা একবার বলে উঠল, "ওহে বীর পুরুষ! পেটে তো ক্ষুধার আগুন জ্বলছে, কিছুই তো খাওনি। চল, গনীমতের ছাতু খেয়ে জঠর জ্বালা নিবারণ করি।"

আমি মাথা নেড়ে সম্মতি জানালাম। সে তাড়াতাড়ি ছাতু ও পানি নিয়ে হাজির হল। আমরা কিছু ছাতু পানিতে ভিজিয়ে পেট পুরে খেয়ে নিলাম। তারপর ছায়েমা আমাকে পরামর্শ দিল, এ এলাকার কথা তো দুমশনরা জেনে ফেলেছে। তাই এখানে অবস্থান করা ঠিক হবে না। নদীর ওপারে আশ্রয় পাওয়া যায় কিনা তা অনুন্ধান করা খুব দরকার। দু'এক ঘন্টার মধ্যেই এখান থেকে চলে যেতে হবে। অন্যথায় কখন কোন্ বিপদ আসে তা বলা যায় না।

ছায়েমাকে মালের হেফাজতের দায়িত্বে রেখে আমি নদীর কূল ঘেঁষে হাঁটছিলাম আর নদী পার হওয়ার ফিকির করছিলাম। নদীটি যদিও তেমন প্রশস্ত নয়, কিন্তু বেশ গভীর ও খরস্রোতা। মালামাল নিয়ে সাঁতার কেটে পার হওয়া অসম্ভব। হাঙ্গর-কুমির যে নেই, এমনটি ধারণা করা যায় না। আমি এসব চিন্তা করছি আর আনমনে হাঁটছি। হঠাৎ চেয়ে দেখি, একটু দূরে একটি মাঝারি ধরনের জেলে নৌকা। মাঝি-মাল্লা মাত্র দু'জন। উভয়ের বয়স পঞ্চাশ পার হয়ে গেছে। কিন্তু বয়স যদিও পঞ্চাশের অধিক, কিন্তু সু-স্বাস্থ্যের অধিকারী। বেশ শক্তিশালী বলে মনে হল। গালভরা সুন্নতী দাড়ি। মাছ শিকার করছে পেটের দায়ে। আমি দ্রুতপদে সেদিকে এগিয়ে গেলাম। আমাকে দেখামাত্র ওরা ভয়ে কাঁপতে শুরু করে। কারণ, আমার পরনে সৈনিকের পোশাক, পায়ে জঙ্গল-সু, কোমড়ে বেল্ট, মাথায় ক্যাপ, কাঁধে ক্লাসিনকভ। তাদের ধারণা, আমি লাল বাহিনীর জওয়ান, তাই

পালাতে চাচ্ছে। আমি বাঁশি বাজিয়ে তাদের ডাক দিলাম। ওরা নিরুপায় হয়ে নৌকা তটে ভিড়াল।

ওদেরকে মুসলমান মনে করে আমি সালাম দিলাম। উত্তর আসল, ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু। এবার বুঝতে পেরেছি ওরা মুসলমান। কিন্তু ওদের সংশয় দূর হল না। ওরা ভাবছে আমি কমিউনিষ্ট সৈন্য। আমি যথাসম্ভব অভয় দেয়ার চেষ্টা করি। তারপর নৌকায় উঠে আলাপ জুড়ে দিলাম। প্রথমে নিজের সামান্য পরিচয় দিয়ে আমি তাদের পরিচয়, পারিবারিক অবস্থা ও দেশের বর্তমান পরিস্থিতি জানতে চাইলাম। তাঁরা ভয়ে ভয়ে কিছু বলল। এখনো তাদের ভয় কাটেনি, তা বুঝতে পেরে আমার ইতিহাস কিছুটা বর্ণনা করলে তাদের চেহারায় সরলতার সুপ্ত আভা ফুটে উঠল।

তারা তাদের জীবন বৃত্তান্ত বলতে লাগল। মর্মান্তিক ইতিহাস। দু'জনই চাকুরী নিয়েছিলেন সেনাবাহিনীতে বিশ বছর আগে। মুসলমান হওয়ার অপরাধে চাকুরী হারিয়ে কোনরকম জীবন-ধারণের ক্ষীণ আশায় মাছ শিকারের পথ বেছে নিয়েছেন। খবিছ ও বাতিল লেনিনের সমাজতন্ত্র আন্দোলন যখন সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে, তখন পুলিশ ও সেনাবাহিনীর মধ্যে অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। ইসলামী মূল্যবোধ, ইসলাম অনুরাগী ও ইসলামে বিশ্বাসী যাদেরকে বুঝতে পেরেছে, তাদেরকেই ছাঁটাই করেছে। কেউ স্বেচ্ছায় জীবন নিয়ে পালিয়ে গেছে। আবার অনেককে এক সারিতে দাঁড় করিয়ে ব্রাশফায়ার করে হত্যা করেছে। আবার অনেক সৈন্যদের ধরে সাইবেরিয়ায় প্রেরণ করেছে। অনেক মুসলিম সেনাবাহিনীর ঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে। তাদের অপরাধ শুধু এতটুকু যে, তারা ঈমানের পরিবর্তে সমাজতন্ত্রকে গ্রহণ করেননি। নবীয়ে দু'জাহা (সাঃ)-এর পরিবর্তে লেনিন আর কালমার্কসকে নেতা হিসেবে মেনে নেননি।

দু'জনের একজন ছিলেন আর্টিলারী ডিভিশনাল প্রধান। নাম ইয়ার মোহাম্মদ গোভী। অপরজন হাবিলদার জাফর লুধী। উভয়ই ছিলেন আলমাআতার বাসিন্দা। মাছ শিকার করা অর্থাৎ জেলের কাজ বেছে নেয়ার কারণ, জানতে চাইলে হাবিলদার জাফর লুধী বললেন, "স্থলে বিচরণ করা আমাদের জন্য নিরাপদ নয়। কারণ, সবগুলো গোয়েন্দা

সংস্থা পাগলা কুকুরের মতো হন্যে হয়ে আমাদেরকে খুঁজছে। যদি একবার ধরতে পারে, তবে আর রক্ষা নেই। জ্যান্ত কবর দেবে আমাদেরকে। তাই নদীতে ভেসে বেড়ান এবং জেলের মত নিম্নমানের কাজ করাটাই আমাদের জন্য নিরাপদ মনে করি।" আমি আবার প্রশ্ন করলাম, স্যার! বর্তমান পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পাওয়ার কোন রাস্তা আছে কি? উত্তরে ইয়ার মোহাম্মদ গোভী বললেন, "জিহাদ ছাড়া মুসলমানদের টিকে থাকার জন্য কোন পথ আল্লাহ ও তার রাসূল (সাঃ) বাতলিয়ে যাননি।"

আমি আবার প্রশ্ন করলাম, স্যার, এদেশে কিভাবে কোন্ পদ্ধতিতে কার নেতৃত্বে জিহাদ করব? তিনি বললেন, "বাবা! তোমার প্রশ্ন খুবই জটিল।" তারপর একটু নীরবতা অবলম্বন করে এক দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, "বাবা! সমাজতন্ত্রের প্রবক্তারা খুব সুকৌশলে সর্বস্তরে প্রবেশ করেছে। বিশেষ করে আলেম-ওলামা, পীর-মাশায়েখদের ঐক্যকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে শতধা বিভক্ত করে দিয়েছে। এখন তারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ চিন্তা ও মতাদর্শ নিয়ে নিজ নিজ ব্যানারে কাজ করছেন। প্রত্যেকে নিজেকে একজন যুগ-সংস্কারক বা মুজাদ্দিদ হিসেবে মনে করছেন। তারা পরামর্শ করে এক প্লাটফরমে কাজ করতে আগ্রহী নন। মুসলমানদের ঐক্যের সেতুবন্ধন হল জিহাদের ময়দান। আজ তারা জিহাদের মতো গুরুত্বপূর্ণ ফরয এবাদতকে ছেড়ে দিয়েছেন। পূর্ব যুগের ওলামাদের ইতিহাস তো ছিল গৌরবোজ্জ্বল। তারা দ্বীনের জন্য বুকের তাজা রক্তে ইতিহাস সৃষ্টি করে গেছেন। তারা ছিলেন দ্বীনের ধারক-বাহক। তাদের হাতে শোভা পেত কালেমা-খচিত ইসলামের বিজয় নিশান। তাদের কটিদেশে ঝুলত শাণিত তরবারী। আজ ওলামায়ে কেরাম পূর্বপুরুষদের ইতিহাস ভুলে গিয়ে কাঁদা ছোঁড়াছুঁড়ির খেলায় মেতে উঠেছেন। একে অপরের বিরুদ্ধে ফতোয়া প্রদান করে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছেন। নিজেরা জিহাদ তরক করছেন। আর যারা জিহাদের ফরজিয়াত পালন করতে চান, তাদের বিরুদ্ধে ফতোয়া, লিফলেট, বিজ্ঞাপন, ইশতিহার ছাপিয়ে বিতরণ করছেন। তাছাড়াও সভা-সমিতি, সেমিনারে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে মিথ্যা, বানোয়াট ও কাল্পনিক অপবাদ দিয়ে সরলমনা সাধারণ মুসলমানদেরকে বিভ্রান্ত করছেন।" আমি প্রশ্ন

করলাম, স্যার! আপনি কি আলেম? এ সব কোত্থেকে জানলেন? তিনি বললেন, "বাবা! আলেম বলে দাবী করতে সাহস পাই না, তবে কিছুদিন তাফসীর-হাদীস ও ফেকাহ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছি।" আমি বললাম, হুজুর! শতধাবিভক্ত সমাজে জিহাদ করা কি সম্ভব? তিনি বললেন, "জিহাদ নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাতের মতই তো ফরয। দুনিয়ার কেউ যদি নামায না পড়ে, রোযা না রাখে, যাকাত না দেয় ও হজ্ব না করে, তবে তোমাকে একা হলেও তা আদায় করতে হবে। এ কথা বলে বাঁচতে পারবে না যে, কেউ তো নামায পড়ছে না, তাই আমিও পড়ব না, কেউ যাকাত দেয় না, তাই আমিও দেব না ইত্যাদি। অতএব কেউ জিহাদ না করলে তোমাকে একা হলেও জিহাদ করতে হবে।"

সেনা অফিসারের জবান থেকে এসব মূল্যবান বক্তব্য শুনে আমি বললাম, হুজুর! জিহাদের জন্য আমি আমার জীবনকে ওয়াক্‌ফ করে দিয়েছি। প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারূদ সংগ্রহ করেছি। এখন জিহাদ কিভাবে করব, তা আপনারাই বলে দেবেন বলে আশা রাখি। আমার কথা শুনে উভয়ে মারহাবা মারহাবা বলে মুবারকবাদ জানালেন। আমি করজোড় আবেদন করলাম, হুজুর! আপনাদের নৌকাটি বড় না হলেও মাঝারি ধরনের। দশ-পনেরজন অনায়াসে থাকা যাবে। আপনার সাথে আমাদের দু'জনকেও শামিল করে নিন। আমাদের অনেক হাতিয়ার আছে, এগুলোর হেফাযতও করতে হবে। আশা করি আমাদেরকে আপনাদের নৌকায় আশ্রয় দিয়ে উপকার করবেন।

আমার কথায় তারা খুশি হয়ে আমদেরকে আশ্রয় দিতে সম্মতি জ্ঞাপন করলেন এবং বললেন, "আপনাদের মালপত্র জলদি নিয়ে আসুন।" আমি বললাম, ওসব একা এখানে আনা সম্ভব নয়। দয়া করে নৌকাটা আরো সামনে নিয়ে চলুন এবং আমাদেরকে সাহায্য করুন। আমার কথা মতো তারা বৈঠা ঠেলে নৌকাটি আমাদের মালপত্রের নিকটে নিয়ে এল।

জাফর ভাইয়ের সহযোগিতায় ছায়েমাকে নিয়ে সব মালপত্র নৌকায় তুললাম। মালপত্র দেখে ইয়ার মোহাম্মদ গোভী খুবই বিস্মিত হলেন এবং সীমাহীন খুশি হলেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "ওহে বীর পুরুষ! তোমরা এগুলো পেলে কোথায়? কোন সেনা ছাউনী

লুট করেছ বুঝি?" আমি বললাম, না স্যার, এগুলো গনীমত। কিভাবে হস্তগত হল তা পরে বলব।

আমরা সবাই নৌকায় উঠে বসলাম। এতক্ষণে সূর্য পশ্চিমাকাশে লুকানোর পথ খুঁজছে। একটু পরেই ঘুটঘুটে অন্ধকার নেমে আসবে। আমরা তাড়াতাড়ি অযু করে জামাতে নামায আদায় করলাম। ছায়েমা গাফিলতির ভান করে একটু বিলম্বে নামায আদায় করল। ছায়েমা সতর্ক করে বলল, "বিপদের কোন সময় নেই যে, অমুক দিন অতটায় আসবে। বিপদ ঘোষণা দিয়ে আসে না। তাই এক্ষুণি এখান থেকে বিদায় নিন। অন্যথায় বড় ধরনের ক্ষতি হতে পারে।" ছায়েমার কথামত আমরা অন্যত্র চলে যাওয়ার আয়োজন করলাম।

আর্মি ডিভিশনাল প্রধান ইয়ার মোহাম্মদ গোভী কান্ডারী সেজে পেছনের বড় বৈঠা ধরলেন। আমি ও হাবিলদার জাফর লুধী দু'জনে দু'টি দাঁড় দু'দিকে টানতে আরম্ভ করলাম। জীবনে এই প্রথম আমি বৈঠা হাতে ধরলাম। ছায়েমা বসে আছে নৌকার সম্মুখে। নতুন মাঝি, নতুন মাল্লা, নতুন সফর। ছায়েমা তার অভ্যাস অনুযায়ী তিলাওয়াত করছে। ভাটিয়ালী সুর ধরার জন্য কোন গায়ক নেই। বৈঠা ঠেলে চলছি অজানার উদ্দেশ্যে। আমরা কোথায় যাচ্ছি, তা কান্ডারীর জানা নেই। নদীর কলতানে বৈঠা চালনা এক ধরনের মনে আনন্দের বিষয়। জাফর ভাই ও আমি একই সাথে বসে দাঁড় টানছি। দু'একটু আলাপও করছি।

জাফর ভাই ছায়েমার দিকে ইশারা করে বললেন,"এত অল্প বয়সে সৈনিকের চাকুরী! সৈনিক হওয়া তো অনেক কঠিন কাজ। কত সুন্দর চেহারা, কি সুন্দর চাহনি। টগবগে এক তরুণ সিপাহী।"

ওরা মনে করেছে আমরাও তাদের মতো পলাতক সৈন্য। অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে পলায়ন করেছি। জাফর ভাইয়ের কথায় বুঝতে পারলাম, ছায়েমা যে নারী, তা তারা এখনো ধরতে পারেননি।

ছায়েমাকে তারা অল্প বয়সের যুবক বলে মনে করছেন। আর বুঝতে না পারার কারণও রয়েছে। পরনে প্যান্ট, শার্ট, তার উপর মোটা জ্যাকেট। লম্বা চুলগুলো সুন্দর করে নীচে ফেলে হেলমেট মাথায় দিয়েছে। কাজেই মেয়ে হিসেবে চেনার আর জো নেই।

আমাদের নৌকা এতক্ষণে বহু দূরে চলে এল। ছায়েমা নৌকায়

বসে বসে নদীর দু'ধারের ঘন বন-জঙ্গলের সবুজ-শ্যামল দৃশ্য দেখছে। আমরা এখন দুশমনের নাগালের বাইরে। সূর্য্যটা যেন ক্লান্ত হয়ে পশ্চিমের গাছগাছালির নীচে লুকাচ্ছে। ক্রমশই কাল আঁধারে চারদিক অন্ধকার হয়ে আসছে। আমরাও তটে নোঙর ফেলে মাগরিবের নামায আদায় করলাম। সকলের পেট ক্ষুধায় চোঁ চোঁ করছে। রুটি বানাতে হবে, সালন রান্না করতে হবে। কে পাকাবে পরামর্শ চলছে। ছায়েমা বলল, "আমি পাকাব, আপনারা পরিশ্রান্ত, অনেক দূর থেকে দাঁড় টেনে আসছেন, আর আমি বসে বসে অলসতার পরিচয় দিচ্ছি।" জাফর ভাই বললেন, "ভাই! তুমি আমাদের মাঝে সবার ছোট, কাজেই আমরা খাওয়ার আয়োজন করি, তুমি বসে বসে দেখ।" কিন্তু ছায়েমা অতি অল্পসময়ে তার নিপুণ হাতে সুস্বাদু খানা তৈরি করে বলল, "আপনারা খানা খেয়ে নিন।" ছায়েমার কথায় সবাই অবাক! একি! এত তাড়াতাড়ি খানা তৈরি হয়ে গেল! আমরা হাত-মুখ ধুয়ে ছৈয়ের ভেতর প্রবে করে দেখি দস্তরখানা সাজানো। সবাই একত্রে বসে খানা খেলাম। এতো মজাদার খানা ও নিপুণ পরিবেশন দেখে সকলেই ছায়েমার প্রশংসা করতে লাগলেন।

[নয়]

ছায়েমা ও জাফর ভাইকে রাতের প্রথম ভাগের পাহারার দায়িত্ব দেয়া হল। বাকি দু'জন নৌকায় শুয়ে পড়ল। গভীর রাত। কারো চোখে ঘুম নেই। আমি ছটফট করে এপাশ-ওপাশ করছি। জেনারেল সাহেব আমাকে বললেন, "কি খোবায়েব! ঘুমাচ্ছ না যে?" আমি বললাম, স্যার! খুব অস্থিরতা অনুভব করছি। বড় ধরনের আক্রমণের আশংকা করছি। তিনি বললেন, "হ্যাঁ, আমার অবস্থাও তাই। যাও ওদেরকে ডেকে আন।" আমি ছায়েমা ও জাফর ভাইকে ডেকে আনলাম। তারপর ইয়ার মোহাম্মদ গোভী সকলের মনের অবস্থা জিজ্ঞেস করলেন। সকলের জবান থেকে একই কথা বের হয়ে আসে।

ছায়েমা বলল, "দুশমনের গতিবিধি লক্ষ্য রাখা দরকার। অন্যথায় ভয়াবহ অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে।"

এক বাক্যে সকলেই ছায়েমার কথায় সমর্থন জানালাম। এখন কে যাবে, তা নিয়ে পরামর্শ করা হল। আলোচনা-পর্যালোচনার পর

আমাকেই সাব্যস্ত করা হল। ছায়েমা আমার সাহায্যে সঙ্গে যেতে চাইলে আমীরে ফয়সাল ইয়ার মোহাম্মদ গোভী নিষেধ করলেন। তাই আমি একাই যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছি। ছায়েমা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, "ভাইয়া! দশদিক আঁধারে ছেয়ে আছে। একা একা এ গভীর অরণ্য কিভাবে পাড়ি দেবে? সাপ-বিচ্ছু ছাড়াও হিংস্র প্রাণীর ভয় আছে।"

আমি তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাকে হেফাজত করবেন। তোমরা দোআ করতে থাক।

ছায়েমা নিজ হাতে কমিউনিস্ট মার্কা পোশাকটি আমার গায়ে পরিয়ে দিল। চোখের পানি সামলিয়ে রাখতে ব্যর্থ হল সে। তার গণ্ডদ্বয় গড়িয়ে কয়েক ফোঁটা তপ্ত অশ্রু আমার পদযুগলে পতিত হল। আমি মাথা তুলে তার দিকে তাকাতেই সে চেহারা ঘুরিয়ে নিল। আমি তাকে সান্ত্বনা ও অভয় দেয়ার চেষ্টা করলাম। ছায়েমা আমার হাত দু'টি চেপে ধরে করুণ সুরে বলল, "খোবায়েব ভাইয়া! তুমি যে আমার একমাত্র দুঃখের সাথী। তুমি যে আমাকে সুনিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছ। তুমি যে একা একা দুশমনের ভেতর থেকে রক্তাক্ত অবস্থায় আমাকে উদ্ধার করেছ। ভাইয়া, তোমাকে দুশমনের এলাকায় পাঠিয়ে আমি কি করে শান্তিতে থাকতে পারি?"

আমি তার মাথায় হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে বিদায় নিলাম। ছায়েমা আমার পথপানে অপলক নেত্রে তাকিয়ে আছে। আমি হারিয়ে গেলাম অন্ধকারে। সামান্য পথ অগ্রসর হতেই অনুভব করলাম, পেছন দিক থেকে কে যেন এদিকে ছুটে আসছে। পায়ের শব্দ পেলাম। ঘাড় ফিরিয়ে দেখি ছায়েমা। এ কি! তুমি আবার আসছ যে? সে আমার হাতে একটি পুটুলী গুঁজে দিয়ে বলল, "কয়েকটি রুটি দিলাম, রাস্তায় খেয়ে নিও। আর এখানে কয়েকটি ডলার আছে, প্রয়োজনে খরচ কর।" এই বলে সে চলে গেল। তার বিচক্ষণতা দেখে আমি অবাক হলাম। আমি তাড়াহুড়া করে চলে এসেছি। কিছুই সাথে আনিনি।

আমি বনের ভেতর দিয়ে চলছি। সাথী একমাত্র আল্লাহ। ভীষণ অন্ধকার। কিছুই দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না। লতাগুল্ম বারবারই আমার পা জড়িয়ে ধরছে। সামনে চলতে বাঁধার সৃষ্টি করছে। চলার গতি রোধ করে দিচ্ছে। কন্টকাকীর্ণ পথ। শত্রুতাবশত যেন আমার পা ফুটো করে দিতে

চাইছে। কিন্তু জুতো থাকার কারণে তা পারছে না। তবে জামা-কাপড় আঁকড়িয়ে ধরতে একটুও দ্বিধা করছে না। এভাবে সবগুলো বাধা অতিক্রম করে আমি এগিয়ে চলছি। আমার পায়ের শব্দে বন্য প্রাণীরা হুমড়ি খেয়ে পালাচ্ছে। পাখিরা ভয়ে ডানা মেলে পত পত আওয়াজ করে উড়ছে। কেউটেরাও আমার পথ ছেড়ে গর্তে লুকাচ্ছে। এভাবে বন-জঙ্গল পেরিয়ে যখন আমি সমতল ভূমিতে এসে পৌঁছি, তখন রাত প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

আরো কিছু পথ অগ্রসর হওয়ার পর শহরতলীর বাতিগুলো আবছা আবছা নজরে পড়তে শুরু করে। আমি আরো দ্রুত হাঁটতে লাগলাম। ফজরের সময় আলমাআতা এসে পৌঁছলাম। নামাযের জন্য একটি মসজিদে গিয়ে অযু করে সুন্নত পড়ে বসে রইলাম। হায়! আযান হল না। মুসল্লীরও কোন খোঁজ নেই। হঠাৎ মনে পড়ল সেদিনের কথা, শহরের মসজিদগুলোর কথা। আযান দিলে তো আর রক্ষা নেই। তাই একা একা নামায আদায় করে নিলাম। কোথায় যাব, কি করব ভাবছি। অবশেষে চাচার বাসায় যাওয়ার চিন্তা করলাম। হয়ত সেখানে গেলে কোন সংবাদ পেতে পারি। তাই বিলম্ব না করে সোজা চাচার বাসায় চলে গেলাম। চাচা সবেমাত্র নামায পড়ে তছবিহ পাঠ করছেন। তিনি হঠাৎ আমাকে দেখে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "বাবা! তুমি ফিরে এসেছ? তোমার চিন্তায় তো আমরা অস্থির। প্রতিদিন তোমার পথপানে চেয়ে চেয়ে প্রহর গুনছি।" চাচা নাস্তার জন্য হুকুম দিলেন। আমি বললাম, না চাচা, নাস্তার প্রয়োজন নেই, আমার নিকট নাস্তা আছে। এই বলে পুটুলি খুলে রুটি বের করে চাচাকে নিয়ে খেলাম। তারপর শহরের অবস্থা জানতে চাইলাম।

চাচা বললেন, "জামিউল উলুম মাদ্রাসায় সেনাবাহিনীরা ক্যাম্প তৈরি করেছে। ওরা দশ-বারজন সৈন্যকে মুজাহিদদেরকে ধরে আনতে অরণ্যে পাঠিয়েছিল। সেখানে মুজাহিদরা আস্তানা গড়ে তুলেছে। হাজার হাজার মুজাহিদ জঙ্গলে রয়েছে। মুজাহিদদের পাকড়াও করতে দশ-বারজন শত্রুসৈন্য কিনা খোয়া গেছে। তাই আলমাআতার সবগুলো সেনা ছাউনীতে হৈ চৈ পড়ে গেছে। দাবানলের মত সমস্ত আলমাআতায় ছড়িয়ে পড়েছে এ সংবাদ। তাই বড় বড় জেনারেলগণ জরুরী পরামর্শ

মিটিং তলব করেছেন। আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মুজাহিদদেরকে গ্রেফতার করতে। জেনারেল মার্শাল বোদায়েভের নেতৃত্বে এ অভিযান চালান হবে। তিনি একজন নাস্তিক, দুর্ধর্ষ যোদ্ধা। তার নাম জানে না এমন লোক কাজাকিস্তানে নেই। তার নেতৃত্বেই শত শত আলেমের শাহাদাতবরণ করতে হয়েছে। মা-বোনদের ইজ্জত হারাতে হয়েছে। মুসলমানদের ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে দিয়েছে। লুণ্ঠন করেছে অগণিত দোকানপাট। বন্ধ করে দিয়েছে শত শত মসজিদ-মাদ্রাসা।

কথিত আছে, সরকারী পদস্থ কর্মকর্তাদের মধ্যে যারা দাড়ি রাখত এবং ঢিলা পোষাক পরত, তাদেরকে রাস্তার মোড়ে মোড়ে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে কেরসিন ঢেলে আগুন লাগিয়ে হত্যা করেছে। একজন বন্দী বলেছিলেন, 'দাড়ি রাখার অপরাধে আমাকে যদি হত্যা করা হয়, তবে আমি বলব প্রথমে জাতির কলংক বিশ্ব বেঈমান রাশিয়ার ফেরাউন অবাঞ্ছিত লেনিনকে হত্যা করা হোক। তার মুখেও দাড়ি রয়েছে।' এ কথার উত্তরে জেনারেল মার্শাল বোদায়েভ বলেছিলেন, 'তোমার দাড়ি আরবের মোহাম্মদের দাড়ির মত। তাই তুমি অপরাধী। আর লেনিনের দাড়ি তেমন নয়। লেনিনের মুখে অসংখ্য ব্রণ রয়েছে, দেখতে খুবই বেমানান ও কুৎসিত, তাই ব্রণ ঢাকার জন্য সে দাড়ি রেখেছে। এ দাড়ি মৌলবাদী দাড়ি নয়।'

জেনারেল মার্শাল বোদায়েভ কয়েক প্লাটুন সৈন্য তলব করে আলমাআতায় নিয়ে এসেছে। এদের মধ্য থেকে দু'হাজার পঁচিশজনকে বাছাই করে অরণ্য অভিযানের প্রস্তুতি নিচ্ছে। বাছাইকৃত রণকৌশলীদেরকে আরো মজবুত করার জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নিচ্ছে। জেনারেল নিজেই প্রশিক্ষণ পরিচালনা করছে। এ অভিযানে কি কি অস্ত্র ব্যবহার করা হবে, তা অন্যান্য জেনারেলদের সাথে পরামর্শ করে সাব্যস্ত করেছে। উক্ত অভিযানের নকশা প্রণয়নের জন্য তিনজন কমান্ডো নিযুক্ত করা হয়েছে। এরা অরণ্য ভূমি প্রদক্ষিণ করে নকশা তৈরি করবে। একদিনের মধ্যে খসড়া জমা দেয়ার নির্দেশ দিয়েছে। তিনজনকে তিনটি তাজি ঘোড়া দেয়া হয়েছে অরণ্যে যাওয়ার জন্য। এসব পরামর্শ হচ্ছিল আলমাআতা জামেউল উলুম মাদ্রাসায় বসে। এলাকায় সন্ত্রাসী আর মস্তানরা সবসময় সেনা ছাউনীতে যাতায়াত করে,

পথঘাট দেখায়, বাজার-সওদা করে দেয়, মুসলমাদের নাম লিস্ট করে ওদের হাতে দেয়। এলাকার গুপ্তচরবৃত্তির কাজ ঐসব বখাটে ছেলেরাই করে। চাচাজান এসব গোপন তথ্য বাড়িওয়ালার ছোট ভাই থেকে সংগ্রহ করেছেন। আগামীকাল সকাল সাতটায় তিনজনের গোয়েন্দা টিম তথ্য সংগ্রহের জন্য জঙ্গলে যাবে।"

চাচার কথাগুলো শুনে আমার শরীর শিউরে উঠল। বুক দুরু দুরু কাঁপছে। আমরা মাত্র চারজন আর দুশমনের সংখ্যা দু'হাজার পঁচিশ। তাদের সাথে মোকাবেলা করা কিভাবে সম্ভব?

আমি নতশীরে এসব চিন্তা করছি। হঠাৎ মনে এক নতুন সাহস, নতুন বল ও নতুন আশার সঞ্চার হল। আল্লাহ আছেন। আল্লাহ সবসময় দুর্বলদের সাহায্য করেন। আবরাহার হস্তিবাহিনীকে তিনি পরাভূত করেছেন আবাবীল পাখি দ্বারা। ফেরাউনকে ধ্বংস করেছেন পানি দ্বারা। নমরূদকে খতম করেছেন ল্যাংড়া ও কানা মশা দ্বারা। আবু জাহেলকে হত্যা করেছেন অপ্রাপ্তবয়স্ক দু'বালক দ্বারা। আল্লাহ বড় বড় শক্তিগুলোকে ছোট ছোট শক্তি দ্বারা খতম করিয়ে তাঁর কুদরত জাহির করেছেন। আল্লাহ নিশ্চয়ই আমাদেরকেও সাহায্য করবেন। এসব কথা বারবার আমার মনের মধ্যে উদয় হচ্ছিল। মনে হল আল্লাহর পক্ষ থেকেই কুদরতী এসব যুক্তি ও চিন্তা আমার দিলে আসল। তাই মুহূর্তের মধ্যে আমার মনের সমস্ত ভয় ও সংশয় উধাও হয়ে গেল।

আমি চাচাকে বললাম, আমাকে এখনই ফিরে যেতে হবে। হয়ত সাথীরা খুব চিন্তা করছেন। চাচা জিজ্ঞেস করলেন, "বাবা! তুমি না একা, সাথী পেলে কোথায়?" আমি চাচাকে সব ঘটনা খুলে বললে তিনি খুশীতে আত্মহারা হয়ে গেলেন। সংবাদ নিয়ে সাথীদের নিকট যাওয়ার জন্য দ্রুতগামী একটি ঘোড়া নিয়ে এলেন। ঘোড়াটা দেখতে খুবই সুন্দর। আমি কোনদিন ঘোড়ায় চড়িনি। কিভাবে চড়তে হয়, তাও জানি না। চাচাকে আমার সমস্যাগুলো খুলে বললাম। চাচা উত্তর দিলেন, "বাবা! তোমাকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও ভদ্র ঘোড়া দিয়েছি, যেন কোন অসুবিধা না হয়।"

তিনি একটি লাল তাজী ঘোড়ার কাছে দাঁড়িয়ে আমাকে ডাকলেন। আমি নিকটে গিয়ে দাঁড়ালে চাচা ঘোড়াকে লক্ষ্য করে হাত বুলাতে

বুলাতে বললেন, "ইনি দ্বীনের মুজাহিদ, আল্লাহর সৈনিক। এখন থেকে ইনি তোমার সহিস, তোমার মালিক, তার কথা মতো চলবে।"

ঘোড়া কথাগুলো কান পেতে শুনছিল। চেয়ে দেখি, ঘোড়ার চোখ দিয়ে টপ টপ করে অশ্রু ঝরছে। ঘোড়া যে মানুষের কথা বুঝে, এত যে প্রভুভক্ত তা শুধু পুস্তকে পড়েছি, চোখে দেখিনি। ঘোড়া আমার পায়ে দু'তিনবার মাথা ঠুকাল। কারণ কিছুই বুঝিনি। চাচা বললেন, "বাবা! ঘোড়া তোমাকে প্রভু হিসেবে বরণ করে নিয়েছে।"

এখন আর দেরি করা ঠিক হবে না। আমি চাচাকে সালাম দিয়ে বিদায় নিয়ে ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসলাম। ঘোড়া আমাকে নিয়ে ঠক্ ঠক্ করে দৌড়াচ্ছে। আহ! কি আনন্দ! আমি শুধু লাগাম টেনে ধরলাম। লাগামের সাহায্যেই ডানে-বাঁয়ে পরিচালনা করছি। শহরকে বাঁয়ে ফেলে গ্রামের মেঠোপথ বেয়ে এগিয়ে চলছি। অল্প সময়ের মধ্যেই আমি গভীর অরণ্যে হারিয়ে গেলাম।

আমার সাথীরা ঘোড়ার পদধ্বনিতে ভয় পেয়ে গেল। ওরা ভাবছে আর রক্ষা নেই, নিশ্চয়ই লাল বাহিনী ছুটে আসছে তাদের ধরতে। সকলেই পজিশন নিয়ে অপেক্ষা করছে। বীরাঙ্গনা ছায়েমাও ক্লাশিনকভ নিয়ে বড় একটি বৃক্ষের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে। কিছুটা নিকটে আসলেই তার কাঙ্খিত মানুষটিকে আল্লাহর দেয়া দূরবীনের রেঞ্জে নিয়ে আসে। আমি প্রথমে ওকে চিনতে পারিনি। আরো একটু নিকটে এলে ছায়েমা তার মেয়েসুলভ অভিনব ভঙ্গিতে আমার সামনে দাঁড়াল। আমি সালাম দেয়ার আগেই সে সালাম দিয়ে মুচকি হাসি হেসে জিজ্ঞেস করল, "মুজাহিদ ভাইয়া! ফিরে এসেছ। এত তাড়াতাড়ি আসবে তা তো ভাবিনি।" আমি জিজ্ঞেস করলাম, এত দূরে এসে একা একা দাঁড়িয়ে আছ কেন? সে উত্তর দিল, "তোমাকে হারিয়ে কি আমি নিশ্চিন্তে বসে থাকতে পারি?"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, নৌকা এখান থেকে কতদূর? অন্য সাথীরা কেমন আছেন? ছায়েমা উত্তর দিল, "তারা সবাই ভাল আছেন।" আমি ছায়েমাকে ঘোড়ায় উঠার জন্য বললাম। সে আমার পেছনে উঠে বসল। ঘোড়া তার মেজাজ মত সামনে চলল। অল্পক্ষণেই নৌকায় এসে পৌছলাম। আমি ঘোড়া থেকে নেমে ঘোড়াটিকে কাঁচা ঘাসে বেঁধে দিয়ে

নৌকায় গিয়ে বসলাম। জাফর ভাই ও ইয়ার মোহাম্মদ এগিয়ে এলেন। সালাম-মুসাফাহা সেরে কুশল বিনিময় করলাম। ছায়েমা তাড়াতাড়ি খানা নিয়ে এসে বলল, "ভাইজান! ক্ষুধায় তো চোখ দু'টি বেরিয়ে গেছে। আগে খেয়ে নিন, তারপর কথা হবে।"

আমি খানা খেতে বসলাম। বাকি সবাই আমার পাশে এসে বসল। ছায়েমা খানা পরিবেশন করছে। খানা শেষ করে আমরা জরুরী পরামর্শে বসলাম। সকলেই সংবাদের অপেক্ষায় আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। আমি আমার সংক্ষিপ্ত সফরের বর্ণনা দিয়ে বললাম, অরণ্যভূমিতে জেনারেল মার্শাল বোদায়েভ দু'হাজার পঁচিশজন জানবাজ সৈন্য নিয়ে ক্র্যাকডাউনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সে নিজেই সৈন্যদের উচ্চতর প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। তথ্য সংগ্রহের জন্য তিনজন কমান্ডো কিছুক্ষণের মধ্যেই জঙ্গলে আসবে। ওরা সবাই ঘোড়সওয়ার। রিপোর্ট নিয়ে সেনাপতির হাতে পৌছানোর জন্য একদিন সময় দিয়েছে। এতে মনে হয়, আজ বিকেল বা আগামীকালের মধ্যে ক্র্যাকডাউন দেবে।

ছায়েমা তার ঘড়িতে চোখ বুলিয়ে বলল, "এখন আটটা বাজছে। তাদের ক্যাম্প থেকে বের হওয়ার এখনো এক ঘন্টা বাকি। আর এ পর্যন্ত পৌঁছতে আরো প্রায় এক ঘন্টা লেগে যাবে। আমাদের হাতে দু'ঘন্টা সময় আছে। এর মধ্যে যদি প্রস্তুতি নিতে পারি, তবে তিনজনকেই রেখে দিতে পারব। আমার খেয়াল, যেভাবেই হোক ওদেরকে রেখে দিতে হবে।"

আমীরে ফয়সাল ইয়ার মোহাম্মদ গোভী ছায়েমার পরামর্শ গ্রহণ করলেন। মোহ্তারাম আমীর সাহেব তেজোদীপ্ত কণ্ঠে বলে উঠলেন, "ভাইয়েরা আমার! মার্শাল বোদায়েভ একজন নাস্তিক, দুর্ধর্ষ যোদ্ধা। সে ইসলাম ও মুসলমানের অনেক ক্ষতিসাধন করেছে। তার অত্যাচার আজ শুধু আলমাআতায় নয়, তুর্কমেনিস্তান, উজবেকিস্তান, কাজাকিস্তান, আজারবাইজান, তাসখন্দ, সমরকন্দ, বোখারা, বাকু, কালছায়ী, আরালন, মাকাট, জাইলওয়ারদা, মইন্টি ও কারাজালসহ আরো অনেক মুসলিম জনপদে। মুসলমান আজ নির্যাতিত, অসহায়, মজলুম। তাদের পাশে দাঁড়ান সকল মুসলমানদের উপর ফরয ও ঈমানী দায়িত্ব। মুসলমাদেরকে উদ্ধার করার মত কেউ নেই। মুসলিম দেশগুলো বিশেষ

করে রাষ্ট্রপ্রধানরা কাফিরদের গোলামে পরিণত হয়েছেন। দুনিয়া আজ হারিয়েছে খালিদ বিন ওলিদকে, তারেক বিন জিয়াদকে, ওমর বিন খাত্তাবকে, মোহাম্মদ বিন কাসিমকে। তাছাড়া আরো অগণিত বীর পুরুষদেরকে, যাদের হুংকারে পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত কাফির দুনিয়া থর থর করে কাঁপত। আমাদেরকেই আজ তাদের ভূমিকা পালন করতে হবে।"

আমীর সাহেবের ভাষণে সকলের মাঝে নতুন জযবা ফিরে এল। মৃতপ্রাণে বইতে লাগল শোণীত ধারা। ছায়েমা ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, "দুশমন হয়ত অনেক পথ এগিয়ে এসেছে। আমাদের অতি তাড়াতাড়ি তৈরি হওয়া দরকার।" আমীরে ফয়সাল ইয়ার মোহাম্মদ সাহেব সায়েমার কথায় সায় দিয়ে বললেন, "আমাদের পাশের সরু খালটি আঁকাবাঁকা হয়ে গভীর অরণ্যের বুক চিরে অনেক দূর চলে গেছে। আমাদের একজন নৌকা নিয়ে ভেতরে ঢুকে যাবে তাতে নৌকা ও ছামানার হেফাজত হবে। আর বাকি তিনজন অস্ত্রসজ্জিত হয়ে দুশমনের আক্রমণ প্রতিহত করতে হবে। আমাদের অস্ত্র থাকবে এসআর, এলএমজি ও ক্লাশিনকভ। গ্রেনেড আর মাইনও সাথে নিতে হবে। তাছাড়া যোগাযোগের জন্য ওয়ারলেস অবশ্যই রাখতে হবে।"

আমি আমীর সাহবেকে প্রশ্ন করলাম, নৌকা পাহারা দেবে কে? আমীর সাহেব বললেন, "আমাদের মাঝে বয়সে যে সবারই ছোট, তাকেই এ দায়িত্ব দেয়া হল।"

আমীর সাহেবের নির্দেশক্রমে ছায়েমাকে নৌকার হেফাজতে পাঠিয়ে দিলাম। আর আমরা ছামানাপত্র নিয়ে অরণ্যাভিমুখে রওনা হলাম।

আমরা জঙ্গলের শেষপ্রান্তে চলে এসেছি।। আর মাত্র চার-পাঁচশ' গজ দূরেই সমতল ভূমি আরম্ভ হয়ে আলমাআতা পর্যন্ত বিস্তৃত। আমীর সাহেব দুশমনের আগমনের সম্ভাব্য রাস্তায় আমাকে ও জাফর ভাইকে এমবুশ লাগানোর নির্দেশ দিয়ে বলে দিলেন, আমার বাঁশির আওয়াজ শোনামাত্র ব্রাশফায়ার শুরু করবে। আমি ঘোড়া নিয়ে পেছনের দিক চেক দেব, যেন ওরা পালাতে না পারে। ওরা জরিপ শেষ করে ক্যাম্পে ফেরার পথে আক্রমণ করতে হবে। তাহলে জরিপ রিপোর্টটিও আমাদের হস্তগত হবে। হয়ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেয়ে যাব।"

আমি জাফর ভাইকে নিয়ে কাঁটা ও লতাপাতাপূর্ণ এক অন্ধকার ঝোঁপের অভ্যন্তরে গিয়ে ফায়ার পজিশনে জমিনে শুয়ে পড়লাম। আমীর সাহেব ঘোড়া নিয়ে চলে গেলেন পেছনের দিকে।

সকাল ৯টা পেরিয়ে যাবার উপক্রম, দুশমন এখনো আসেনি। আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি। হঠাৎ জাফর ভাই হাতের ইশারায় কি যেন বললেন, এমন সময় ইথারের ঢেউয়ে ভেসে আসল অশ্বের পদধ্বনি ও ঘন্টির আওয়াজ। অল্পক্ষণ পরেই চেয়ে দেখি অস্ত্র সজ্জিত তিন অশ্বারোহী কমান্ডো। ভয়ে বুক থর থর করে কাঁপতে শুরু করে। এরই মধ্যদিয়ে আমাদেরকে পেছনে ফেলে ওরা চলে গেল। আমরা বেঁচে গেলাম। এভাবে প্রায় তিন ঘন্টা অতিক্রম হয়ে গেল। ভাবছিলাম, ওরা হয়ত অন্য পথে চলে গেছে। এমন সময় ফিরে আসা সৈন্যের অশ্বধ্বনি শুনতে পেলাম।

আমরা অস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত। রেঞ্জের আওতায় আসার সাথে সাথে ফায়ার। ব্রাশফায়ার। চোখের পলকে ক্ষতবিক্ষত হয়ে লুটিয়ে পড়ল দু'জন সৈন্য। বাকী একজন আহত অবস্থায় পালাচ্ছে। আমীর সাহেব তার রাস্তা আগলিয়ে দাঁড়ালেন। নিরুপায় হয়ে সে অস্ত্র জমিনে ফেলে হাত উঁচিয়ে তাছলিম তাছলিম আওয়াজে বনবাদার কাঁপিয়ে তুলল। কমান্ডো সাহেব আত্মসমর্পণ করল।

আমীর সাহেব ও জাফর ভাই তিনজনকেই চিনতে পেরেছেন। তারা একই সাথে সেনাবাহিনীতে চাকুরী করেছে। ধৃত কমান্ডোও তাদেরকে চিনতে পেরেছে। আমরা আল্লাহর শোকর আদায় করার নিমিত্বে সেজদায় জমিনে লুটিয়ে পড়লাম। গনীমত পেয়ে গেলাম অস্ত্রশস্ত্র ও তিনটি ঘোড়া। তাছাড়া জরিপ রিপোর্টসহ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সম্বলিত কাগজপত্র। আমরা রসদপত্র, ঘোড়াগুলো ও বন্দীকে নিয়ে অনেক দূরে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে এলাম। দুপুর গড়িয়ে যাচ্ছে। ক্ষুধায় জীবন যায় যায়। আমীর সাহেব নাস্তা খাওয়ার জন্য হুকুম দিলেন। আমরা বন্দীকে নিয়ে ছায়েমার দেয়া রুটি ও পানীয় খেয়ে ক্ষুধার জ্বালা নিবারণ করলাম।

আমীর সাহেব বন্দী থেকে অনেক গোপন তথ্য সংগ্রহ করলেন। জামিউল উলুমের হত্যাকাণ্ডের কথা জানতে চাইলে কমান্ডো সত্য সত্য

বর্ণনা দিল। সে-ই নাকি আব্বুকে ও অন্যান্য আলেমদেরক শহীদ করেছে। লম্পটের সে কি ভয়ংকর চেহারা। সেই তো আমার পিতার ঘাতক। সেই তো ছায়েমার পিতা-মাতার হত্যাকারী। অনেক মসলমানের প্রাণ হরনকারী। আমি আমীর সাহেবকে করজোর আবেদন করে বললাম, হুজুর! এ ঘাতক নরপিচাশকে আমার হাতে তুলে দিন, আমি আমার সাথীকে নিয়ে ওকে সাইজ করে অন্তরের জ্বালা মেটাব। আমীর সাহেব হেসে বললেন, "তা অবশ্যই! একে তোমাদের ভাগেই রাখব।"

আমীর সাহেব আমাকে ডেকে বললেন, "বাবা! আমরা আরো অনেক সময় এখানে অপেক্ষা করব। তুমি একটি ঘোড়া নিয়ে নৌকার খোঁজ নাও। ওকে বিজয়ের সংবাদ দাও। গুলীর শব্দে ছেলেটি ভয়ে পেতে পারে বা হতাহতের সংবাদের জন্য অপেক্ষায় থাকবে। কাজেই, তুমি ঘোড়া ছুটিয়ে তোমার বন্ধুটিকে সান্ত্বনার বাণী শোনাও।" আমীর সাহেবের কথায় বুঝতে পারলাম, ছায়েমাকে এখনো তারা চিনতে পারেননি সে ছেলে না মেয়ে।

সকলের নিকট থেকে বিদায় নিয়ে আমি ছায়েমার সন্ধানে বের হলাম। বাহন হিসেবে বেছে নিলাম সেই ঘোড়াটিকে, আলমাআতার চাচা যেটি দিয়েছেন। আরোহন করার সাথে সাথেই ঘোড়া আমাকে নিয়ে ছুটে চলল। ভেবেছিলাম, দিক-নির্দেশনা করতে হবে। কিন্তু কি আশ্চর্য! সে চেনা পথেই আমাকে অল্পসময়ে নদীর কূলে নিয়ে আসল। কল কল রবে নদী বইছে। স্রোতের তোড়ে ভেসে যাবে ঐরাবত। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছি আর মনে মনে দোয়া করছি। অশ্বটি মনে হয় প্রভূর অভিব্যক্তি সহজেই বুঝতে পেরেছে। তাই আমাকে পিঠে করে সাঁতার কেটে ওপারে চলে গেল। সোজা যাওয়ার প্রাণপণ চেষ্টা করেছে বটে, কিন্তু স্রোতের তোড়ে অনেকটা ভাটির দিকে নিয়ে গেছে। তারপর নদীর কূল ঘেঁষে খালের মোহনায় এসে পৌঁছে। আমি ছায়েমার সন্ধানে খালের কূলে কূলে চলছি। আহ! দু'ধারে কি ঘন জঙ্গল। বাঘ-ভালুকের আস্তানা! ছায়েমা কিভাবে একা একা সময় কাটাচ্ছে তা ভাবছি আর পথ চলছি। বেশ রাস্তা অতিক্রম করেছি। তবু নৌকার কোন সন্ধান মেলেনি। ভয় ও ছায়েমার চিন্তায় অশ্রু গড়িয়ে বুক ভিজে যেতে লাগল। চলার পথে হঠাৎ ঘোটক থেমে গেল। আমার শরীর শিউরে উঠল। কেন

তার গতি থেমে গেল, তা ঠাহর করতে পারিনি। আমি এদিকে-ওদিক তাকাতে লাগলাম। সামনে একটু দূরে চোখ যাওয়ার সাথে সাথে এক ভয়ংকর দৃশ্য নজরে পড়ল। এক পাল বাঘ খাল থেকে পানি পান করে হয়ত শিকারের নেশায় এদিক-ওদিক যাচ্ছে। দেখে আমার জ্ঞান হারানোর উপক্রম। আমি আল্লাহ আল্লাহ জপছি। একটু পরে অশ্বটি খুব ধীরগতিতে সামনে এগিয়ে চলল। এখন বুঝতে পারলাম, হায়েনারা হয়ত রাস্তা ছেড়ে অনেক দূরে চলে গেছে, তাই অশ্বটি এগুচ্ছে।

আনুমানিক আর দু'কিলোমিটার রাস্তা অতিক্রম করার পর নৌকার মাস্তুল নজরে পড়ল। সাথে সাথে এক বিস্ময়কর ঘটনা আমার আঁখি দর্পনে ভেসে উঠল। হায়! দু'টি ইয়া বড় বাঘ নৌকার অগ্রভাগে ওঁৎ পেতে বসা, যেন শিকার ধরবে। আর ছায়েমা মালাকানী ছৈয়ের অভ্যন্তরে নামাযে মশগুল! বাঘের টকটকে জিহ্বা দিয়ে লালা ঝরছে। ছায়েমা দীর্ঘ ক্বেরাতে নামায পড়ছে। কে জানে, কোন্ মুহূর্তে মেয়েটাকে খপ করে ধরে নিয়ে যায়। এ দৃশ্য দেখে আমি ঠিক থাকতে পারলাম না। আমি ক্লাশিনকভ বুকে ঠেকিয়ে আস্তে আস্তে অগ্রসর হচ্ছি। একটু সামনে গিয়ে ব্রাশফায়ারে বাঘ দু'টিকে উড়িয়ে দেব, চিরতরে মানুষ খাওয়ার সাধ মিটিয়ে দেব।

ছায়েমা সালাম ফিরিয়ে আমার দিকে তাকাল। আমি ফায়ার করার অভিলাষে ট্রিগারে আঙ্গুল রাখলাম। এমন সময় ছায়েমা চিৎকার দিয়ে বলল, "খোবায়েব ভাইয়া! তুমি একি করছ! সাবধান সাবধান ট্রিগার টেনো না।" এই বলে সে ছৈয়ের ভেতর থেকে বাঘের সামনে এসে দাঁড়াল। বাঘ দু'টি বিড়ালের মত লেজ নেড়ে নেড়ে ছায়েমার চারপাশে ঘুরতে লাগল। ছায়েমা ডাকল, "ভাইজান! নৌকায় এসো, আমি তোমার অপেক্ষায় প্রহর গুণছি। ভয় পেয়ো না, জলদি এসো, ওখানকার সংবাদ শোনাও।"

আমি ছায়েমার কথামত ভয়ে ভয়ে নৌকায় চলে আসলাম। ছায়েমা তাড়াহুড়ো করে রুটি ও সালুন এনে আমাকে খেতে দিল। বেশ কয়েকটা রুটি বাঘের সম্মুখে নিক্ষেপ করল। বাঘও মনের আনন্দে রুটি খেতে লাগল। ছায়েমা বাঘ দু'টোর মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করল।

বাঘ রুটিগুলো খেয়ে সোজা বনের ভেতর চলে গেল। চলার পথে

বারবার ঘাড় ফিরিয়ে ছায়েমাকে দেখছে। আমি এসব দৃশ্য দেখে মনে মনে ভাবছি, এটা কি স্বপ্ন, না বাস্তব? না কি চোখের ধাঁধাঁ। ছায়েমা বলল, "ভাইজান! এ যে আল্লাহর এক নুছরত! নৌকা এখানে নোঙর ফেলার পরই বাঘ দু'টি অরণ্যের ভেতর থেকে বেরিয়ে এখানে চলে আসে। আমি ভয়ে কাঁপছি, আর বুঝি রক্ষা নেই। বাঘের উদরেই মনে হয় চলে যেতে হবে। আমি সবকিছুই ভুলে গিয়েছিলাম। শুধু বারবার জবানে কালেমা উচ্চারণ করছি। এভাবে কিছু সময় পার হওয়ার পরও যখন দেখলাম, বাঘ আমাকে আক্রমণ করছে না, তখন বুঝতে পারলাম, এটা মহান রব্বুল আলামীনের নুছরত।" আমি বললাম, দেখার সাথে সাথে গুলী ছোঁড়নি কেন? সে বলল, "দেখার সাথে সাথে গুলী করার কথা ভুলে গিয়েছিলাম। হয়ত আল্লাহ নিজেই ভুলিয়ে দিয়েছেন।"

আমি ছায়েমাকে সব ঘটনা শোনালাম। ছায়েমা আল্লাহর শোকর আদায় করল। আমরা ঘোড়া ও নৌকা নিয়ে আগের স্থানে রওনা হলাম।

[দশ]

বেলা দু'টো বেজে ত্রিশ মিনিট। নৌকা ঘাটে ভিড়ল। আমীর সাহেব ও জাফর ভাই বন্দীকে নিয়ে বসা। আমরা উভয়ে নৌকা থেকে নেমে তাদের সাথে মিলিত হলাম। সালাম-মুসাফাহা ও কুশলাদি বিনিময় করে বন্দীকে গাছের সাথে বেঁধে নামায আদায় করলাম। তারপর আহারাদী সেরে পরামর্শে বসলাম। প্রথমে বন্দীর ব্যাপারে পরামর্শ হল, তাকে কি করা যায়? ছায়েমা বলল, "জানতে পারলাম, এ পাষণ্ড আমার পিতা-মাতার ঘাতক। তাই এ পাপিষ্ঠকে সাইজ করার দায়িত্ব অনুগ্রহ করে আমার হাতে ছেড়ে দেয়া হোক।"

আমীর সাহেব প্রশ্ন করলেন, "তুমি অল্পবয়সী হয়ে শক্তিশালী এই বিশালদেহী কমান্ডো প্রধানকে কিভাবে সাইজ করবে?" ছায়েমা উত্তরে বলল, "হুজুর! আল্লাহ পবিত্র কুরআনে হুকুম দিয়েছেন, যখন তোমাদের পরওয়ারদেগার ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দান করেন যে, আমি তোমাদের সাথে রয়েছি, সুতরাং তোমরা মুসলমানদের চিত্তসমূহকে স্থির করে রাখ, আমি কাফেরদের মনে ভীতির সঞ্চার করে দেব। কাজেই, তোমরা কাফেরদের গর্দানের উপর আঘাত হান এবং তাদেরকে জোড়ায় জোড়ায় কাট।" (সূরা তওবা ঃ আয়াত ১২)

ছায়েমার কথা শুনে আমীর সাহেব ফয়সালা দিলেন, "এই বন্দীকে তোমাদের দু'জনকে দেয়া হল। তোমরা তোমাদের ইচ্ছেমত ব্যবস্থা নাও।" ছায়েমা বলে উঠল, "হুজুর! এ বন্দীর মাধ্যমে আরো কিছু কাজ নেয়া যায়। ইনি হলেন কমান্ডো গ্রুপের প্রধান। তার নির্দেশনায় তথ্য সংগ্রহের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এখন তার দ্বারা একটি পত্র লিখিয়ে যদি আরো সৈন্য তলব করা হয়, তাহলে প্রধান সেনাপতি অবশ্যই আরো সৈন্য পাঠাবেন। তারপর আমরা ওদেরকেও খতম করতে পারব।"

ছায়েমার বুদ্ধিদীপ্ত পরামর্শ শুনে সবাই অবাক। আমীর সাহেব বললেন, "আচ্ছা বাবা, তাই হবে। তুমি চিঠির খসড়া তৈরি কর। তারপর তা বন্দীর দ্বারা লিখিয়ে দস্তখত করিয়ে নেব।" ছায়েমা কাগজ-কলম বের করে পত্র লিখছে—

মাননীয় প্রধান সেনাপতি,

আমরা আপনার নির্দেশে জনহীন গভীর অরণ্যে তিন সদস্যবিশিষ্ট কমান্ডো গ্রুপ নিয়ে জরিপ কাজ চালিয়ে যাচ্ছি। অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটির সন্ধান পেয়েছি। অনেক গোপন তথ্য সংগ্রহ করেছি। অনেক অরণ্য পথ আবিষ্কার করেছি। আপনার নির্ধারিত সময়ে জরিপ করা তিনজনের পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়। কারণ, এখনো অনেক কাজ বাকি রয়েছে। কাজেই আমার সাহায্যার্থে নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গকে পাঠাতে পারলে খুব উপকার হত।

(আমির সাহেব থেকে জেনারেলদের নাম জেনে ছায়েমা তালিকা তৈরি করছে)

॥ জেনালে রুস্তম ডার ॥ জেনারেল কাফায়েভ ॥ লভস্কী

॥ কাজ্জাবী ॥ দুর্দাভী ॥ অলস্কাইড ॥ খলিল জাভী

॥ কার্দাভী ॥ আইজেক ॥ কিংডর্গ

॥ এলকে ব্রেক ॥ ইউসিয়ার

উক্ত ব্যক্তিবর্গকে পাঠিয়ে আমার হাতকে মজবুত করতে যেন মহামান্যের মর্জি হয়।

ইতি

আপনার অধীন

এম, কিউ, ব্রাড।

(বিঃ দ্রঃ পত্রবাহক আমাদের একজন হিতাকাঙ্খী কমরেড খোবায়েব)।

আমীর সাহেবের নিকট পত্রের খসড়াটি পেশ করলে তিনি উচ্চস্বরে পাঠ করলেন। এক বাক্যে সবাই ছায়েমার প্রশংসা করতে লাগলেন। অতপর পত্রে দস্তখত নিয়ে আমার হাতে দিয়ে বললেন, "বাবা! সকলের চেয়ে রাস্তাঘাট তুমিই বেশী চেন, তাই তোমাকেই যেতে হবে। যাওয়ার আগে বন্দীকে যা করার করে যাও।" আমি আর বিলম্ব না করে বন্দীকে একটু দূরে নিয়ে হাত-পায় বেঁধে মনের আনন্দে খঞ্জরের আঘাতে আঘাতে জাহান্নামে প্রেরণ করলাম।

আমি সওয়ারীর জন্য কমান্ডো প্রধান এমকিউ ব্রাডের অশ্বটি নিয়ে ছুটলাম। ছায়েমা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার দিকে চেয়ে অশ্রু ফেলছে। ছায়েমা আমার গায়ে কমিউনিস্ট মার্কা পোশাক, বুকে কাস্তে হাতুড়ি মার্কা স্টিকার, মাথায় কমিউনিস্ট ক্যাপ পেরিয়ে দেয়। আমি দ্রুত ঘোড়া হাঁকিয়ে রওনা হলাম।

আমি বিকেল পাঁচটায় আলমাআতা জামেউল উলুম মাদ্রাসার প্রধান ফটকে এসে পৌঁছলাম। ঘোড়া থেকে নেমে ভেতরে প্রবেশ করতে চাইলে দ্বাররক্ষী আমাকে বাধা দেয়। আমি বললাম, অরণ্যের তথ্য সংগ্রহের প্রধান কমান্ডার জেনারেল এমকিউ ব্রাডের পক্ষ থেকে সেনাপতি জেনারেল মার্শাল বোদায়েভের নিকট বার্তা নিয়ে এসেছি।

আমার কথা শুনে আরপি স্বসম্মানে আমাকে বোদায়েভের নিকট নিয়ে গেলেন। আমি কুর্নিশ করে অফিস কক্ষে প্রবেশ করলাম। তিনি একটি চেয়ারের দিকে ইশারা করে আমাকে বসতে বললেন। আমি চেয়ারে বসে পত্রটি বের করে দিলাম। সেনাপতি পত্রটি পড়তে পড়তে এক সিপাইকে নাস্তার ব্যবস্থা করার হুকুম দিলেন। সাথে সাথে নিয়ে এল ফল ও চা-বিস্কুট। আমি আমার রুচিমত খেয়ে নিলাম।

সেনাপতি আমাকে অনেক প্রশ্ন করলেন। আমি গা বাঁচিয়ে সবগুলোর উত্তর দিলাম। সাথে সাথে এও বললাম, স্যার, আমি কলেজ পড়ুয়া ছাত্র। লেনিনের আদর্শে বিশ্বাসী। অনেক আগ থেকে কমিউনিস্ট বিপ্লব করি। আমাদের এলাকায় লাল ফৌজ আসলে তাদেরকে পথঘাট দেখিয়ে দেই। সবাই আমাকে আদর করেন।

সেনাপতি আমার কথা শুনে প্রশ্ন করলেন, "বাবা! চলাফেরায় অসুবিধা হচ্ছে না তো?" আমি বললাম, স্যার! শত্রু-মিত্র তো চেনা

মুশকিল। রুহানীরা আমাদের শত্রু। অনেক সময় পার্টির লোকেরাও না চেনার কারণে অসুবিধা করে। সেনাপতি আমার কথা শুনে তার অফিসিয়াল প্যাডে আমার জন্য একটি সত্যায়নপত্র লিখে দস্তখত করে সীলমোহর দিয়ে বললেন, "কোন পুলিশ বা সেনাবাহিনীর যুবকরা ধরলে এটি দেখাবে।"

এদিকে আমি উপস্থিত থাকতে থাকতেই বেশ ক'জন জেনারেলকে ডেকে পত্রের সারমর্ম সম্পর্কে অবগত করলেন। তারপর সিদ্ধান্ত নিলেন আগামীকাল এগারটা থেকে দুপুর বারটার মধ্যে বারজন জেনারেল অরণ্যে পাঠাবেন। অতপর ছোট্ট একটি পত্র লিখে আমার হাতে দিয়ে বললেন, "এ পত্রটি এমকিউ ব্রাডের হাতে দিও।" আর দু'শ' ডলার বকশিশ দিয়ে খরচ করতে বললেন। আমি গুড আফটারনুন বলে বিদায় নিলাম।

আমি মহান রাব্বুল আলামীনের শোকর আদায় করতে করতে বিজয়ী বেশে অরণ্যাভিমুখে যাত্রা করলাম। কয়েক ঘন্টার মধ্যে আমি আস্তানায় এসে হাজির হলাম। অশ্বের পদধ্বনি শুনে ছায়েমা কিছু পথ এগিয়ে এল। আমি অশ্ব থেকে অবতরণ করে সালাম দিয়ে নৌকায় উঠলাম। জাফর ভাই এগিয়ে এসে হাত ধরে আমাকে নৌকার ভেতর নিয়ে গেলেন। ছায়েমা চোখের পলকে খানা নিয়ে হাজির। আমি সকলকে সাথে নিয়ে খানা খেলাম। তারপর সফরের কারগুজারী এক এক করে খুলে বলতেই সকলের কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে এল আলহামদুলিল্লাহ! আলহামদুলিল্লাহ!

রাত ন'টা। ঘুটঘুটে অন্ধকার। মাঝে-মধ্যে জোনাকিরা ছুটোছুটি করছে। আমরা জামাতে নামায আদায় করলাম। আমীর সাহেব পাহারাদারীর দায়িত্ব বন্টন করলেন। দশটা থেকে রাত একটা পর্যন্ত দায়িত্ব আমার আর ছায়েমার। একটা থেকে ভোর পাঁচটা পর্যন্ত আমীর সাহেব ও জাফর ভাইয়ের।

আমরা অস্ত্রগুলো সুন্দর করে মুছে গানঅয়েল মেখে নিলাম। ছায়েমা তার নরম হাতে বারটি ম্যাগজিনে গুলী ভর্তি করে নিয়েছে। আমি আর্মি সেট পরিধান করে বুট পায়ে দিলাম। ছায়েমা সবসময় আর্মির পোশাক পরে থাকে। কোন সময় পাল্টাতে দেখি না। সে

কখন কোথায় গোসল করে, তাও কেউ দেখি না। যার কারণে সে নারী না পুরুষ এখনো অন্যেরা ধরতে পারেনি। সবাই ছোট ভাই বলে সম্বোধন করে।

দু'জনকে নৌকায় রেখে আমরা বেরিয়ে এসে চার-পাঁচশ' হাত দূরে দাঁড়িয়ে আছি। নিঝুম রাত। কালো আঁধারে ছেয়ে আছে দশদিক। গাছের ফাঁক দিয়ে দূর আকাশে দু'একটি নক্ষত্র মিটমিট করে জ্বলছে দেখা যায়। তাছাড়া আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না। এখন হয়ত বন্য হায়েনারা রিজিকের সন্ধানের বেরিয়ে আসবে শিকার ধরতে। বাঘ, সিংহ ছাড়াও কত নাম না-জানা হিংস্র প্রাণীর আবাস এই অরণ্যে। কখন জানি তাদের আক্রমণের শিকার হতে হয় কে জানে! উঁচু বৃক্ষ শাখের শুকনো পাতাগুলো যখন জমিনে ঝরে পড়ে, তখন গা শিউরে উঠে। শুকনো ডালপালাগুলো যখন ভেঙ্গে জমিনে পতিত হয়, তখন আরো বেশী ভয় লাগে। মনে হয় দুশমন আমাদের ধরে ফেলেছে। ছায়েমা ভীত হয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরে। এভাবে পাহারা দিচ্ছি। ঘুমের আক্রমণে বারবার চোখ বন্ধ হয়ে আসছে।

ছায়েমা বলল, "খোবায়েব ভাইয়া! মহানবী (সাঃ) বলেছেন, জাহান্নামের আগুন দু'টি চোখকে স্পর্শ করবে না, একটি হল যে চোখ আল্লাহ জন্য কাঁদে, অপরটি যে চোখ আল্লাহর রাস্তায় রাত জেগে পাহারা দেয়। (তিরমিযী)

ছায়েমার জবান থেকে মহানবী (সাঃ) হাদীসটি শুনে আমি ভয়-ভীতি, ক্লান্তি ও ঘুমের আক্রমণ থেকে অনেক সতর্ক হয়ে গেলাম। এমনকি আমার মনে সারারাত জেগে পাহারাদারীর করার প্রবল আগ্রহ জন্মে যায়।

ছায়েমা আরো একটি হাদীস শোনাল-

হযরত ফুযালা বিন উবাইদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, মহানবী (সাঃ) এরশাদ করেছেন, প্রত্যেক ব্যক্তির আমল তার মৃত্যুর সাথে সাথে শেষ হয়ে যায়। কিন্তু আল্লাহর রাস্তায় সীমান্ত প্রহরীর আমল তার মৃত্যুর পরেও জারী থাকে। তার আমল কিয়ামত পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং কবরের আযাব থেকে সে মুক্তি পেয়ে যায়। সুবহানাল্লাহ! পাহারাদারীর এত সওয়াব, এত ফজিলত!

রাত আনুমানিক বারটা। গভীর নিদ্রায় তলিয়ে আছে প্রকৃতি। জেগে আছি আমরা দু'জন। রাতের পাহারা দিতে হয় কান দিয়ে। কারণ, চোখ তো সামনে দেখছে না কিছুই। তাই রাতের পাহারায় কানই প্রধান সাথী। হঠাৎ অনুভব করলাম, পেছন দিক থেকে কি একটা যেন হুমড়ি খেয়ে পালাচ্ছে। বিকট শব্দ কানে আসল। ভয়ে শরীর শিউরে উঠল। ছায়েমা ভয়ে মূর্তির মত নিশ্চল নির্বাক দাঁড়িয়ে আছে। আমি বুঝতে পারলাম, হয়ত ক্ষুধার্ত বাঘ দুর্বল কোন জানোয়ারকে ধাওয়া করছে জঠর জ্বালা নিবারণের জন্য।

আমাদের পাহারার নির্ধারিত সময় শেষ হয়ে এল। ছায়েমা চুপিসারে বিড়ালের মত আমীর সাহেবকে জাগানোর জন্য নৌকায় চলে গেল। একটু পরই আমীর সাহেব ও জাফর ভাই অস্ত্র হাতে চলে আসলেন। আমীর সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, "খোবায়েব! কোন অসুবিধা হয়নি তো?" আমি বললাম, জ্বী না হুজুর, কোন অসুবিধা হয়নি। তারপর আমি ও ছায়েমা নৌকায় ঘুমিয়ে পড়ি।

বন্য মোরগের কুক্কুর-কুক্ ডাকে ঘুমন্ত প্রকৃতি আঁখি মেলছে। পূর্ব আকাশ ক্রমশই রাঙ্গা হয়ে উঠছে। ভোরের পাখিরা মনের আনন্দে গান গাইছে। নানা ধরনের কলকাকলীতে আনন্দের দোলা লাগছে। আর একটু পরেই ঈষৎ কম্পনে পূর্ব আকাশে রাঙ্গা রবির আগমন ঘটবে। ঠিক এই মুহূর্তে ছায়েমা ঘুম থেকে উঠে আমাকে জাগিয়ে দিল। আমি তাড়াতাড়ি অযু করে নামায পড়ে নিলাম। তারপর দু'জনে তিলাওয়াত করতে বসলাম। ছায়েমা তার চিরাচরিত অভ্যাস অনুযায়ী আমার সাথে তিলাওয়াত যুদ্ধে অবতীর্ণ হল। দু'পারায় আমার তিনটা, ছায়েমার একটা লোকমা পড়েছে।

ইতিমধ্যে আমীর সাহেব নৌকায় এসে উপস্থিত হয়ে সবাইকে বললেন, "আমার জানবাজ মুজাহিদ সাথীরা! আজকের আক্রমণ জান নেয়া-দেয়ার আক্রমণ। আজকের আক্রমণ এক ভয়ংকর আক্রমণ, অস্তিত্ব রক্ষার আক্রমণ। এখন থেকে হামলার প্রস্তুতি নিতে হবে।" আক্রমণের প্রকৃতি কি হবে, তা তিনি এক এক করে বুঝিয়ে বললেন। আমরা কান পেতে শুনলাম।

আমীর সাহেব ছায়েমাকে বললেন, "ছোট ভাই! তুমি অল্প

সময়ে সুস্বাদু খানা পাকাতে পার, তাই তোমাকেই খানা পাকানোর দায়িত্ব দেয়া হল।"

ছায়েমা খানা তৈরির কাজে চলে গেল। আমরা বেশক'টি মাইন নিয়ে আমীর সাহেবের পিছু পিছু অগ্রসর হলাম। বনের ওপারে চলার পথে আমীর সাহেব কয়েকটি মাইন মাটির নীচে পুঁতলেন। এর আগে কিভাবে মাইন পুঁততে হয়, কিভাবে তার সংযোগ দিতে হয়, সুইচ অন করতে হয় দেখিনি। তাই আমীর সাহেবের নিকট দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখলাম। আরো ক'টি মাইন বনের ভেতর এলোপাতাড়িভাবে পোতা হল। তারপর নৌকায় ফিরে এলাম। আমীর সাহেব অস্ত্রগুলো মোছার নির্দেশ দিলেন। জাফর ভাইকে নিয়ে সব অস্ত্র মুছে, গানঅয়েল মেখে, ম্যাগজিন ভর্তি করে সারিবদ্ধভাবে সাজিয়ে রাখলাম। আমীর সাহেব সব ছামানাপত্র একত্রিত করে নৌকায় রাখলেন।

ছায়েমা খানা তৈরি করে সবাইকে খেতে অনুরোধ জানাল। আমরা তৃপ্তি সহকারে খানা খেলাম। আমীর সাহেব সবাইকে ডেকে পরামর্শ করে কাজ বন্টন করলেন। তিনি বললেন, "ক্যামোফ্ল্যাক্সের মাধ্যমে এ্যাম্বুশ লাগাতে হবে।" আমি বললাম, এ আবার কি জিনিস? আমির সাহেব বুঝিয়ে বললেন, "ক্যামোফ্ল্যাক্স অর্থ নিজেকে পরিবর্তন করা বা চেহারা পাল্টানো। অর্থাৎ লতা-পাতা দিয়ে নিজেকে এমনভাবে সাজাবে, নিকটে কোন প্রাণী আসলেও যেন টের না পায় যে, এখানে মানুষ আছে। আর এ্যাম্বুশ হল, দুশমনের রাস্তায় ওঁৎ পেতে বসে থাকা এবং দুশমন নিকটে আসার সাথে সাথে আক্রমণ করে বসা। এ্যাম্বুশ খুবই ভয়ানক। মুজাহিদ এ্যাম্বুশ লাগালে দুশমন রক্ষা পায় না আর দুশমন এ্যাম্বুশ লাগালে মুজাহিদ রক্ষা পায় না।"

আমরা একে অপরকে লতা-গুল্ম ও পত্রপল্লবে আবৃত করে দিলাম। রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকলে চেনার সাধ্য কারো নেই যদি নড়াচড়া না করে। এভাবে মাইন পোঁতার কিছু দূরে ঘন ঝোঁপ-ঝাড়ের ভেতর লুকিয়ে রইলাম।

সকাল ন'টা বাজে। দুশমন এখনো আসেনি। একটানা এত সময় দাঁড়িয়ে থাকা খুবই কষ্টকর। আল্লাহ আল্লাহ জপ করছি। একটু পরেই চেয়ে দেখি, ন'জন অশ্বারোহী খুব সন্তর্পনে এদিকে অগ্রসর হচ্ছে। এবার

আনন্দের আর সীমা রইল না। বারজন ফৌজের মধ্যে মাত্র ন'জনকে দেখা যাচ্ছে। বাকি তিনজন কি পেছনে রয়েছে? না ওখান থেকে পাঠায়-ইনি? এ নিয়ে খুব চিন্তায় পড়ে গেলাম। চেয়ে দেখি, প্রথম মাইনটি পেরিয়ে তিন-চারজন সৈন্য সামনে চলে গিয়েছে। মাইনে ঘোড়ার পা পড়েনি। কিন্তু পরক্ষণেই হঠাৎ বিকট আওয়াজে তিন-চারটি মাইন বিস্ফোরিত হল। সাথে সাথে অশ্বারোহী ন'জন কমান্ডো ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে এদিক-ওদিক ছিটকে পড়ল। এখানে ঘোড়াসহ নয়জনের জাহান্নাম নছিব হয়। এরা নিহত হওয়ার সাথে সাথে পেছনের দিক থেকে বৃষ্টির মত গুলী আসতে শুরু করে। অতর্কিত আক্রমণে টিকতে না পেরে আমরা জমিনে শুয়ে পড়লাম। তিনজন সৈন্য ব্রাশফায়ার করতে করতে সামনে চলছে। আমীর সাহেব এখনো গুলীর হুকুম দিচ্ছেন না। একতরফা ওরাই গুলী করছে। গুলীর হুকুম না দেয়ায় রাগ সামলান খুব কষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু আমীরের হুকুম মানা যে ফরয। তাই খুব কষ্টে রাগ দমন করতে হল। আমাদের পক্ষ থেকে গুলী না করায় দুমশন মনে করছে যে, মুজাহিদরা এ এলাকায় নেই, মাইন পুঁতে রেখে অন্যত্র চলে গেছে। এই ভেবে ওরা ফায়ার বন্ধ করল।

ওরা যখন আমাদেরকে পেছনে ফেলে সামনে চলে গেল, তখন আমীর সাহেব উচ্চস্বরে বলে উঠলেন, দাঁড়াও! ওরা সবাই দাঁড়িয়ে গেল। এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে, কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। আমীর সাহেব আবার হুকুম করলেন, আত্মসমর্পণ কর। সবাই অস্ত্র মাটিতে ফেলে দিয়ে হাত উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। আমরা অস্ত্র তাক করে ওদের সামনে এগিয়ে গেলাম। আমীর সাহেব অস্ত্রগুলো কব্জা করে নিলেন। আমরা তিনজনকে জুতোর ফিতা দিয়ে হাতগুলো পেছনে নিয়ে বেঁধে ফেললাম। তারপর গনীমতসহ আস্তানায় ফিরে এলাম।

[এগার]

দুপুর বারটা: আমরা সকলেই ক্লান্ত। গোসল, খানাপিনা ও বিশ্রামের প্রয়োজন। আমীর সাহেব সবাইকে গোসলের নির্দেশ দিলেন। আমরা সবাই মনের আনন্দে গোসল করে নিলাম। ছায়েমা আনমনে হেঁটে চলে গেল খালের বাঁকে। একমাত্র আমিই বুঝতে পারলাম, সে গোসল করতে যাচ্ছে। আমরা গোসল সেরে নৌকায় ফিরে এলাম।

তারপর আমীর সাহেব গোসল করলেন। ছায়েমা ফিরে এসে পূর্বের পাকানো খানা দস্তরখানে হাজির করল। খানা পর্যাপ্ত। পাঁচ-সাতজনে খেয়েও শেষ করা যাবে না।

আমীর সাহেব গোসল সেরে আসলে সবাই বন্দীদেরকে নিয়ে একসাথে আহার করলাম। ছায়েমা নিজে খাবার পরিবেশন করল। আমরা খানা খেয়ে বিশ্রাম নিচ্ছি। আমীর সাহেব বললেন, তোমরা দু'এক ঘন্টা ঘুমিয়ে নাও, আমি পাহারা দিচ্ছি। ছায়েমাও খানা খেয়ে শুয়ে পড়ল। বিকেল তিনটার সময় আমীর সাহেব সবাইকে জাগিয়ে দিলেন। আমরা অযু করে নামায আদায় করলাম।

আমীর সাহেব বন্দীদেরকে ভালভাবেই চেনেন। এক সাথেই সেনাবাহিনীতে চাকুরী করেছেন। এরা একসময় মুসলমান ছিল। কমিউনিস্ট বিপ্লবের স্রোতে ভেসে গেল তাদের অমূল্য সম্পদ ঈমান। এরাই ছিল লেনিনের স্পেশাল ফোর্স। লেনিন এদের দ্বারা মুসলমানদের প্রচুর ক্ষতিসাধন করিয়েছে। গণধর্ষণ এরাই বেশী করেছে। এরা মুরতাদ, এরা জিন্দিক। এদের কতল করতে ইসলামী শরীয়ত নির্দেশ দিয়েছে।

আমীর সাহেব এদের কাছ থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উদ্ধার করলেন, যা পরবর্তী সময়ে আমাদের জন্য মাইলফলক হিসেবে কাজে আসবে। এসব তথ্য সংগ্রহ করার পর আমীর সাহেব তাদেরকে জবাই করার নির্দেশ দিলেন। ছায়েমা মুচকি হেসে বড় পালোয়ানকে ইশারা করে বলল, "খোবায়েব ভাইয়া! এ যেন আমার ভাগে থাকে।" আমরা ছায়েমার আবদার রক্ষা করলাম। তারপর নদীর কূলে শুইয়ে তিনজন তিনজনকে জবাই করে মনের জ্বালা মিটালাম। জবাই কাজ শেষ করে ছায়েমা রক্তে ভেজা খঞ্জর হাতে চলে গেল নৌকায়। কেন গেল, তা বুঝতে পারিনি। আমি সবগুলো লাশ থেকে পোশাক খুলে নিলাম। তারপর জোড়া থেকে প্রত্যেকটা অঙ্গ আলাদা করতে লাগলাম।

ছায়েমা দূর থেকে ডেকে বলল, "ভাইয়া! রাখ, রাখ, আমি আসছি একটু সবুর কর।" এর মধ্যে দু'জনের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে স্তূপ করে রাখলাম। এখনো একজন অক্ষত, হাত-পা আলাদা করা হয়নি। ছায়েমা এসে মেয়েলি ভঙ্গীতে মুখ বাঁকা করে চোখ দু'টো কপালে তুলে

অভিমানের সুরে বলল, "কেন খোবায়েব ভাই! তুমি কি তোমার বোনটিকে ভুলে গেলে? আমি কি তোমার সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না ও আপদ-বিপদের সাথী নই? এ মুবারক কাজে আমাকে শরীক করলে না যে।" আমি ক্ষমা চেয়ে বললাম, তোমার ভাগে তো একজন রেখে দিলাম। এতে কি তোমার মন ভরবে না? এতে কি তোমার আশা পূরণ হবে না? ছায়েমা ওষ্ঠযুগলে হাসির রেখা টেনে বলল, "ডাক না দিলে তো এও পেতাম না।" এই বলে ইচ্ছামত প্রতিটি জোড়া থেকে অঙ্গগুলো আলাদা করল। তারপর দু'জনে মিলে পোশাকগুলো নদীতে নিয়ে ভালভাবে ধুয়ে রোদে শুকাতে দিলাম।

আমীর সাহেব সবাইকে ডেকে জরুরী পরামর্শে বসলেন। এ মুহূর্তে আমাদের করণীয় কি হবে, তা তিনি জানতে চাইলেন। ছায়েমা বলল, "পরপর কয়েকটি অভিযানে আল্লাহ আমাদেরকে বিজয়দান করেছেন। শত্রুপক্ষের বেশক'জন শক্তিশালী সৈন্য ও রসদপত্র খোয়া গেছে। এ খবর ছড়িয়ে যাবে সারাদেশে। এর প্রতিশোধ নেয়ার জন্য জেনারেল মার্শাল বোদায়েভ একপায়ে খাড়া। সে যেকোন মুহূর্তে অরণ্য ভূমিতে সাড়াশি আক্রমণ বা ক্র্যাকডাউন লাগতে পারে। কাজেই আমাদের এ এলাকা পরবির্তন করা একান্ত দরকার বলে আমি মনে করি। বাকী আমীরে মোহতারামের ফয়সালা।"

ছায়েমার কথা শুনে সকলেই এক বাক্যে হাঁ হাঁ বলে একাত্মতা প্রকাশ করলেন। জাফর ভাই বললেন, "মনে হয় ওরা এবার তথ্য ছাড়াই আক্রমণ করে বসবে। ক্র্যাকডাউন লাগিয়ে চিরুনী অভিযান চালাবে।"

আমীর সাহেব বললেন, "তোমাদের ধারণাই ঠিক। আমাদের খুব সতর্কতার সাথে সরে যেতে হবে।"

ছায়েমা পরামর্শ দিল, "আমরা যদি সমস্ত মালামাল নৌকায় তুলে অনেক দূরে চলে যাই, তাহলে নিরাপদে থাকা যাবে। আর ঘোড়াগুলো যদিও যুদ্ধের জন্য খুবই উপকারী, কিন্তু পোযা খুবই কষ্টকর। তাছাড়া সেনাবাহিনীর ঘোড়া অনেকে দেখলেই চিনবে। তাই ঘোড়া ব্যবহার করা ঠিক হবে না। বন্ধনমুক্ত করে দিলে ঘোড়াগুলো যেথায় ইচ্ছে চলে যেতে পারবে। বাজারে বিক্রয় করলে বেশ টাকা মিলবে বটে, কিন্তু গুপ্তচর

চারদিক ছড়িয়ে রয়েছে। তাদের মনে সন্দেহ জাগবে, এসব ঘোড়া কোথায় পেলাম। এতে অসুবিধা হতে পারে।"

আমি তার যুক্তিপূর্ণ পরামর্শ শুনে অলক্ষ্যে বলে উঠলাম, ছায়েমা! তুমি যেন একজন সুদক্ষ সৈনিক। তোমার বুদ্ধিমত্তায় বড় বড় জেনারেলও হার মানবে। সাথে সাথে আমীর সাহেব ও জাফর ভাই আমার দিকে বিস্ফারিত নয়নে তাকালেন। তারপর দু'জনের মধ্যে আরম্ভ হল মুখ চাওয়া-চাওয়ী। আমীর সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন, "ছায়েমা? তুমি ছায়েমা! এ যে মহিলার নাম!" ছায়েমা লজ্জায় মাথানত করে বসে রইল। আমার মুখের ভাষাও মুহূর্তের মধ্যে হারিয়ে গেল। তারপর আমি তার জীবন বৃত্তান্ত আমীর সাহেবকে শুনালাম। আমীর সাহেব ও জাফর ভাই এই মর্মান্তিক ও লোমহর্ষক ঘটনা শুনে কেঁদে ফেললেন।

আমীর সাহেব অশ্রুসিক্ত নয়নে ছায়েমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "তোমার আম্মু ও আব্বু শাহাদাতের অমৃত সুধা পান করে জান্নাতে চলে গেছেন। শাহাদাতের নেয়ামত ক'জনের ভাগ্যে জোটে? হুজুর (সাঃ) বলেছেন, শহীদের রক্ত মাটিতে পতিত হবার আগেই শহীদ জান্নাতে চলে যায়। আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, মহানবী (সাঃ) ইরশাদ করেন, আল্লাহর রাহে নিহত হওয়া ঋণ ব্যতীত সমস্ত গুনাহের কাফফারা। (বুখারী, মুসলিম)

উক্ত হাদীস শুনে ছায়েমাও শাহাদাতের দোআ করল। আমরা 'আমীন আমীন' বললাম।

বেশ সময় অতিবাহিত হয়ে গেল। আমীর সাহেব হুকুম দিলেন সমস্ত মালামাল নৌকায় উঠাতে। আমরা নৌকার নীচে তক্তা ও বাঁশের মাচায় চট-ছালা বিছিয়ে এর উপর অস্ত্র ও গোলা-বারূদ রেখে তার উপর মাছ ধরার জাল বিছিয়ে দিলাম। কেউ দেখলে সহজে বুঝবে না ভেতরে কিছু আছে।

আমরা আল্লাহর উপর ভরসা করে নৌকা ছাড়লাম। পাড়ি জমালাম দূরপানে। সকলের গায়ে সাধারণ পোশাক। দেখতে অনেকটা জেলেদের মত। দু'জনে দাড় টানছি। আমীর সাহেব হাল ধরলেন। ছায়েমা ছাপ্পরে বসে তিলাওয়াত করছে ও এদিক-ওদিক চোখ বুলিয়ে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করছে।

নদীর বাঁকে বাঁকে কাশবন ও ঝাউ গাছ। ঝাউ শাখে শালিক, মাছরাঙা ও বকেরা এসে বসে। গাংচিলগুলো ডানা মেলে শিকারের আশায় উড়ে বেড়াচ্ছে। পানকৌড়িরা মাছ ধরার জন্য ডুব দিয়ে হারিয়ে যাচ্ছে আবার অনেক দূর গিয়ে ভেসে উঠছে। আরো কত নাম না-জানা পাখীরা উড়ে বেড়াচ্ছে। এসব দৃশ্য নদীর পাড়ের মানুষ ছাড়া ক'জনের দেখার ভাগ্যে জোটে।

বিকাল তিনটার দিকে অরণ্যপথ পাড়ি দিয়ে আমরা লোকালয়ে এসে পৌঁছলাম। এখনো নামায পড়িনি। একটানা দাড় টানার কারণে সকলেই ক্ষুধায় অস্থির। আমীর সাহেব তটে নৌকা নোঙর ফেলার নির্দেশ দিলেন। আমরা নৌকা ভিড়িয়ে অজু করে নামায আদায় করলাম। তারপর সকলে মিলে গমের ছাতু খেয়ে ক্ষুধার জ্বালা নিবারণ করলাম। আরো একটু বিশ্রাম নিয়ে আবার পাড়ি ধরলাম।

আমরা আলমাআতার অদূরে ছোট একটি বাজারে এসে উপনীত হলাম। নৌকা ঘাটে বেঁধে নামায আদায় করলাম। আমীর সাহেব এখানেই রাত যাপনের সিদ্ধান্ত নিলেন। খানা তৈরি করতে হবে। ছায়েমা খানা পাকানোর কাজে লেগে গেল। জাফর ভাই ছায়েমার সাহায্যে এগিয়ে আসলেন। আমি আমীর সাহেবকে বললাম, হুজুর এ এলাকার হাল-হকিকত জানা দরকার। আমাকে গোয়েন্দা হিসাবে প্রেরণ করুন। আমি ঘুরে ঘুরে এলাকার খবরাখবর নিয়ে আসি। আমীর সাহেব আমাকে অনুমতি দিলেন। আমি আমার কমিউনিস্ট মার্কা পোশাক পরিধান করলাম। সঙ্গে জেনারেল বোদায়েভের পরিচয়পত্রটি নিতে ভুল করলাম না।

আমি আল্লাহর উপর ভরসা করে রওনা হলাম। ছায়েমা তার হাতের কাজ রেখে দিয়ে আমার কাছে ছুটে আসল। সামনে দাঁড়িয়ে অপলক নেত্রে ছলছল চোখে তাকিয়ে আছে। জিজ্ঞেস করলাম, কিছু বলতে চাও ছায়েমা? সে কাতর স্বরে বলল, "ভাইজান! এ এলাকা তো বিপদমুক্ত নয়। নিকটেই আলমাআতা শহর। সেনাবাহিনীরা ক্ষুধার্ত বাঘের ন্যায় ওঁৎ পেতে আছে। কখন কি ঘটে বলা যায় না। তুমি একা একা গোয়েন্দাগিরি করতে যাচ্ছ?"

আমি তাকে বুঝিয়ে ও অভয় দিয়ে রওনা দিলাম।

পথ চলতে চলতে পেছনে তাকিয়ে দেখি, ছায়েমা নির্জীব মূর্তির মত এখনও দাঁড়িয়ে আছে। আমি ঘাড় ফেরাবার সাথে সাথে প্রতিমারূপী ছায়েমা হাত নেড়ে বিদায় জানাল। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি তার দৃষ্টির বাইরে চলে গেলাম।

পথে সাদা দাড়িওয়ালা এক ব্যক্তি আমাকে আনমনে চলতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, “বাবা! তুমি কোত্থেকে এলে? এ রাতে যাবে কোথায়?” বললাম, আমি আলমাআতা যাব। আমার কথা শুনে বুড়ো স্বস্নেহে বললেন, “বাবা! আলমাআতার পরিস্থিতি খুবই খারাপ। সেনাবাহিনীর মধ্যে এত ভীতি ছড়িয়ে পড়েছে যে, অরণ্য জরিপে কয়েকটি শক্তিশালী টিম গিয়ে ফেরত আসেনি। ধারণা করা হচ্ছে, মুজাহিদরা ওদেরকে হত্যা অথবা বন্দী করেছে। তাই জেনারেল বোদায়েভ বিভিন্ন জেলা ও প্রদেশ থেকে কয়েক ডিভিশন সৈন্য তলব করেছে। লাল ফৌজের পদভারে আলমাআতার জনপদ ভারি হয়ে উঠেছে, শহর থেকে জনসাধারণকে সরে যেতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। শহরবাসীরা গ্রামগঞ্জে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যাচ্ছে। একটু পরপর বিপদ সাইরেন বাজান হচ্ছে। তাই আমি তোমাকে শহরে যেতে মানা করছি।”

যুদ্ধের কথা শুনে শহরে যাওয়ার আগ্রহ আমার অনেক বেড়ে গেল। আমি বৃদ্ধকে বললাম, বাবা! আমার খুবই প্রয়োজন, শহরে যেতেই হবে। দোয়া করুন, আল্লাহ যেন আমাকে হেফাজত করেন।

আমি আলমাআতার দিকে ছুটে চললাম। কিছুক্ষণ পর আমি শহরের দুলাইলী নামক মোড়ে আসলাম। বুড়োর কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হল। শহরজুড়ে সেনাবাহিনীর গাড়ীবহর টহল দিচ্ছে। মাঝে-মধ্যে দ্রুতগামী সৈন্যযান সাইরেন বাজিয়ে ছুটে চলছে। মনে হল, যেন ওরা কোন পরাশক্তির সাথে লড়াইয়ের আয়োজন করছে।

নামায পড়ার জন্য আমি দুলাইলী জামে মসজিদে প্রবেশ করলাম। মসজিদের করুণ অবস্থা দেখে চোখের পানি ধরে রাখতে পারলাম না। মসজিদের ভেতরে কিছু চানাচুর ও বিস্কুট ছড়িয়ে আছে। দু'একটি মদের বোতল বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়ে আছে। মনে হল মসজিদটি মুসল্লীর অভাবে দীর্ঘদিন বিলাপ করছে। এ অবস্থা দেখে মনে পড়ল আল্লাহর বাণী—

"আল্লাহ যদি মানবজাতির একদলকে অপর দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তাহলে খৃস্টানদের গির্জা-এবাদতখানা, ইহুদীদের উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহ বিধ্বস্ত হয়ে যেত, যেগুলোতে আল্লাহর নাম অধিক স্বরণ করা হয়। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করবেন, যারা আল্লাহর সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী শক্তিধর।" (সূরা হজ্ব ঃ আয়াত ৩৯)

উক্ত আয়াত দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, শত্রুদেরকে যদি মাঝে-মধ্যে সাইজ করা না হয়, তবে তাদের রোষানলে পতিত হবে এবাদতখানাগুলো।

এ মসজিদটিই আয়াতে কারীমার বাস্তবতা ও সত্যতার সাক্ষ্য বহন করে। উক্ত মসজিদের খতীব আব্বুর সহকারী শিক্ষক শামায়েল বুখারী। তিনি ছিলেন হাদীসের শাইখ। মিম্বরে দাঁড়িয়ে তাকে কোন সময় জিহাদের বয়ান করতে শুনিনি। শুনিনি তাকে নির্যাতিত মুসলমানের পক্ষে কথা বলতে। মসজিদ-মাদ্রাসার খেদমত করাকেই তিনি জীবনের একমাত্র কাজ বানিয়ে নিয়েছিলেন। আহ! মসজিদ রক্ষা ও সংরক্ষণের ওয়াজ তাঁর জবান থেকে শুনিনি। তিনি তো শহীদ হয়ে গিয়েছেন, কিন্তু তার মসজিদ আজ মদ্যশালায় পরিণত হয়েছে।

রাত আটটা। শহরে বেশি সময় অবস্থান করা উচিৎ নয়। চাচার সাথে সাক্ষাত করা দরকার। তাই আস্তে আস্তে সেদিকে পা বাড়ালাম। চাচা আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "বাবা! গতকাল আমার ঘোড়া বাড়ী ফিরে এসেছে। ঘোড়ার পিঠে কাউকে না দেখে আমি খুব চিন্তায় পড়ে যাই। তোমাদের কি অবস্থা, তা নিয়ে চিন্তা করতে করতে অস্থির।"

আমি চাচাকে মোটামুটি সব খবর শোনালাম। চাচা খুব খুশি হলেন।

চাচার নিকট বর্তমান হালত জানতে চাইলে তিনি বললেন, আজ রাতে জঙ্গলে ক্র্যাকডাউন লাগানো হবে। হাজার হাজার লাল বাহিনী আলমাআতায় আনা হয়েছে। এ অভিযানের নেতৃত্ব দেবেন জেনারেল মার্শাল বোদায়েভ।

চাচার নিকট থেকে সব খবর নিয়ে আমি বিদায় নিলাম। মনে মনে ভাবলাম, জামেউল উলুমের নিকট দিয়ে যাব। মাদ্রাসার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করব। তাই মাদ্রাসার রাস্তা ধরে অগ্রসর হলাম। দোকানপাট

প্রায় সবই বন্ধ। সেনাবাহিনীর গাড়ী ছাড়া অন্য কোন যানবাহন তেমন একটা দেখা যায় না। গোটা শহরে অশান্তি বিরাজ করছে। কিছুক্ষণের মধ্যে মাদ্রাসার নিকট এসে পৌঁছলাম। ঘাড় ফিরিয়ে দেখি শুধু আর্মি আর আর্মি। মাদ্রাসা পেছনে ফেলে আমি সামনে এগিয়ে যাই। হঠাৎ একজন আর্মি জোয়ান আমাকে ডাকল। আমি ভয়ে ভয়ে নিকটে গেলাম। সে আমাকে অনেক প্রশ্ন করল। আমি গা বাঁচিয়ে উত্তর দিলাম। সে আমাকে সেনাপতির নিকট নিয়ে যেতে চাইলে আমি আমার পরিচয়পত্র বের করে দেখালাম। সৈন্যটি পরিচয়পত্র দেখে আমাকে ছেড়ে দিল। আমি দ্রুতবেগে সাথীদের উদ্দেশ্যে ছুটে চললাম।

রাত দশটা। দূর থেকে দেখতে পেলাম নৌকার প্রদীপ মিট মিট করে জ্বলছে। নৌকার অদূরে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে এক মানবমূর্তি, যা আবছা আবছা দেখা যাচ্ছে। আমার গা শিউরে উঠল। এ কোন্ অভিসারিণী নিঝুম রাতে পথের ধারে দাঁড়িয়ে আছে? আমি সাহস সঞ্চয় করে জিজ্ঞেস করলাম, এত রাতে কে তুমি? চোর না ডাকাত? আমার কণ্ঠ ছায়েমার অতি পরিচিত। পরিচিত কণ্ঠ শুনে বলে উঠল, আমি চোর। আমি মানুষ চুরি করি। উত্তর শুনে আমি অট্টহাসিতে ফেটে পড়লাম।

আরও একটু হাঁটার পর আমরা নৌকায় এসে হাজির হলাম। সালামান্তে একে অপরের কুশল বিনিময়ে করলাম। ছায়েমা তার চিরাচরিত অভ্যাস অনুযায়ী খানা হাজির করল। আমি সবাইকে দাওয়াত দিলে উত্তর আসল, আমরা খেয়েছি, তোমরাও খাও। আমীর সাহেব ও জাফর ভাই খানা খেয়েছেন একটু আগে। শুধু ছায়েমা আমার অপেক্ষায়। দু'জন পৃথক পৃথক খানা খেলাম।

আমীর সাহেব কারগুজারী জানতে চাইলে আমি তাকে এলাকার থমথমে পরিস্থিতি ও হামলার বিবরণ জানালাম। ছায়েমা হঠাৎ প্রদীপ নিভিয়ে দিল। আমি ধমক দিয়ে বললাম, কি ব্যাপার, প্রদীপ নিভিয়ে দিলে যে ছায়েমা? সে উত্তর দিল, "আরে মিয়া! অন্ধকার দেখে ভয় পাও? অনেক দূর থেকে আলো দেখা যায়। এটা দুশমনের এলাকা। দূর থেকে আলো লক্ষ্য করে দুশমন গুলী ছুঁড়তে পারে কিংবা ধাওয়া করতে পারে।"

ছায়েমার বিচক্ষণতা দেখে আমীর সাহেব বলে উঠলেন, "বাহ! তুমি তো একজন হুঁশিয়ার সৈনিক। এত সমরবিদ্যা কোথা থেকে শিখলে? তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।"

আমীর সাহেব জরুরী বৈঠক তলব করলেন। আমরা সবাই একসাথে বসে গেলাম। জাফর ভাই বললেন, ছায়েমা! সর্বাগ্রে তুমি তোমার মতামত পেশ কর। ছায়েমা বলল, "হুজুর! আমার ধারণা, সৈন্য যদি ক্র্যাকডাউন লাগায়, তবে রাত দু'টার দিকেই রণসাজে সুসজ্জিত হয়ে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তারা আলমাআতা ত্যাগ করবে। ওরা ক্যাম্প খালি রেখে যাবে না। কিন্তু রসদপত্রসহ সৈন্য অবশ্যই রেখে যাবে। আমরা ইচ্ছা করলে রাত তিনটার দিকে আক্রমণ করে তাদের বিপুল ক্ষতিসাধন করতে পারব।"

আমরা সকলেই তার পরামর্শকে স্বাগত জানালাম। আমীর সাহেব ছায়েমাকে নৌকার হেফাজতে থাকতে নির্দেশ দিলেন। কারণ, একদিকে সে ষোল-সতের বছরের যুবতী, অপরদিকে কঠিন কাজ তার জন্য কষ্টকর হতে পারে।

এবার সায়েমা অনুরোধ ও সাহসিকতার সাথে বলে উঠল, "মাননীয় আমীর সাহেব! আপনাকে লাখো-কোটি মোবারকবাদ। আমি লড়াইয়ের ময়দানে উম্মে জিয়াদ ও বিবি খানছা (রাঃ)-এর মতো অবদান রাখতে চাই। যুদ্ধ থেকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করার মতো মেয়ে আমি নই। আমার একান্ত আশা, আজকের যুদ্ধে আমাকে অগ্রগামীদের মধ্যে রাখা হোক। রাখা হোক আমাকে তারুজী দলে। নেয়া হোক এ্যাকশন গ্রুপে। আমি মহামান্য আমীর সাহেবের নিকট আমার বিষয়টি পুনর্বিবেচনার আবেদন করছি। আশা করি, মোহ্‌তারাম আমীর সাহেব আমার দরখাস্ত মঞ্জুর করবেন।"

আমীর সাহেব কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললেন, "বেটি! তোমার জিহাদী জযবা দেখে আমি সত্যি আনন্দিত হলাম। আজ মুসলমানরা অকাতরে জীবন হারাচ্ছে। মা-বোনদের ইজ্জত লুণ্ঠিত হচ্ছে। গরু-ছাগল ও জীব-জানোয়ারের সমান মূল্যও আজ মুসলমানদের নেই। মুসলমানরা হারাচ্ছে তাদের রাষ্ট্র। ভুলে গেছে তাদের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস। জিহাদ ছেড়ে দিয়ে তারা গোলামের জাতিতে পরিণত

হয়েছে। দুনিয়ার মহব্বত আর মৃত্যুর ভয়ে তারা জিহাদ তরক করে চলেছে। যারা আমাদের রাহবার, তারাও আজ জিহাদ থেকে বিমুখ। তোমার মতো দ্বীনের দরদ যদি আলেমদের মনে থাকত, তাহলে ইসলাম আজ বিপন্ন হত না।”

ছায়েমার কাকুতি-মিনতি শুনে আমীর সাহেব অনুমতি দিলেন। আমাকে দিলেন নৌকা পাহারার দায়িত্ব। ছায়েমা খুশিতে বাগ বাগ। এখন সে রণসাজে সজ্জিত হচ্ছে। বিজয়ের স্বপ্ন দেখছে। ভাবছে, বিজয়মালা ছিনিয়ে এনে আমার গলায় পরাবে। আবার ভাবছে, হয়ত শাহাদাত মিলে যাবে। চলে যাবে পরম শান্তির নিকেতন জান্নাতে। সবাই আক্রমণের উদ্দেশ্যে নৌকা ত্যাগ করল। আমি ভারাক্রান্ত হৃদয়ে কাফেলা বিদায় দিয়ে নৌকায় ফিরে এলাম।

রাত দু'টার বেশী বাজছে। এখনো গোলাগুলীর আওয়াজ শুনতে পাইনি। আমি সেজদায় পড়ে কামিয়াবির দোআ করছি। হঠাৎ প্রচণ্ড গোলাগুলীর আওয়াজ কানে আসল। হামলা হয়েছে প্রচণ্ড। আসমান-জমিনের নীরবতা ভঙ্গ করে এক প্রলয়ংকরী অবস্থার সৃষ্টি হল। এক পোস্টের আওয়াজে অন্য পোস্টের সেনারাও গুলী ছুঁড়ছে বলে মনে হল। মনে হল পুরো আলমাআতা রণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। অরণ্য থেকে কোন গুলীর আওয়াজ শোনা যায়নি। হঠাৎ আমার মনে পড়ল, ওরা তো রাতে ক্র্যাকডাউন করে দিনের বেলা তল্লাশি চালাবে। গুলীর কোন প্রশ্নই আসে না। রাত প্রায় শেষ। এমন সময় জাফর ভাই গনীমতসহ নৌকায় ফিরে আসলেন। আমীর সাহেব ও ছায়েমা এখনো ফিরে আসেননি। জাফর ভাই বললেন, আমরা তিনটি পোস্টে আক্রমণ করেছি। বিশেষ বিশেষ স্থাপনায় রকেটলাঞ্চার নিক্ষেপ করে ওসব ধ্বংস করেছি। বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র ও বেতার সেন্টার সম্পূর্ণ ধ্বংস না হলেও বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং পুরো এলাকা অন্ধকারে ছেয়ে গেছে।

আমরা আমীর সাহেব ও ছায়েমার জন্য পেরেশান। তাদের জন্য দোআ করছি। সামান্য একটু পরে আমীর সাহেব খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে নৌকায় ফিরলেন। গুলীর আঘাতে তিনি যখমী হয়েছেন। জাফর ভাই নিজেই প্রাথমিক চিকিৎসা করলেন। ক্ষতস্থান পরিষ্কার করে ওষুধ লাগিয়ে ব্যান্ডেজ করে দিলেন। কিন্তু ছায়েমা তো আসছে না! হায়! হতভাগিনী

কি শহীদ হয়ে গেল, নাকি আহত অবস্থায় পড়ে মৃত্যুযন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে? নাকি দুশমনের হাতে বন্দী হল? আমীর সাহেব নিজেও অস্থির। তিনি বললেন, "সে তো ময়দানে প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেছে, যা দশজন সৈন্যের পক্ষেও সম্ভব ছিল না। সে তো আমাদের পাশে পাশেই ছিল। এলোপাতাড়ি গোলাগুলীতে যখন ছুটাছুটি করছিল, তখন সে আমাদের চোখের আড়াল হয়ে যায়।" অধীর আগ্রহে আমরা ছায়েমার পথপানে তাকিয়ে রইলাম।

রাত শেষ। কাক ডাকছে। পাখিরা উড়ছে। ভোরের পাখির কণ্ঠ থেকে রাঙ্গা রবির আগমন বার্তা শোনা যাচ্ছে। আমরা তাড়াতাড়ি নামায পড়ে নিলাম।

আমীর সাহেব নামাযান্তে সবাইকে নিয়ে বসলেন এবং বললেন, "সমস্যা আমাদের তিনটি ১. এ স্থান জলদি ত্যাগ করতে হবে ২. ছায়েমার সন্ধান করা ৩. হাটবাজার করা ও নিজের চিকিৎসা করা।"

সমস্যার কথা বলে তিনি ফয়সালা দিলেন যে, "খোবায়েব জামবুলী পোশাক পাল্টিয়ে পরিচয়পত্র সঙ্গে নিয়ে ছায়েমার সন্ধানে যাবে। জাফর সাহেব এক মাসের বাজার-সওদা ও ওষুধপত্র খরিদ করবে। আমি নিজেই স্থানীয় ক্লিনিকে গিয়ে ডাক্তার দেখিয়ে চিকিৎসা নেব।"

জাফর ভাই বাজারে চলে গেছেন। আমি খানাপিনার ব্যবস্থা করলাম। কিছুক্ষণ পর তিনি একটি ভ্যানে করে নিত্যপ্রয়োজনীয় সওদা নিয়ে এলেন। আমরা একসাথে খানাপিনা শেষ করলাম।

আমীর সাহেব জাফর ভাইকে নৌকায় থাকতে বললেন। আমি আমীর সাহেবকে নিয়ে ক্লিনিকের দিকে রওনা হলাম। ক্লিনিকে গিয়ে একজন দ্বীনদার ডাক্তার পেলাম। ডাক্তার আমীর সাহেবের ক্ষতস্থান পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বুঝতে পারলেন এটা গুলীর আঘাত। ছররা গুলীর অংশ এখনও রয়ে গেছে। এগুলো বের করে তিনি সেলাই করলেন। ওষুধপত্র দিলেন। আমরা যে মুজাহিদ, তা তিনি বুঝতে ভুল করেননি। ডাক্তার সাহেব চিকিৎসার বিনিময় এক পয়সাও নেননি বরং বেশকিছু টাকা দিয়ে বললেন, "জিহাদের কাজে এগুলো খরচ করবেন।"

আমরা ডাক্তার সাহেবকে ধন্যবাদ দিয়ে নৌকায় ফিরে এলাম।

সকাল ১০টার অধিক হয়ে গেছে। স্থান ত্যাগ করা ও ছায়েমার

সন্ধানে যাওয়া এক্ষুণি দরকার। আমীর সাহেব বলেন, "আমরা নৌকা নিয়ে দক্ষিণের খাল বেয়ে কয়েক কিলোমিটার দূরে চলে যাব। জঙ্গলের দিকে যাওয়া ঠিক হবে না। তুমি খুব সতর্কতার সাথে অবশ্যই ছায়েমাকে খুঁজে বের করবে। আল্লাহ তোমার হেফাজত করবেন। ছায়েমার খোঁজ নিয়ে দেরি করো না, জলদি নৌকায় ফিরে এসো।"

আমীর সাহেবের কথামতো আমি পোশাক পাল্টিয়ে পরিচয়পত্র সঙ্গে নিয়ে আলমাআতা অভিমুখে যাত্রা করলাম। আমীর সাহেব ও জাফর ভাই নৌকা নিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে রওনা হলেন।

[বার]

একদিকে সারারাত ঘুমজাগা, অপরদিকে ছায়েমার চিন্তা। মেয়েটা কোথায় আছে, কোথায় পাব? আমি রাজ্যের চিন্তা মাথায় নিয়ে পথ চলছি। বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই, নেই হৃদয়ের প্রশান্তি। সব মিলিয়ে আমি যেন এক উন্মাদ। তবুও আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা রেখে পথ চলছি। চারদিকে হাহাকার আর অশান্তি বিরাজ করছে। কৃষক-শ্রমিক, ছাত্র-জনতা কারো মুখে হাসি নেই। গোটা এলাকাটাই যেন বিরান।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল হল। আমি শহরের প্রধান ফটক অতিক্রম করে নগরীতে প্রবেশ করলাম। যানবাহন না থাকায় পায়ে হেঁটে আলমাআতা জামেউল উলুম মাদ্রাসায় আসলাম। গেটে গেলে আরপি পথ আগলিয়ে দাঁড়াল। আমার পরিচয় চাইল। আমি আমার পরিচয়পত্রটা হাতে দিয়ে বললাম, সেনাপতি বোদায়েভের সাথে সাক্ষাৎ করতে এসেছি। তিনি আছেন কি? সিপাহী উত্তর দিল, "তিনি এখানে নেই! গভীর অরণ্যে ক্র্যাকডাউন দেয়ার জন্য তিন হাজার সৈন্য নিয়ে স্পটে আছেন।"

আমি অনুরোধ করে বললাম, স্যার! গত রাতে এদিকে অনেক গোলাগুলীর আওয়াজ শুনতে পেলাম। কোন দুর্ঘটনা ঘটেছে কি?

সিপাহী বলল, "হ্যাঁ, রক্তক্ষয়ী এক দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। আমরা সৈন্যদেরকে বিদায় দিয়ে খুব সতর্ক অবস্থায় ছিলাম। শেষ রজনীতে অতর্কিতে চারদিক থেকে শত শত মুজাহিদ ক্যাম্প আক্রমণ করে। এতে ষাটজন সৈন্য নিহত হয়েছে, আহত হয়েছে ডজনখানেক। তাছাড়া বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র ও বেতার ভবন মারাত্মকভাবে

ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। টেলিফোন এক্সচেঞ্জ বিধ্বস্ত হয়েছে। সব ধরনের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।"

আমি আবার প্রশ্ন করলাম, স্যার! কোন মুজাহিদ নিহত বা গ্রেফতার হয়নি?

তিনি বললেন, "না, তবে সন্দেহভাজন কিছু লোককে বন্দী কর বাসকাউন্ড এলাকায় এক পরিত্যক্ত তুলার গুদামে রাখা হয়েছে, ওদেরকে সেখানেই খতম করা হবে।"

আমি সমবেদনা ও নিন্দা জ্ঞাপন করে বললাম, স্যার! তাহলে তো আমাদের বেশি ক্ষতি হয়েছে। কিন্তু ওদের যে কিছুই করতে পারেননি, তার কারণ কি?

সিপাহী বিরক্ত হয়ে বললেন, "বেটা! ওদের ঘায়েল করা কি এত সহজ? বাংকারের সৈন্য ছাড়া বাকি সব সৈন্যই মারা পড়েছে। সারাদেশের যোগাযোগ বন্ধ হয়ে গেছে। যাবতীয় যন্ত্রপাতি ও কলকব্জা ধ্বংস হয়ে গেছে। অন্য সব ক্যাম্পের সাথেও কোন যোগাযোগ হচ্ছে না। মনে হয় ওসব ইউনিটও নিরাপদ নেই। কারণ, প্রচণ্ড গোলাগুলীর আওয়াজ শোনা গেছে।"

আমি করজোরে নিবেদন করলাম, স্যার! এ মুহূর্তে আমি আপনাদের কি সাহায্য করতে পারি? আমরা কমিউনিস্ট যুবক যারা আছি, সবাই আপনাদের খেদমতের জন্য প্রস্তুত আছি। আপনার হুকুমের অপেক্ষায়...।

সৈন্যটি থ্যাংকইউ বলে মোবারকবাদ জানালেন। তারপর বললেন, "বাবা! যদি পার, তবে ঘুরে ঘুরে অন্য সব ক্যাম্পের খবর ও মুজাহিদদের খবর সংগ্রহ কর। পরবর্তীতে দেখি কোন এ্যাকশন নেয়া যায় কিনা।"

আমি বললাম, স্যার! বাহন নেই, কিভাবে এসব সংবাদ সংগ্রহ করতে পারি? তিন-চার দিনেও হয়ত সম্ভব হবে না।

সিপাহী বলল, "আমাদের অনেক ঘোড়া রয়েছে, তোমার যেটা পছন্দ নিয়ে যাও। দেখ, আবার মুনাফিকী কর না।"

আমি তার কথামত একটি তাজি ঘোড়া বেছে নিলাম। অতপর ঘোড়া হাঁকিয়ে দ্বিতীয় সেনা ছাউনীতে গেলাম। সেখানে গিয়ে ক্যাম্প

কর্মকর্তার সাথে সাক্ষাৎ করে এখানকার অবস্থা জানতে চাইলাম। অফিসার বললেন, "তুমি কে? তোমার পরিচয় কি?"

আমি বললাম, আলমাআতা আমার নিবাস, কমিউনিস্ট বিপ্লবের কর্মী। আলমাআতার ভ্রাম্যমান ক্যাম্পের সেনানায়ক আপনাদের সংবাদ নেয়ার জন্য আমাকে প্রেরণ করেছেন। এই বলে আমি আমার পরিচয়পত্রটা তার হাতে দেই। তিনি নিরীক্ষা করে যাচাই করলেন। তারপর সব ঘটনার বর্ণনা দিলেন এবং আহতদের চিকিৎসার জন্য বললেন। আমি দ্রুত হাসপাতাল থেকে বড় ডাক্তার এনে তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করলাম।

আমি বললাম, স্যার! আমি আপনাদের সংবাদ নিয়ে সেনানিবাসে যাব। প্রয়োজনীয় রসদপত্রের একটি তালিকা দিলে হয়ত আপনাদের জন্য বরাদ্দ করবেন। তিনি আমার কথামত রসদ ও জরুরী ওষুধপত্রের একটি তালিকা আমার হাতে দিয়ে বললেন, "যাও বাবা! দেখ আমাদের জন্য কিছু করতে পার কিনা।" আমি আবেদন জানালাম, স্যার! আমি যে আপনার এখানে পরিদর্শন করেছি, তার একটা সত্যায়নপত্র দিলে ভাল হয়। তিনি আমাকে সুন্দরভাবে একটি সত্যায়নপত্র লিখে দিলেন।

পড়ন্ত বেলা। এখানে বেশিক্ষণ দেরী করা ঠিক হবে না। তাই সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমি বাসকাউন্ডের দিকে ঘোড়া হাঁকালাম। বিকেল ছয়টার দিকে বাসকাউন্ডে এসে উপস্থিত হলাম। আলমাআতা থেকে বাসকাউন্ড প্রায় ষাট কিলোমিটার রাস্তা। দু'তিন জায়গায় বিশ্রাম নিতে হল। বেশ ক'বার নিতে হয়েছে রাস্তার সন্ধান। বাসকাউন্ড অন্যসব জনপদের মত নয়। এটি শীতপ্রধান এলাকা। সাইবেরিয়ার বরফাঞ্চলের হীমপ্রবাহ বাসকাউন্ডের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়। এলাকাটা ঘন জঙ্গল না হলেও গাছগাছালি প্রচুর। কৃষিপ্রধান এলাকা। হাটবাজার দূরে দূরে। এলাকাটা অনেকটা অবহেলিত। লোকসংখ্যাও কম। গ্রাম্য পরিবেশ। অনেক পথ অতিক্রম করেও আমি তুলার গুদামের সন্ধান পেলাম না।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। হাড় কাঁপান শীত। পথঘাট অচেনা। লোকজন কম। আমি চিন্তার পাহাড় মাথায় নিয়ে ঘুরছি, যেন আমি মজনু-লায়লার খোঁজে ঘুরছি। হঠাৎ এক যুবকের সাথে সাক্ষাত হল।

তাকে পেয়ে আমার পেরেশান অনেকটা লাঘব হল।

তাকে জিজ্ঞেস করলাম, ভাইজান! আপনার নাম কি?

উত্তর দিল, “আবদুর রশীদ।”

আপনার বাড়ী কোথায়?

সামনের একটি গ্রাম দেখিয়ে বলল, “ঐ গ্রামে।”

এখানে তুলার গোডাউন কোথায় বলতে পারেন কি?

যুবক উত্তর না দিয়ে উল্টো প্রশ্ন করল, “ভাই! আপনার পরিচয় জানতে পারি কি?”

আমি বললাম, হ্যাঁ, অবশ্যই জানতে পারেন। আমার নাম খোবায়েব জামবুলী, আলমাআতার অন্তর্গত জামবুলে আমার নিবাস। আমি কলেজে অধ্যয়ন করছি। বর্তমানে লাল বাহিনীর গুপ্তচর। কমিউনিস্ট বিপ্লবে বিশ্বাসী। লেনিনের আদর্শের অনুসারী।

যুবকটি আমার পরিচয় জেনে ভয় পেয়ে গেল। তার চেহারায় ফুটে উঠেছে আতংকের ছাপ। আমি তার অবস্থা বুঝতে পেরে অভয় দিয়ে বললাম, আমি তোমার উপর কোন জুলুম করব না। ভয় পেও না। আমাকে তুলার গোডাউনে নিয়ে চল।

যুবক বলল, “ভাই! তুলার গুদাম অনেক দূর। সেখানে যেতে রাত অনেক হয়ে যাবে। তাছাড়া ওখানে যাওয়াও নিরাপদ নয়। কারণ, সেখানে অনেক মুসলিম নারী-পুরুষকে বন্দী করে রাখা হয়েছে। ওদিকে কোন লোককে যেতে দেয়া হয় না। তিনজন আর্মি দিন-রাত অস্ত্র হাতে পাহারা দিচ্ছে।”

যুবকের কথা শুনে আমি চিন্তায় পড়ে গেলাম। কারণ, না জেনে না শুনে হঠাৎ কিছু করা ঠিক হবে না। আমি তাকে বললাম, ভাই, আমি আজ আপনার ঘরে মেহমান হতে চাই।

যুবক বলল, “হ্যাঁ, অবশ্যই। চলুন গরীবালয়ে।” আমি যুবককে ঘোড়ার পিঠে চড়িয়ে তার বাড়ীর দিকে ছুটলাম। যখন তার বাড়ী পৌছি, তখন মাগরিবের সময় যায় যায়। আমি তাড়াতাড়ি নামায পড়ে নিলাম। আমাকে নামায পড়তে দেখে বাড়ীর সকলে কানাকানি করতে লাগল– “তাহলে কি লোকটি মুসলমান? কিন্তু তার গায়ে এ পোশাক কেন? শুনলাম, লোকটি লাল বাহিনীর সদস্য। এ কি করে হয়?”

বাড়ীর লোকজন এসব নিয়ে বলাবলি করছে। এ সময় আবদুর রশিদের আব্বা কাজী হাসান আমার নিকট এসে বললেন, "বাবা! তুমি কি মুসলমান?"

আমি বললাম, হ্যাঁ, আমি মুসলমান।

"কিন্তু পোশাক-আশাকে তো তোমাকে কমিউনিস্ট মনে হচ্ছে?"

আমি বললাম, তা ভাগ্যের নির্মম পরিহাস।

"তুমি তুলার গুদামের খোঁজ করছ কেন?"

বললাম, শুনেছি ওখানে আমার মুসলিম মা-বোনরা বন্দী আছে। বন্দী আছে আলেম-ওলামা ও পরহেজগার মুসলমানরা। আমি তাদেরকে মুক্ত করতে এসেছি জামবুল থেকে। আমি তাদের চোখের পানি মুছতে এসেছি। মা-বাবার কোলে ওদের ফিরিয়ে দিতে এসেছি।

আমার কথা শুনে কাজী হাসান সাহেব চোখের পানিতে বুক ভাসালেন। কেঁদে কেঁদে বললেন, "বাবা! আমার বড় ছেলে আবদুস সামাদকে ওরা বন্দী করে ঐ তুলার গোডাউনে নিয়ে গেছে। অনেক চেষ্টা করেও রাখতে পারিনি।"

আমি বৃদ্ধকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, আর বিলাপ করবেন না। আল্লাহ চাহেন তো আপনার বুকের ধন আবার আপনার নিকট ফিরে আসবে।

আমার কথাগুলো বাড়ীর সবাই শুনল। আবদুর রশিদ আমাকে অনেকটা আপন করে নিল। বৃদ্ধ খুব যত্ন সহকারে আমাকে নিজের ছেলের মত খানা খাওয়ালেন। আমি আবদুর রশিদকে গোডাউনের রাস্তার কথা জিজ্ঞেস করলে সে রাস্তার সন্ধান দিল। আমি তার কথা অনুযায়ী রাস্তার ম্যাপ করে নিলাম। সে জিজ্ঞেস করল, "ভাই! এই রাতে এত ব্যস্ত হলেন কেন? আগামীকাল রাস্তা দেখিয়ে আমি নিজেই আপনার সঙ্গে যাব।"

আমি বললাম, আবদুর রশীদ! ওরা তুলার অন্ধকার প্রকোষ্ঠে মানবতের জীবন কাটাবে আর আমি তোমাদের গৃহে নরম বিছানায় শুয়ে আরাম করব, তা কখনো হতে পারে না। আজ রাতেই ওদেরকে মুক্ত করতে হবে।

আমার কথা শুনে আবদুর রশীদের সাহস অনেকটা বেড়ে গেল। সে বলল, "ঠিক আছে ভাইজান! আমি আপনাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাব।"

ওর কথায় আমি খুব খুশি হলাম। এশার সময় হয়ে গেছে কিছু আগেই। আমি আবদুর রশীদকে নিয়ে নামায আদায় করে কামিয়াবীর জন্য দোআ করলাম। তারপর একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করে ঘোড়ায় আরোহন করে বুকে বন্দী মুক্তির আশা নিয়ে দু'জনে ছুটলাম।

আমরা আঁকাবাঁকা পথ বেয়ে চলছি। আবদুর রশীদ ঘোড়ার পেছন বসে আমাকে দিক-নির্দেশনা দিচ্ছে। রাত প্রায় একটার দিকে আমরা তুলার গোডাউনের দ্বারপ্রান্তে এসে উপনীত হলাম। ঘোড়াটি একটু দূরে গাছ-গাছালির আড়ালে বেঁধে নগ্নপায়ে বিড়ালের মত এগিয়ে চললাম। দেখতে পেলাম, একজন গোডাউন পাহারা দিচ্ছে আর দু'জন নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে। আবদুর রশীদকে চুপে চুপে বললাম, পাহারারত ব্যক্তির অস্ত্র ছিনিয়ে নেয়ার সাথে সাথে ঘুমন্ত দু'জনের অস্ত্র হাতে উঠিয়ে নেবে চোখের পলকে। আমরা দেয়ালের অন্তরালে লুকিয়ে আছি। এদিক-ওদিক তাকিয়ে আস্তে করে কয়েক কদম অগ্রসর হয়ে অস্ত্রটি কেড়ে নিয়ে ওর বুকে তাক করে বললাম, হারামজাদা, শব্দ করলে ঝাঁঝরা করে দেব।

সৈন্যটি নির্বাক দাঁড়িয়ে রইল। আবদুর রশিদ বিলম্ব না করে বাকী দু'টি অস্ত্রও হাতে তুলে নিল। তারপর এক এক করে তিনজনকে বেঁধে ফেললাম। ওদের থেকে চাবি নিয়ে লোহার গেট খুলে গোডাউনে প্রবেশ করলাম । আহ! এটা তুলার গোডাউন নয়। আমি কসম করে বলতে পারি, এটা অন্ধকারের গোডাউন।

পাহারাদার থেকে টর্চলাইট নিয়ে ভেতরে ঢুকলাম। মনে হল এটি একটি গ্রাম। আমি বন্দীদেরকে লক্ষ্য করে বললাম, হে আমার বন্দী ভাই-বোনেরা! এখন তোমরা মুক্ত। জলদি বেরিয়ে আস। যার যার বাড়ী ফিরে যাও। আমার কথা শুনে তারা হুমড়ি খেয়ে গেটের দিকে এগিয়ে গেল। কার আগে কে বের হবে প্রতিযোগিতা চলছে। সবাই বেরিয়ে এল। কিন্তু ছায়েমাকে দেখছি না। আমার হৃদয় কেঁদে উঠল। হায়! এত কষ্ট করে এলাম! অথচ এখানে সে নেই। তাহলে কি হায়েনারা ছায়েমাকে শহীদ করে দিয়েছে! নাকি অন্য কোন বন্দী শিবিরে লুকিয়ে রেখেছে?

এসব চিন্তায় আমার গণ্ডদ্বয় অশ্রুতে ভিজে যাচ্ছে। বুকের জ্বালা

ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে। সামলানো আর সম্ভব হচ্ছে না। দুনিয়াটা একেবারে অন্ধকার মনে হচ্ছে। কিন্তু তারপরও হৃদয়ে আশার আলো প্রজ্বলিত করলাম।

শেষবারের মতো আবার লাইট টিপে দেখার ইচ্ছা হল। আবদুর রশীদের হাত ধরে অনেক ভেতরে ঢুকলাম। এমন সময় ছায়েমার কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। ছায়েমা সিজদায় পড়ে প্রার্থনা করছে, "ইয়া আল্লাহ! আমরা আজ কাফেরদের হাতে বন্দী। তুমি ছাড়া মুক্তিদাতা, আর কেউ নেই। তুমিই আমাদের একমাত্র ভরসা। এই জিন্দানখানা থেকে তুমি আমাদের মুক্তি দাও। হে আল্লাহ! আমার খোবায়েবকে তুমি হেফাজত কর। হে আমার মাওলা! কাফেরদের ছোবল থেকে দেশকে মুক্ত কর। ঘুমন্ত মুসলমানদের ঘুম ভাঙ্গিয়ে দাও। জিহাদী নিশান দিকে দিকে উত্তোলন কর।"

আমি পেছনে দাঁড়িয়ে উচ্চস্বরে বলে উঠলাম, আমীন।

এবার ছায়েমা আমাকে আবিষ্কার করে বলে উঠল, "খোবায়েব ভাইয়া! আবার তুমি বন্দিনীকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে এসেছ? তুমি না নৌকায় ছিলে? এখানে আসলে কি করে?"

আমি বললাম, তোমাকে মুক্ত করতে এসেছি। এই বলে আমি ছায়েমাকে হাত ধরে বাইরে নিয়ে এলাম।

বন্দী সৈন্যরা মাটিতে পড়ে আছে। এদেরকে হত্যা করতে হবে। লাশও গুম করতে হবে। আমি আবদুর রশীদকে জিজ্ঞেস করলাম, এদের লাশ কোথায় কিভাবে রাখলে গোপন থাকবে? সে বলল, জঙ্গলে একটি গভীর কূপ আছে। সেখানে কোন লোকজন যায় না, ওখানে রাখা যাবে। আমরা গলায় ফাঁস লাগিয়ে তিনজনকে হত্যা করে কূপে সোপর্দ করি। অতপর সৈনিকের পোশাক ও অস্ত্রশস্ত্র গনীমত হিসেবে নিয়ে তিনজন আবদুর রশীদের বাড়ীতে ফিরে আসি।

আবদুর রশীদের বড় ভাই আবদুস সামাদকে ফিরে পেয়ে বাড়ীর সবাই কান্না শুরু করে দেয়। রাত প্রায় শেষ। আমি ও ছায়েমা দু'রাকাত নফল নামায পড়ে আল্লাহর সমীপে শুকরিয়া আদায় করলাম। তারপর ফজরের নামায আদায় করে ক্লান্ত শরীরে ঘুমিয়ে পড়লাম।

[তের]

সকাল আটটা। মানুষের কলরবে আমাদের সুখনিদ্রা ভেঙ্গে গেল। বাড়ীর ভেতরে ও বাইরে শোরগোল শোনা যাচ্ছে। কিসের এত আওয়াজ? কিসের এত শোরগোল? কেন আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার আগমন আবদুর রশীদের বাড়ীতে। হঠাৎ এক অচেনা কণ্ঠের আওয়াজ কানে আসল, "কে সেই মহাপুরুষ, যিনি তোমাদেরকে উদ্ধার করে এনেছেন? কে সেই মহামানব, যিনি তোমাদের মুক্ত করতে মরু কান্তার পেরিয়ে সুদূর আলমাআতা থেকে ছুটে এসেছেন?" কথাগুলো বলছিলেন এক আগন্তুক। এসব কথা কানে আসলে বুঝতে পারলাম, এলাকার লোকজন উদ্ধারকৃত বন্দীদেরকে দেখতে আসছে।

এমন সময় আবদুর রশীদ এসে বলল, "ভাই খোবায়েব! এলাকার লোকজন আপনাকে দেখতে চায়।"

আমি আবদুর রশীদকে বললাম, উপস্থিত লোকজনকে এক জায়গায় সমবেত কর। আবদুর রশীদ তাই করল। আমি বারান্দায় বেরিয়ে এসে আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ বলে সালাম দিলাম। জনতা সমস্বরে ওয়াআলাইকুমস সালাম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহি ওয়াবারকাতুহু বলে জবাব দেয়। আমি উপস্থিত জনতাকে উদ্দেশ করে বললাম–

আমার প্রিয় দেশবাসী! আজ মুসলিম উম্মাহ বলসেভিকদের কাছে জিম্মি। তারা ছিনিয়ে নিয়েছে আমাদের অধিকার, আমাদের স্বাধীনতা। আমরা আজ নির্যাতিত, নিপীড়িত। প্রতিনিয়ত চলছে উৎপীড়নের স্টীমরোলার। মুসলমানদের উপর বাতিলরা আজ খড়গহস্ত। জাতিকে উদ্ধার করতে হলে, দেশকে বাঁচাতে হলে, আল্লাহর যমীনে খেলাফত প্রতিষ্ঠা করতে হলে জান-মাল নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে হবে। তাছাড়া নিস্তার পাওয়ার বিকল্প কোন পথ আল্লাহ ও তার রাসূল বলে যাননি।

হে আমার দেশপ্রেমিক ও দ্বীনদরদী বন্ধুরা! বলসেভিকরা অত্র এলাকা থেকে নিরীহ জনগণকে ধরে নিয়ে গেছে। তাদের উপর অকথ্য নির্যাতন চালাচ্ছে। লুণ্ঠণ করছেন সতি-সাধ্বী মা-বোনদের ইজ্জত। আপনারা শুধু ঘৃণা করছেন, প্রতিবাদ করছেন। দোয়াও করছেন। কিন্তু

কোন বন্দী আপনাদের দোআ-প্রতিবাদ আর ঘৃণা দ্বারা মুক্তি পায়নি। মুক্তি পেয়েছে জিহাদের দ্বারা। তারা মুক্তি পেয়েছে আক্রমণ দ্বারা।

আমার কথায় সকলেই মাথা নেড়ে নেড়ে সমর্থন জানাল। উপস্থিত লোকেরা আমার কথাগুলো খুব মনোযোগ সহকারে শুনছিল। কিন্তু সময় না থাকার কারণে বক্তব্যের যবনিকা টানতে বাধ্য হলাম।

সকাল দশটা। ফিরে যেতে হবে আলমাআতায়। সেদিকে আবার কোন্ অঘটন ঘটে যায় কে জানে। আমি ছায়েমাকে কাছে ডেকে বললাম, তুমি এখানে দু'এক-দিন বিশ্রাম নাও। আমি ওদিকের খবরা-খবর জেনে এসে তোমাকে নিয়ে যাব। আমার কথায় ছায়েমা হাউ মাউ করে কেঁদে ফেলল। তারপর কাতর সুরে বলল, "তুমি আমাকে একা ফেলে যেওনা। তোমাকে ছাড়া আমি যে এক মুহূর্তও থাকতে পারিনা। তুমি আমাকে সাথে নিয়ে চল।"

আমি বললাম, ওদিকের অবস্থা খুবই গরম, তাতো অবশ্যই জান। এ এলাকা অনেকটা শান্ত। তাই তুমি এখানে অবস্থান করতে থাক। আমি যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি ফিরে আসব। তোমাকে একা রেখে আমিও নিশ্চিন্তে থাকতে পারব না।

ছায়েমা রাজি হল। অমি আব্দুর রশিদকে ডেকে বুঝিয়ে বললাম, এ লোকটির প্রতি নজর রাখবে। আবদুর রশিদ বলল, "ভাইয়া! এ বলতে হবে না। আমি জীবন দিয়ে তাকে হেফাজতে রাখার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।"

বৃদ্ধ খানা নিয়ে হাজির হলেন। আমি ছায়েমাকে নিয়ে খানা খেলাম।

আমি সকলের নিকট থেকে দোআ চেয়ে সালাম দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে বসলাম। ঘোড়া আমাকে নিয়ে দ্রুতগতিতে আলমাআতা অভিমুখে ছুটে চলল। মাঠঘাট-বনবাদার পেরিয়ে পাগলের মত ছুটে চলল। ছায়েমা অপলক নেত্রে তাকিয়ে রইল। মুজাহিদদের কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ায় দূরদূরান্ত থেকে নেমে আসল জনতার ঢল, বাঁধভাঙ্গা তরঙ্গ। সবাই কৌতূহলী দৃষ্টিতে ছায়েমার দিকে তাকায়। মুজাহিদ দেখার সাধ আর তাদের মেটে না। তার সঙ্গে তারা কথা বলতে চায়। ছায়েমা আমার চিন্তায় মুখের ভাষা হারিয়ে ফেলেছে।

দুপুর বারটা। প্রচণ্ড তাপে বিদগ্ধ ধরণী। ছায়েমা সবাইকে বলে

দিল, "বিকেলে সময় পেলে আসবেন, তখন কিছু কথা বলব। এখন আর পারছি না।"

সবাই বিদায় নিয়ে চলে গেল। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হল। ছায়েমার কথামত চারদিক থেকে লোকজন ছুটে আসছে আবদুর রশীদের বাড়ীতে। দহলিজে লোক আর ধরে না। তিল ধারণের ঠাঁই নেই। দক্ষিণের আপেল বাগানে চেয়ার-টেবিল পাতা রয়েছে। লোকজন তরুণ মুজাহিদের বক্তব্য শুনবে। তাকে একনজর দেখবে। ছায়েমা কক্ষ থেকে বেরিয়ে আসল। সবাই অপলক নেত্রে তাকিয়ে আছে! আহ! কি সুন্দর! কি অপরূপ চেহারা। এখনো দাড়ি-গোঁফ গজায়নি। তরুণ মুজাহিদ! গায়ে তার সৈনিকের পোশাক। ছেলে না মেয়ে চেনা যায় না।

ছায়েমা সকলের সাথে হাসিখুশি ব্যবহার করছে। আবদুর রশীদ সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছেলে। ওরা দু'ভাই দু'বোন। দাদা গ্রামের মাতব্বর। গোটা পরিবারই শিক্ষিত। দ্বীনদারীরও অভাব নেই। প্রতিবেশীরা চায় ছায়েমাকে দাওয়াত করে খাওয়াতে। কিন্তু আবদুর রশিদদের মেহমান অন্যরা নেবে, তার সাহস ক'জনেরই বা আছে? ছায়েমা অত্যন্ত লাজুক প্রকৃতির। দিলে তার পর্দার ভয়। নিরিবিলি থাকতে পছন্দ করে। তা সত্ত্বেও লোকজনের সাথে কিছু কথাবার্তা না বললেই নয়।

আবদুর রশীদের দু'বোন বেলিন্তিনা ও নাঈমা। ওরা স্কুলের ছাত্রী, ছায়েমার সমবয়স্কা। ওরাও ছায়েমার পেছনে লেগে আছে। সারাক্ষণ কাছেই থাকতে চায়। আবদুর রশীদ ও তার বড় ভাই আবদুস সামাদ; এরাও চায় ছায়েমাকে নিয়ে এদিক-ওদিক ঘুরাফেরা করতে। কিন্তু ছায়েমা পাশ কেটে থাকার চেষ্টা করে। কিন্তু ওদের সঙ্গে কুলিয়ে উঠতে পারছে না ছায়েমা। তাই আপেল বাগানের আড্ডায় অংশগ্রহণ করে।

ছায়েমা লজ্জা একটু আড়াল করে যুবকদেরকে ধর্মের কাহিনী শোনায়। স্মরণ করিয়ে দেয় হারান দিনের ইতিহাস। সকলেই অধীর আগ্রহে তার বক্তব্য শোনে। ছায়েমা হেফজ শেষ করে বেশকিছু কিতাবও অধ্যয়ন করেছে। মাসআলা-মাসায়েলও জানা আছে তার। সে আলোকেই বয়ান-বক্তৃতা ও আলোচনা করতে গিয়ে সে বলল, "আমার যুবক ভাইয়েরা! মুসলমানদের জান-মাল, ইজ্জত-আব্রু, তাহজীব-তামাদ্দুন হেফাজতের জন্য আল্লাহ আমাদের উপর জিহাদ ফী

সাবীলিল্লাহ ফরয করে দিয়েছেন। কিতাল ফী সাবীলিল্লাহর ব্যাপারে পবিত্র কালামে ছয়শ' আশি জায়গায় আলোচনা করা হয়েছে। আর নামাযের আলোচনা করা হয়েছে মাত্র আশি জায়গায়। নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাতের মত জিহাদও একটি ফরজ ইবাদত। জিহাদ দুই প্রকার- প্রথম প্রকার হচ্ছে জিহাদে ইকদামী আক্রমণমূলক জিহাদ। এটা ফরযে কেফায়া। অর্থাৎ মুসলমানদের কোন একটা দল যদি তা আদায় করে, তবে সকলের উপর থেকে ফরযের জিম্মা আদায় হয়ে যায়। অর্থাৎ শান্তিপূর্ণ পরিবেশে বছরে কমপক্ষে দু'বার কাফের রাষ্ট্রে আক্রমণ করা হল আক্রমণমূলক জিহাদ। যেন কাফেররা সবসময় ভীত-সন্ত্রস্ত থাকে। ওরা যেন মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোন ধরনের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতে না পারে। যদি এমন একটি শক্তিশালী জামাত ও বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র থাকে যে, দুমশনের উপর আক্রমণ করে বিজয়ী হতে পারবে, তবে অন্যসব মুসলমান যুদ্ধে না গেলেও গোনাহ হবে না। এক জামাত আদায় করলেই আদায় হয়ে যাবে।

দ্বিতীয় প্রকার জিহাদকে প্রতিরক্ষামূলক জিহাদ বলে। এটা সবসময় ফরযে আইন। জিহাদ ফরযে আইন হওয়ার শর্ত চারটি। চার কারণের যে কোন একটি কারণ পাওয়া গেলে সমস্ত উম্মতের উপর পর্যায়ক্রমে জিহাদ ফরযে আইন তথা অবশ্য কর্তব্য হয়ে যায়। যথা-

এক) মুসলমানদের বিজিত এলাকার এক বিঘত পরিমাণ জমি কাফেররা দখল করলে এ জায়গা উদ্ধার করা ঐ এলাকার মুসলমান নারী-পুরুষের উপর ফরযে আইন। যদি এমন হয়, ওরা জিহাদ করতে পারছে না বা জিহাদ করছে না, উভয় অবস্থায় পার্শ্ববর্তী মুসলমানের উপর জিহাদ ফরযে আইন। পার্শ্ববর্তী মুসলমান জিহাদ করছে না, এমতাবস্থায় দূরবর্তী মুসলমানদের জন্য জিহাদ ফরযে আইন। এরাও যদি না করে বা না করতে পারে, তবে গোটা দুনিয়ার মুসলমানের উপর জিহাদ ফরযে আইন হয়ে যায়।

দুই) কোন মুসলিম পুরুষ বা নারী যদি কাফেরদের হাতে বন্দী হয়, তবে সে বন্দী বা বন্দিনীকে উদ্ধারকল্পে (উল্লেখিত) পর্যায়ক্রমে জিহাদ ফরযে আইন।

তিন) কাফেররা যদি মুসলিম ভূখণ্ডের সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ

ঘটায়, পরিখা (বাংকার) খনন করে, ক্ষেপণাস্ত্র মোতায়েন করে, বেশী বেশী সমরাস্ত্র তৈরি বা ক্রয় করে, সেনাবাহিনীতে মুসলমানদের তুলনায় বেশি লোক ভর্তি করে, তাহলে জিহাদ সকলের উপর ফরযে আইন হয়ে যায়।

চার) মুসলমানদের আমীর জিহাদের আহ্বান করলে, তখনও সকলের উপর জিহাদ ফরযে আইন হয়ে যায়।

জিহাদ ফরযে আইন হলে তার হুকুম হল, সন্তান মাতা-পিতার অনুমতি ছাড়া, স্ত্রী স্বামীর অনুমতি ছাড়া, গোলাম তার মালিকের অনুমতি ছাড়া, ঋণগ্রস্থ ব্যক্তি পাওনাদারের এজাযত ছাড়াই জিহাদে অংশগ্রহণ করতে পারবে; কারো অনুমতির প্রয়োজন হবে না।"

ছায়েমা আরো বলল, "মহানবী (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেনি বা জিহাদের প্রস্তুতি নেয়নি, এমনকি মনে জিহাদের ইচ্ছাও পোষণ করেনি, সে মুনাফিক অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে।" (মুসলিম) নাউজুবিল্লাহ।

ছায়েমার মূল্যবান বক্তব্য শ্রবণ করে যুবকদের মাঝে এক নতুন চেতনা জন্ম নিল। নবজাগরণ ফিরে এল। সকলে জিহাদের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করল। ছায়েমা আরো একটু এগিয়ে বলল, "হে যুবক বন্ধুরা, তোমরা শোন! যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়, তারা জীবিত। তারা মৃত্যুবরণ করে না। তাদেরকে এক প্রকার রিযিক দেয়া হয়। শহীদ হওয়ার সাথে সাথে তাদের রূহকে সবুজ পাখির মধ্যে ভরে দিয়ে জান্নাতে পাঠিয়ে দেয়া হয়। সেখানে তারা মনের আনন্দে বিচরণ করতে থাকে। তারা জান্নাতের ফলমূল ভক্ষণ করে, পান করে দুধ, মধু, সরবৎ ইত্যাদি বেহেশ্‌তের নির্ঝরিণী থেকে। শহীদদেরকে আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু এমন মর্যাদা দান করবেন যে, একজন শহীদ সত্তরজন থেকে একশ'জন জাহান্নামীক সুপারিশ করে জান্নাতে নিয়ে যেতে পারবেন।" সে আরো বলল, "মুজাহিদ যখন কন্টকাকীর্ণ ও খুনরাঙা পিচ্ছিল পথে লড়াই করতে থাকে, তখন বেহেশ্‌তের দরজা খুলে হুর-গেলমানরা দলবদ্ধভাবে প্রথম আসমানে এসে হাজির হয়ে শহীদদের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। যারা শহীদ হবে, তারা বেহেশ্‌তে নাজ নেয়ামত, হুর-গেলমান দেখতে পায়। তখন সমস্ত ভয়-ভীতি দু'পায়ে দলে শত্রুর উপর

ঝাঁপিয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় যুদ্ধ করতে করতে যখন শহীদ হয়ে যায়, তখন বেহেশ্তের হুর-গেলমানরা এস্তেকবাল করে তাকে বেহেশ্তে নিয়ে যায়।" সোবহানাল্লাহ, কত বড় মর্যাদা!

ছায়েমার ভাষণে শুধু যুবক নয়, বৃদ্ধ এবং মহিলাদের মধ্যেও এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হল। কখন, কোথায়, কিভাবে জিহাদ করবে, তা জানতে চাইলে ছায়েমা বলল, "বন্ধুরা! তোমরা মানসিক দিক দিয়ে তৈরি থাক আর কষ্টার্জিত উপার্জন থেকে ফান্ড সংগ্রহ কর। তারপর তোমাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। তোমরা শারীরিক, মানসিক, দৈহিক ও আর্থিক প্রস্তুতি নিয়ে রাখ। সময়ই তোমাদের বলে দেবে কোথায়, কখন, কিভাবে জিহাদ করবে।"

এতক্ষণে দিনমনি তার রীতি অনুযায়ী পশ্চিমের গাছ-গাছালির মাথার উপর দিয়ে রক্তিম আভা ছড়িয়ে দিয়ে পালানোর পথ খুঁজছে। একটু পরেই গোধুলীতে ছেয়ে যাবে তামাম জাহান। ছায়েমা আজকের মত সবাইকে বিদায় দিয়ে মাগরিবের নামাযের জন্য তৈরী হচ্ছে। আগন্তুক ব্যক্তিবর্গ স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্তন করল।

ছায়েমা সবাইকে বিদায় দিয়ে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করে নামায আদায় করল। নামাযান্তে জায়নামাযে বসেই সুললিত কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত করতে লাগল। পবিত্র কালামের সুমধুর সুর-লহরিতে বাড়ীর লোকজন স্থির থাকতে পারছে না। সাধারণত সন্ধ্যায় সব মানুষের কিছু কাজ থাকে। এ কারণে অনেকেই ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ছায়েমার রুমে আসতে পারেনি। বেলিস্তিনা তার ছাগলপাল খোয়াড়ে উঠাতে লাগল। নাঈমা শামাদান পরিস্কার করে তেল ভরে প্রদীপ জ্বালানোর ব্যবস্থা করছে। নাঈমা ও বেলিন্তিনা তাড়াহুড়া করে কাজগুলো সেরে নিয়ে প্রদীপ হাতে ছায়েমার ঘরে ঢুকল। দু'জনে দু'টি কেদারা নিয়ে বসে গেল। তারা মনের আনন্দে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত শুনছে। ছায়েমা আধা পারা পড়ে ছাদাকাল্লাহু... বলে শেষ করল।

বেলিন্তিনা ও নাঈমার মনে ছায়েমার প্রতি প্রচণ্ড কৌতূহল। যেমন তার রূপ-সৌন্দর্য, তেমনি না দেখে এত সুন্দর করে কুরআন তেলাওয়াতের সুর-মুর্ছনা। এ মেহমান যদি চিরদিন তাদের ঘরে থাকত! এমন করে যদি প্রতিদিন পবিত্র কালামের সুরলহরী শুনতে পারত!

আরো কত কল্পনার জাল বুনছে ছায়েমাকে নিয়ে। বেলিন্তিনা আর নাঈমার হৃদয়ে এগুলো ছাড়াও আরো অনেক কিছু উঁকিঝুকি মারছে। সব কি আর বলা যায়?

তিলাওয়াত শেষে ছায়েমা দু'রাকাত নামায আদায় করে এদিকে ঘুরে বসল এবং বলল, "তোমরা একটু দরূদ এস্তেগফার পড়ে নাও।" তারপর দু'হাত উত্তোলন করে মুনাজাত করছে– "আয় আল্লাহ! তুমি সমস্ত প্রশংসার মালিক এবং তুমিই আমাদের একমাত্র রব। তুমিই বান্দার দোয়া কবুল করে থাক। আয় আল্লাহ, তুমি আমাকে তোমার দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য তোমার জমিনে খেলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য, নির্যাতিত মুসলমান মা-বোনদের ইজ্জতের হেফাজতের জন্য আমার খুনকে এস্তেমাল করার তাওফীক দান কর। আমাদের হাতের দ্বারা দুশমন খতম করে প্রতিশোধের অনল নিবারণ কর। তোমার পথে লড়াই করতে করতে যেন শাহাদাতের অমৃত সুধা পান করে তোমার সান্নিধ্যে ফিরে যেতে পারি, তার জন্য সাহায্য কর। আল্লাহুম্মারজুক্‌নী শাহাদাতান কামিলাতাম ফী সাবীলিক।" বাকিরা আমীন! আমীন! বলে অশ্রু ঝরাচ্ছে। ছায়েমার মুনাজাতে বাড়ীর সকলের চোখেই অশ্রু ঝরছে। মুনাজাতের সময় বাড়ীর সবাই ছায়েমার কক্ষের বাহিরে দাঁড়িয়ে ছিল। মুনাজাত শেষে সবাই চলে গেছে নিজ নিজ ঘরে। কক্ষে শুধু বেলিন্তিনা ও নাঈমা।

ছায়েমা তার স্বজাতিদের মাঝে নিজেকে প্রকাশ করবে বলে মনস্থির করল। প্রথমে হেলমেটটা খুলে রেখে দিল সামনের টেবিলে। সাথে সাথে একগুচ্ছ কৃষ্ণকেশ নেমে এল কটিদেশে। বেলিন্তিনা হাস্যোজ্জ্বল বদনে নাঈমার দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, "নাঈমা! এটা কি স্বপ্ন, নাকি চোখের ধাঁধা? চোখ কি সবসময়ই মিথ্যা দেখে? যেমন নীলিমার দিকে তাকালে মনে হয় ক্রমশই দূরে মাটিতে মিশে গেছে, আসলে তা সত্য নয়। দীর্ঘাকৃতি রেলগাড়ির দিকে তাকালে মনে হয় দূরের বগীগুলো ক্রমশ ছোট হয়ে গেছে। রেল লাইনের উপর দাঁড়িয়ে দূরে তাকালে মনে হয় কিছুদূর গিয়ে দু'টো পাত এক হয়ে মিশে গেছে। আসলে তা সত্য নয়।"

মুসাফিরকে দেখে সেরকমই মনে হচ্ছে। বেলিন্তিনার কথা শুনে

ছায়েমা শুভ্র দন্তগুলো প্রকাশ করে হাসছে। ছায়েমার হাসিতে যেন মুক্তা ঝরছে। এবার তিনজন স্বজাতি মন উজাড় করে কথা বলছে। নাঈমা জিজ্ঞেস করল, আপনার নামটা জানা হল না? ছায়েমা উত্তর দিল, আমার নাম ছায়েমা।

আহ! কি সুন্দর নাম।

এমন সময় আবদুর রশীদ ডাক দিল, "মুসাফির ভাইয়া! কি করছ?"

ছায়েমা তাড়াতাড়ি পূর্বের রূপে ফিরে যেতে যেতে বলল, "আবদুর রশীদ ভাই! এতক্ষণ পর কোথা থেকে এলেন? এতক্ষণ কোথায় ছিলেন?" বলতে বলতে দরজা খুলে দিল।

আবদুর রশীদ গৃহে প্রবেশ করার সাথে সাথে বেলিন্তিনা ও নাঈমা চলে গেল। বাড়ীর বড় ঘরে প্রবেশ করে দু'জন হেসে কুটপাট। গৃহকর্তা ধমক দিয়ে বললেন, 'রাত অনেক হয়েছে। তোমরা একবারও পড়তে বসনি। ছোট খুকির মত হাসছ কেন?" নাঈমা মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে বলল, "আম্মি! জানো, মুসাফির যুবক নয়, সে একজন যুবতী।"

আম্মি আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা জানলে কি করে!"

বেলেন্তিনা সব ঘটনা খুলে বলল।

এশার নামায এখনো পড়া হয়নি। ছায়েমা ওযু করে নামায পড়তে দাঁড়ায়। নাঈমা বড় ঘরে দস্তরখানা পেতে খাওয়ার আয়োজন করছে। ছায়েমার নামায শেষ হলে বেলেন্তিনা তাকে হাত ধরে বড় ঘরে নিয়ে এল। সবাই খেতে বসেছে। আবদুস সামাদ, আবদুর রশীদ, নাঈমা, বেলেন্তিনা ও ছায়েমা। মনে হচ্ছে সকলেই যেন আপন ভাই-বোন। তাদের মা খানা পরিবেশন করছেন। খানা শেষে ছায়েমা তার কক্ষে গিয়ে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ে।

গভীর রাত। ছায়েমার ঘুম আসছে না। কেবলই খোবায়েবের কথা তার হৃদয় সরোবরে শিউলির মত ভেসে বেড়াচ্ছে। কোথায় জানি কোন্ হালতে আছে! আমীর সাহেব ও জাফর ভাই কি নিরাপদ আছেন? না কোন অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছেন। খোবায়েব ভাইয়া কি নৌকার সন্ধান পেয়েছে, না এখনো পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে? এসব চিন্তা ও প্রশ্ন বারবারই ছায়েমার মনে জাগছে। চোখের পানিতে বালিশ ভিজাচ্ছে।

রাত দ্বিপ্রহর। অঘুম নয়নে কত কি ভাবছে ছায়েমা। এসব

ভাবনার মাঝে কখন যে ঘুম এসে তাকে অচেতন করে দিয়েছে, ছায়েমা টেরই পায়নি।

[চৌদ্দ]

রাত পোহাল। ভোর হল। ছায়েমা ঘুম থেকে ওঠে ফজরের নামায আদায় করল। তারপর সুমধুর কণ্ঠে তিলাওয়াতে নিমগ্ন হল। এমন সময় বাহির আঙ্গিনায় কে যেন ডাকছে, "আবদুর রশিদ! আবদুর রশিদ!

আবদুর রশীদ সবেমাত্র ঘুম থেকে উঠে নামায পড়ছিল। ছালাম ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করে, "এত ভোরে কে ডাকছে?" আগন্তুক উত্তর দিল, "আমি ও-পাড়ার ফারুক।"

"এতো সকালে কেন এসেছ?" জিজ্ঞেস করে আবদুর রশিদ।

ফারুক শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় উত্তর দিল, "ভাই, গত রাতে আমাদের পাড়ায় এক বিভীষিকা বয়ে গেছে!"

কী বিভীষিকা ফারুক?

"বলসেভিকদের অত্যাচার থেকে বাসকাউন্ড অনেক নিরাপদ ছিল। অন্যসব এলাকার মতো এখানে নির্যাতন হত না। কিন্তু এখন সে আগুন ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র। গত রাতে বলসেভিক ফৌজরা আমাদের সতের-আঠারজন যুবককে ধরে নিয়ে গেছে। ওদেরকে কোথায় নিয়ে গেছে, তা এখনও জানা সম্ভব হয়নি।"

ছায়েমাও ঘরে বসে ফারুকের কথাগুলো শুনতে পায়। সে মনে মনে ভাবছে, বন্দীমুক্তি ও প্রহরী হত্যার জের হিসেবেই সম্ভবত এ আক্রমণ চালান হয়েছে। ছায়েমা ঘর থেকে বের হয়ে ওদের নিকট গিয়ে দাঁড়াল। ফারুক সব ঘটনা খুলে বলল। ছায়েমা কথাগুলো শুনে অগ্নিশর্মা হয়ে বলল, "বড়ই আফসোস ও পরিতাপের বিষয়, বড়ই দুঃখ ও বেদনার বিষয়! ধিক্কার মুসলিম যুবসমাজের প্রতি, ওরা ক্রিকেট, হকি, ফুটবল, দাবা আর তাস খেলার প্রতিযোগিতা করছে। ঘুম জেগে করছে এগুলোর অনুশীলন। তারা আজ ভুলে গেছে সমরবিদ্যা, ভুলে গেছে তীরান্দাজী, নিশানাবাজী, বর্শা নিক্ষেপ, তলোয়ার ও ঘোড়দৌড়।

সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) সমরবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। জিহাদের প্রশিক্ষণ ও অনুশীলনকে আল্লাহ উম্মতে মুসলিমার উপর ফরয করে দিয়েছেন। জিহাদ ছেড়ে দেয়ার কারণে তাগুত আজ মুসলমাদের উপর

নির্যাতন করতে সাহস পাচ্ছে। আজ কোন নওজোয়ান নেই তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে, আক্রমণের জবাব দিতে। যুবকদের অন্তরে প্রতিশোধের আগুন প্রজ্বলিত হচ্ছে না। ওরা যেন স্পন্দনহীন।"

ছায়েমা আবদুর রশীদকে বলল, "ভাইজান! আপনি দয়া করে তথ্য নিয়ে আসুন। তারপর দেখব কি করা যায়।"

আবদুর রশীদ এ ব্যাপারে আনাড়ি। বলল, তথ্য সংগ্রহ কিভাবে করব, তা বুঝিয়ে দিলে উপকার হবে।

ছায়েমা বলল, "এখান থেকে বাসকাউন্ড সেনা ছাউনী কত দূর, সেখানে যাওয়ার রাস্তা কয়টি, কোন্ রাস্তার দূরত্ব কতটুকু, কয়টি চৌরাস্তা, চলার পথে কয়টি বাজার পড়বে, বাজারে পাহারাদার আছে কিনা, কোন ব্রীজ-কালভার্ট আছে কিনা, নদী বা খাল আছে কিনা, পারাপারের ব্যবস্থা আছে কিনা, ছাউনীতে সৈন্য সংখ্যা কত, পাহারাদারী আছে কতজন, কি কি অস্ত্র আছে তাদের সাথে ইত্যাদি তথ্য গোপনে জেনে আসবেন। তাছাড়া আরো জানা দরকার, লোকবসতি বেশি কোন্দিকে। জানতে হবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অফিস-আদালত, হাসপাতাল ও উপাসনালয়ের অবস্থান। এগুলোর সঠিক নকশা তৈরি করতে হবে। হামলার পূর্বশর্ত হল তথ্য সংগ্রহ।"

আবদুর রশীদ ছায়েমার কথামত ছদ্মবেশে তথ্য সংগ্রহের জন্য চলে গেল।

সন্ধ্যার পূর্বেই আবদুর রশীদ তথ্য সংগ্রহ করে ফিরে আসে। জরিপ রিপোর্ট ও নকশা তৈরি করে ছায়েমার হাতে দেয়। ছায়েমা নকশা ও রিপোর্ট নিয়ে কিছুক্ষণ গবেষণা করে।

মাগরিবের সময় হয়ে এসেছে। ছায়েমা নামাযের প্রস্তুতি নিচ্ছে। ও-পাড়ার ফারুক ও বশীর আবদুর রশীদের বাড়ীতে এসেছে। ছায়েমা নামায সেরে ওদেরকে ডেকে কক্ষে নিয়ে আসে। তারপর যুবকদেরকে লক্ষ্য করে বলল, "আমার যুবক বন্ধুরা! আজ রাতে ক্যাম্পে আক্রমণ করে বন্দীদেরকে ছিনিয়ে আনব ইনশাআল্লাহ। আর বলসেভিকদের সমুচিত শিক্ষা দেয়া হবে।"

ছায়েমার কথা শুনে ফারুকের চোখ দু'টো যেন কপালে উঠে গেল। সে বলল, "মুসাফির ভাই! তুমি এসব কি বলছ! তোমার কি মাথা

খারাপ হয়েছে! শতাধিক শত্রুর মোকাবেলায় তিন-চারজন লোক কি করব? তাদের তুলনায় আমরা তো রিক্তহস্ত।"

ফারুকের কাপুরুষোচিত কথা শুনে ছায়েমা তেজোদ্দীপ্ত কণ্ঠে বলল, "মহান আল্লাহ দুর্বল ও অসহায়দের পক্ষে থাকেন। আল্লাহতায়ালার নিয়ম হল, তিনি বড় বড় শক্তিগুলোকে ছোট ছোট শক্তি দ্বারা ধ্বংস করে তার কুদরত ও ক্ষমতার প্রকাশ ঘটান। যেমন, আবরাহার হস্তী বাহিনীকে ছোট ছোট পাখি দ্বারা ধ্বংস করেছেন। আবু জেহেল লানাতুল্লাহ আলাইহি নবীকে কষ্ট দিয়েছে। তাই ছোট দু'নাবালক কিশোর দ্বারা তাকে হত্যা করিয়েছেন। এ সমস্ত ঘটনাবলী দ্বারা আল্লাহ নিজের ক্ষমতা ও কুদরত প্রকাশ করেছেন। আমরা যদিও দুর্বল ও সংখ্যায় কম, তবুও আমরা যদি আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা রেখে শক্তিশালী বাহিনীর উপর আক্রমণ করি, নিশ্চয়ই আল্লাহর মদদ আমাদের পক্ষে থাকবে। দুর্বল-অসহায় মজলুম হিসেবে আমরাই আল্লাহর সাহায্যের হকদার।"

ছায়েমার কথায় সকলের সাহস বৃদ্ধি পেল এবং আক্রমণ করার ইচ্ছে প্রকাশ করল। ছায়েমা চারজনের একটি টিম তৈরি করে কার কি কাজ, কে কোথায় থাকবে, ভালভাবে বুঝিয়ে দিল।

ফারুক প্রশ্ন করল, "মুসাফির ভাই! একেবারে খালি হাতে?"

ছায়েমা বলল, "আমার নিকট তিনটি মাঝারি ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র আছে, তা ব্যবহার করব। আর একজনের হাতে থাকবে খঞ্জর।"

যুবক বলল, "অস্ত্র চালান তো শিখিনি, কি করে অস্ত্র চালাব?"

ছায়েমা বলল, "আমি শিখিয়ে দেব।"

তারপর রুদ্ধকক্ষে বসে তিনজনকেই অস্ত্র চালানোর খুঁটিনাটি বিষয়াদি তালিম দিল। অস্ত্র চালনা শিখে যুবকরাও আনন্দ পেল এবং তাদের মধ্যে লড়াইয়ের জযবা বেড়ে গেল। আজ তারা পেয়েছে নতুন জগতের সন্ধান। আজ তারা আঁখি মেলে দেখছে নতুন এক জগত। ডানা মেলে চায় নবদিগন্তে উড়তে। সবাই আনন্দিত, সবাই পুলকিত।

আজ ওরা মুজাহিদ। ওরা আজ আল্লাহর পথের সৈনিক। ওরা আজ লড়াকু। আল্লাহর দুশমনের সাথে লড়বে। বন্দীদেরকে মুক্ত করবে, দুশমনকে পরাভূত করে ইসলামের বিজয় নিশান উড়াবে। শিরায় শিরায়

বইছে আনন্দের প্লাবন। পুলকের উর্মিমালায় ভাসছে যুবক দল। ছায়েমা আরো কিছু প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা দিয়ে এশার নামায আদায় করে নেয়ার জন্য অনুমতি দিল। যুবকরা নামাযের জন্য মসজিদে চলে গেল। ছায়েমা ঘরে নামায আদায় করল।

বেলেন্তিনা ও নাঈমা ছায়েমার রুমে প্রবেশ করে মুচকি হেসে বলল, "আপা! এখনই খানা নিয়ে আসব কি?"

ছায়েমা একটু বিরক্ত হয়ে বলল, "আরে, তোমরা দেখছি আমার গোপনীয়তা প্রকাশ করে ফেলবে। এতে তো আমার ক্ষতি হবে। তোমরা কি বুঝ না? তোমরা তো এখনও ছোট নও।"

বেলেন্তিনা ও নাঈমা লজ্জায় মাথানত করে ফেলল। ছায়েমা খানার এজাজত দিলে তারা খানা নিয়ে এল। তিনজন এক সাথে বসে খানা খেল।

যুবকরা মসজিদ থেকে ফিরে এলে ছায়েমা বলল, "ভাইয়েরা! আমি তোমাদেরকে রেখে খানা খেয়ে ফেলেছি। তোমরাও খেয়ে নাও।" যুবকরা হেসে বলল, "সব তো খাননি। আর সব খেয়ে ফেললেও অসুবিধা নেই। আপনাকে দেখলে খানাপিনার চাহিদা মিটে যায়।" ছায়েমার হাসিতে মুক্তা ঝরে। সে মুক্তাঝরা হাসি হেসে বলল, "ওসব কথা রেখে আগে খেয়ে নাও।"

আবদুর রশীদ যুবকদেরকে নিয়ে খানা খাচ্ছে। ছায়েমা বলল, "তোমরা খানা খেয়ে অস্ত্রশস্ত্র গুছিয়ে বিশ্রাম করে নাও। কারণ, আক্রমণের সময় তন্দ্রাভাব হলে অসুবিধার সৃষ্টি করবে।"

যুবকরা খানা খেয়ে অস্ত্রগুলো ভাল করে মুছে অয়েলগান মেখে গুলীভর্তি করে শিয়রে রেখে ঘুমিয়ে পড়ল। ছায়েমাও তার কক্ষের প্রদীপ নিভিয়ে দরজা বন্ধ করে ঘুমিয়ে পড়ল।

রাত আনুমানিক বারটা। ছায়েমা ঘুম থেকে জেগে অযু-এস্তেঞ্জা সেরে তাহাজ্জুদ নামায আদায় করে কামিয়াবীর জন্য দোয়া করল। তারপর আবদুর রশীদ ও যুবকদের জাগিয়ে তুলল। যুবকদেরকে বলল, "তোমরা জলদি অযু করে দু'রাকাত নামায পড়ে নাও। আমাদের এখনই বের হতে হবে।"

যুবকরা তাই করল।

ছায়েমা আজ সেনাপতি। রণসাজে সুসজ্জিত হয়ে আগুনঝরা বক্তৃতার মাধ্যমে যুবকদের অন্তরে প্রতিশোধের আগুন জ্বেলে দিল, সাহস জোগাল, শাহাদাতের লোভ দেখাল। দৃঢ়তা, এখলাছ ও সহিষ্ণুতার উপর আলোচনা করল। তারপর দুই যুবকের হাতে তুলে দিল দু'টি ক্লাশিনকভ, আরেকজনকে দিল খঞ্জর। নিজে নিল এসএলআর।

সিপাহসালার ছায়েমা তার ক্ষুদ্র বাহিনী নিয়ে এগিয়ে চলল বন্দী মুক্তির উদ্দেশ্যে। আবদুর রশীদ রাহবার হিসেবে আগে আগে চলছে। বাকিরা তার অনুসরণ করছে। তারা বিড়ালের মতো নগ্নপায়ে চলছে। কারো কোন পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে না। সবাই যেন রণকৌশলী। কয়েকটি গ্রাম পেরিয়ে তারা শত্রু এলাকায় এসে পৌঁছল।

রাত আনুমানিক ১টা। সারা দুনিয়া নীরব-নিস্তব্ধ। ছায়েমা সবাইকে একটি বৃক্ষের নীচে বসিয়ে নিজেই ক্যাম্পে গিয়ে পর্যবেক্ষণ করে আসল। উত্তর পাশের ঘরে কান্নাকাটির আওয়াজ শুনতে পেল। মনে হয় এ ঘরেই বন্দীদের রাখা হয়েছে। সে ঘরের দরজায় পাহারারত এক সৈন্যকে অস্ত্র হাতে দেখতে পেল। অপর দু'জন সৈন্য অস্ত্র হাতে পাহারা দিচ্ছে পূর্বদিকে। বাকি সৈন্যরা ঘুমাচ্ছে। ছায়েমা আবদুর রশীদের সাথে দু'জন যুবক দিয়ে বলল, তোমরা টহলরত দু'জনের প্রতি খেয়াল রাখ। আমি বন্দীশালার প্রহরীকে বধ করার সাথে সাথে তোমরা দু'জনকে হত্যা করবে। একজনকে সবগুলো দরজার শিকল লাগিয়ে দিতে বলল।

ছায়েমা ক্রলিং করে এগুতে লাগল। বন্দীশালার প্রহরী অর্গলের এক পার্শ্বে দাঁড়িয়ে ঝিমুচ্ছে। ছায়েমা আস্তে করে তার গলায় ফাঁস লাগিয়ে দিল। সে বাঁচার জন্য যতই নড়াচড়া করছে, ততই তার শ্বাসরুদ্ধ হতে লাগল। এক পর্যায়ে তার প্রাণবায়ু বের হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। ছায়েমা বন্দীশালার তালার মধ্যে কয়েকটি ফায়ার করে তালাটি ভেঙ্গে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিল। তারপর ঘরে প্রবেশ করে বন্দীদের বলল, "হে আমার মুসলিম ভাই ও বোনেরা! তোমরা এখন মুক্ত। জলদি এখান থেকে পালাও। যার যার এলাকায় ফিরে যাও।"

এ ঘোষণার সাথে সাথে বন্দীরা সব ছুটে পালাল।

ছায়েমার ফায়ারের শব্দ শুনে টহলরত দুই সৈনিক পালানোর জন্য পথ খুঁজছিল। আবদুর রশীদ হাঁক ছেড়ে বলল, "খামোশ-নরাধম! এক্ষুণি আত্মসমর্পণ কর। নইলে রক্ষা নেই।"

আবদুর রশীদের আওয়াজে দু'জনই অস্ত্র ফেলে দিয়ে হাত উঁচু করে দাঁড়িয়ে গেল। আবদুর রশীদ অস্ত্র দু'টি তুলে নিল এবং ফারুক ও বশীর জুতোর ফিতা দিয়ে উভয়ের হাত শক্ত করে বেঁধে ফেলল।

পূর্বদিকের ঘরে সত্তর-আশিজন সৈন্য ফায়ারের আওয়াজ শুনে হতবিহ্বল হয়ে পড়ল। বাঁচাও বাঁচাও আর্তনাদে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে তুলল। কেউ ঘর থেকে বেরুতে পারছে না। সৈন্য শিবির কাদের দখলে, তাও টের পায়নি। তাদের ক্রন্দনরোলে মনে হচ্ছিল কেয়ামত শুরু হয়েছে।

ছায়েমা বন্দী পাহারাদেরকে জিজ্ঞেস করল, "তোমাদের ওয়ারলেস সেট কোথায়?"

সৈন্য উত্তর দেয়, "মেজর সাহেবের নিকট। বেটারী চার্জ না থাকায় বর্তমানে সেটা অকেজো হয়ে আছে। শহর থেকে চার্জ দিয়ে আনতে হবে।"

ছায়েমা বন্দীকে বলল, "তোমার পরিচয় দিয়ে দরজা খুলতে বল।" সৈন্য তাই করল। কিন্তু ওরা দরজা খুলল না। ঘরটি ছিল মজুবত দেয়ালবেষ্টিত। এসব অস্ত্র দ্বারা দেয়ালের কিছু করা সম্ভব নয় বিধায় ছায়েমা জানালা দিয়ে বন্দুকের নল ঢুকিয়ে কয়েকটি ফায়ার করল। হতাহতের কোন খবর এ মুহূর্তে জানা গেল না।

ছায়েমা বন্দীদেরকে হত্যা করার ব্যবস্থা নিলে বন্দীরা করজোড় আবেদন করল যে, "আমরা মুসলমান। আমাদেরকে জোর করে সেনাবাহিনীতে আনা হয়েছে। অনেকবার পালানোর চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছি।"

ছায়েমা তাদের প্রতি সদয় হয়ে, তাদের কথায় বিশ্বাস করে হাতের বাঁধন খুলে দিয়ে বলল, "তোমরা জলদি পালাও। পারলে মুজাহিদদের সাহায্যে এগিয়ে আসবে।" এই বলে তাদেরকে কিছু টাকা দিয়ে বিদায় দিল। তারা হাসিমুখে সালাম জানিয়ে বিদায় নিল।

রাতের শেষ প্রহর। কিছুক্ষণ পরই লোকজনের চলাচল শুরু হবে।

ছায়েমা তাদের দলবল নিয়ে দ্রুতপদে আবদুর রশীদের বাড়ীর দিকে রওনা দেয়। ফজরের সময় তারা বাড়ী এসে পৌঁছে। ছায়েমার শরীর খুবই ক্লান্ত। সে বেলেন্তিনাকে গনীমতের অস্ত্র-শস্ত্র হেফাজত করতে দিয়ে নামায পড়ে শুয়ে পড়ল। আবদুর রশীদ, বশীর ও ফারুক নামায পড়ে যার যার মতো ঘুমিয়ে পড়ল।

ক্যাম্পের পার্শ্ববর্তী এলাকার লোকজন রাতেই ফায়ারের শব্দ পেয়েছে। তারা মনে করেছে, বন্দীদেরকে হয়ত গুলী করে শহীদ করা হয়েছে। তাই রাতে কেউ খোঁজ নিতে আসেনি। লোকজন সকালবেলা ক্যাম্পে এসে সেখানকার দৃশ্য দেখে হতবাক হয়ে যায়। দেখতে পায়, উত্তরের ঘরের বারান্দার পাশে গলায় রশি লাগান বিবস্ত্র এক সৈনিকের লাশ। পূর্বপাশের ঘরে পাঁচ-সাতটি লাশ রক্তের বন্যায় ভাসছে, আর বেশ ক'জন সৈন্য আহত অবস্থায় মৃত্যুর অপেক্ষায় প্রহর গুণছে। সারা ক্যাম্প জুড়ে আর কোন বলসেভিক সৈন্য নেই। সবাই পলায়ন করেছে।

ছায়েমা গৃহাভ্যন্তরে এপাশ-ওপাশ করছে। তার চোখে ঘুম নেই। কেবল ভাবছে খোবায়েবের কথা। খোবায়েব কোথায় কি অবস্থায় আছে ভেবে অস্থির। আজ দু-তিনদিন অতীত হতে চলেছে এখনও হতভাগা ফিরে আসেনি। সে কি বন্দী হয়ে গেছে নাকি শাহাদাতের অমৃত সুধা পান করে জান্নাতে চলে গেছে কে জানে। খোবায়েবকে ছাড়া এক মুহূর্ত থাকা কত যে কষ্টকর, তা কে বুঝবে। খোবায়েবকে ঘিরে ছায়েমা কতই না কল্পনার জাল বুনছে। কতই না স্বপ্ন লালন করছে।

খোবায়েবকে নিয়ে জিহাদের মাধ্যমে বলসেভিক ও কমিউনিজমের পতন ঘটাবে, জাতির মুক্তি ছিনিয়ে আনবে, ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা করবে, মা-বোনের ইজ্জত রক্ষা করবে, মুসলমানদের জান-মালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে, মসজিদ-মাদ্রাসার তালাগুলো খুলে দেবে, আবার তালিম-তরবিয়ত চালু করবে, আরো সহস্র স্বপ্নের জাল বিস্তার করে আছে ছায়েমার কিশোরী হৃদয়ে। খোবায়েব যদি বন্দী বা শহীদ হয়ে যায়, তবে কাকে নিয়ে সে তার স্বপ্ন বাস্তবায়িত করবে, সফলতার পথে, কামিয়াবীর পথে এগিয়ে যাবে? ছায়েমার অন্তরে এসব নানা প্রশ্ন উদয় হতে লাগল এবং চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরে বালিশ সিক্ত হচ্ছিল। ওদিকে আমীর সাহেব ও ও জাফর ভাইয়ের চিন্তাও ব্যাকুল

করে তুলেছে তাকে। অনেক চেষ্টা করেও চোখে ঘুম আনতে পারছেনা।

আপামণি! ও আপামণি! ডাকতে ডাকতে নাঈমা কক্ষে প্রবেশ করে। ছায়েমা বিরক্ত হয়ে চেহারা অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিল। ইতিমধ্যে বেলেন্তিনাও এসে হাজির। ছায়েমার হাবভাব দেখে বেলেন্তিনা বুঝে ফেলে, 'আপা' বলে ডাকার কারণে সেদিনও ছায়েমা আপা অসন্তুষ্ট হয়েছিল। তাই বলে উঠল, "সরি, ক্ষমা কর মুসাফির! ভুল হয়ে গেছে। তোমার বোনদের প্রতি ক্ষমাসুন্দর নজরে তাকাও।"

বারবার অনুনয়-বিনয়ে ছায়েমা রুমালে চোখ মুছে এদিক ঘুরল। বেলেন্তিনা পাশে বসে আস্তে আস্তে বলতে লাগল, "মুসাফির ভাই! বুঝতে পেরেছি, থাকা-খাওয়ার কষ্ট হচ্ছে বলে কাঁদছেন। ভাইয়া, আমাদের অপরাধগুলো ক্ষমা করবেন। এটা আপনার বাড়ি, আমরা আপনার ছোট বোন, কখন কি ভুল করে বসি। তাছাড়া আপনার যখন যা দরকার হয় আমাদের বলবেন। আমরা তা পূরণ করার আপ্রাণ চেষ্টা করব।"

ছায়েমা বেলেন্তিনার কথায় উত্তর দিতে গিয়ে বলল, "বোন! তোমরা কি আমাকে সুখ দিতে পারবে? মনের জ্বালা নিবারণ করতে পারবে? আল্লাহ যদি এ অবলা দাসী থেকে ঈমানী পরীক্ষা নিতে চান, তবে কে আছে আমাকে রক্ষা করবে? দুনিয়ার জীবনে সান্ত্বনা পাওয়ার মতো আমার কোন আশ্রয়স্থল নেই। আমি মা-বাবার স্নেহ-মমতা থেকে বঞ্চিত। ভাই-বোন নেই। সবাই আমাকে শোক সাগরে ভাসিয়ে জান্নাতে চলে গেছেন। সবাই শাহাদাতবরণ করেছেন। আমি হতভাগী, অনাথিনী এখনও বেঁচে আছি। দুনিয়ার জীবনে সান্ত্বনা পাওয়ার মত একটি মাত্রই স্থান বাকি আছে। তাও তো আজ দু-তিনদিন আমাকে এখানে ফেলে রেখে পলায়ন করেছে।"

ছায়েমার কথা শুনে বেলেন্তিনা ও নাঈমার স্বপ্ন ভেঙ্গেছে। ওরা বুঝতে পারে কার জন্য এত পেরেশানী, কার জন্য তার চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরছে সারাক্ষণ। এ যে সেই বীর পুরুষ, বর্তমান জামানার খালিদ বিন ওলিদ, তারিক বিন যিয়াদ, মোহাম্মদ বিন কাসিম, আবদুল্লাহ বিন রাওহা খোবায়েব জামবুলী।

ছায়েমার কথাগুলো শুনে বেলেন্তিনা ও নাঈমা চোখের পানি

সামলিয়ে রাখতে পারেনি। তাদের চোখও অশ্রুসিক্ত হয়ে যায়। একটু পরে উভয়ে উড়নীর সাহায্যে অশ্রু মুছে ছায়েমাকে সান্ত্বনা দিতে লাগল।

বেলেন্তিনা বলল, "আপনি শান্ত হোন, আগামীকাল প্রত্যূষে যে করেই হোক আবদুর রশীদ ভাইয়াকে আলমাআতা পাঠাব। সে নিশ্চয়ই খোবায়েবের সন্ধান না নিয়ে ফিরবে না। তার পথঘাট সব জানা। আপনি এত বিচলিত হবেন না। আপনিই তো আমাদের ধৈর্য ধারণের তালিম দিয়েছিলেন, আর এখন দেখি নিজের মধ্যেই আমল নেই।"

ছায়েমা খানিকটা সান্ত্বনা পেল।

হঠাৎ বাড়ীর আঙ্গিনায় দাঁড়িয়ে এক বৃদ্ধ আবদুর রশীদকে ডাকছে। নাঈমা দৌড়ে গিয়ে বৃদ্ধকে বলল, ভাইয়া এখন ঘুমাচ্ছেন, তাকে ডাকা যাবে না। দয়া করে একটু পরে আসুন। কোন সংবাদ থাকলে আমাকে বলতে পারেন। ভাইয়া ঘুম থেকে উঠলে তাকে আপনার খবর জানাব।"

বৃদ্ধ নাঈমাকে লক্ষ্য করে বললেন, গত রাতে সেনা ছাউনীতে এক প্রলয় সংঘটিত হয়েছে। অনেক সৈন্য নিহত হয়েছে। পনের-বিশজন আহতও হয়েছে। তিনজন প্রহরীর মধ্যে একজন নিহত আর দু'জন পলায়ন করেছে। এ ঘটনার দায়দায়িত্ব কেউ স্বীকার করেনি। সেনা অফিসারগণ দু'জন প্রহরীকে দোষী সাব্যস্ত করেছে। ওদেরকে বের করতে সেনাবাহিনীর গোয়েন্দা সংস্থাকে দায়িত্ব দিয়েছে। ঐ এলাকা খুবই উত্তপ্ত, কখন কি ঘটে যায় তা আল্লাহ জানেন। সেনা অফিসারগণ ধারণা করছে, দু'জন প্রহরী যেহেতু মুসলমান ছিল, ঐ প্রহরীর সাথে কোন মুসলিম জঙ্গী গ্রুপের সাথে গোপন আঁতাত আছে। আর এদের দ্বারাই চরম ক্ষতিসাধন করা সম্ভব হয়েছে।

বৃদ্ধ আরো বললেন, সকাল আটটার মধ্যে খবর ছড়িয়ে পড়লে কয়েকশ' বলসেভিক ফৌজ উক্ত ক্যাম্পের দিকে ছুটে আসে। সাথে নিয়ে আসে বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র, রসদ সামগ্রী, ডাক্তার টিম, এম্বুলেন্স, সাজোয়া যান। ওরা গ্রামগুলো ক্র্যাকডাউন লাগিয়ে তল্লাশি দিতে পারে। পরপর দু'টি দুর্ঘটনা ঘটেছে বিধায় তারা খুবই উদ্বিগ্ন। বৃদ্ধ লোকটি কথাগুলো বলে চলে গেল। ছায়েমাও কক্ষে বসে কথাগুলো শুনছিল। এদের বিরুদ্ধে পাল্টা আক্রমণের প্রস্তুতি নিয়ে ভাবছে সে। হামলার পথ খুঁজছে ছায়েমা।

[পনের]

ধূলি উড়িয়ে, ঘন্টি বাজিয়ে, উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলছে আমার পাগলা ঘোড়া। গিরি কান্তার পাড়ি দিয়ে চলছি আলমাআতার সন্ধানে। বিশ্রাম নেই, বিরতি নেই। নেই ক্লান্তির ছোঁয়া। পথে নামায ও হাল্কা টিফিন করতে একটু সময় খরচ হচ্ছে। আমার নামায ও টিফিনের ফাঁকে ঘোড়াটিও কিছু ঘাস-পানি খেয়ে নিচ্ছে।

দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে সন্ধ্যার সামান্য একটু আগেই আলমাআতা এসে পৌঁছলাম। অশ্বের পদধ্বনি ও ঘন্টাধ্বনিতে সেনাবাহিনীর জওয়ানরা অধীর আগ্রহে পথের দিকে তাকিয়ে দেখছে। আমি অশ্ব থেকে অবতরণ করে উচ্চ আওয়াজে গুড আফটারনুন বলে সম্মান প্রদর্শন করলাম।

আমি বললাম, হে আমার বলসেভিক ভায়েরা! আমি অতি সংগোপনে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখে আসলাম। সব এলাকায়ই আমাদের তরুণ-যুবকরা ও লাল বাহিনীর সদস্যরা প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করছে। তবে কিছু স্থানে মৌলবাদী বা রুহানিরা অস্ত্রবলে বলিয়ান হয়ে আমাদের সঙ্গী-সাথীদের উপর আক্রমণ করছে। বুকভরা আশা নিয়ে দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে আমি বাসকাউন্ড বন্দী শিবিরে গিয়েছিলাম, দু'চারজন মৌলবাদী বা রুহানীকে জবাই করে অন্তরকে সান্ত্বনা দেব এই আশায়।

আমার আশা সম্পূর্ণই ব্যর্থ হল। সেখানে গিয়ে দেখি, নেই কোন বন্দী, নেই আমাদের বলসেভিক জোয়ান। ভেবেছিলাম, কোন মুজাহিদ জঙ্গী গ্রুপ সেখানে আক্রমণ করে বন্দীদেরকে ছিনিয়ে নিয়েছে আর সৈন্যদেরকে হত্যা করেছে। আসলে আমার ধারণাটা একেবারেই ভিত্তিহীন। পল্লীর ঘরে ঘরে অনুসন্ধান করেছি। কেউ গোলাগুলীর কোন আওয়াজ পায়নি। পালিয়ে যেতেও দেখেনি কাউকে। ধারণা করা হচ্ছে, সেখানে পাহারারত সৈন্যরাই হয়ত মৌলবাদে বিশ্বাসী ছিল। রাতের আঁধারে বন্দীদের মুক্ত করে ওরাও জীবন নিয়ে পালিয়েছে। সেখানে মুজাহিদরা আক্রমণ করে ছহি-ছালামতে ফিরে আসবে এমনটি ধারণা করা ঠিক নয়। কারণ, তথাকার জনসাধারণ মৌলবাদে বিশ্বাসী নয়, ওরা মনে-প্রাণে কমিউনিজমে বিশ্বাসী।

আমার কথা শুনে সেনা অফিসার বললেন, হে যুবক! তোমার বয়সই বা কত? আর ধারণাই বা কতটুকু সত্য? আমাদের সেনানায়ক মিস্টার মার্শাল বোদায়েভ তিন হাজার পঁচিশজন সৈন্যের বিশাল এক বাহিনী রণসাজে সজ্জিত করে অরণ্যভূমিতে আক্রমণের উদ্দেশ্যে গিয়েছিলেন। অত্যন্ত দুঃখ ও পরিতাপের বিষয়, আজ দুপুরে সেনাপতিসহ ত্রিশজনের মরদেহ ক্যাম্পে ফিরে এসেছে। ধারণা করা হচ্ছে যে, বিষধর ফণিনীর ছোবলে দংশিত হয়ে তারা ইহকাল ত্যাগ করেছে। লাশগুলো ময়না তদন্তের জন্য সিএমএম হাসপাতালের মর্গে পাঠান হয়েছে। এ মর্মান্তিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে দেশব্যাপী সেনাবাহিনীর মধ্যে আতংক বিরাজ করছে। দুঃখের বিষয়, এ পর্যন্ত জঙ্গী মুজাহিদ গ্রুপের কোন সদস্যকেই গ্রেফতার বা হত্যা করা সম্ভব হয়নি।

জেনারেলের কথা শুনে আমি দুঃখ প্রকাশ করলাম। মাগরিবের সময় গড়িয়ে যাচ্ছে, এখনো নামাযের সুযোগ করতে পারিনি। প্রকাশ্যে নামায পড়া তো আদৌ সম্ভব নয়। তাই সবিনয় নিবেদন জানালাম, স্যার! ঐ মহল্লায় আমার একজন বন্ধু আছে, ওর সাথে সাক্ষাৎ করতে যাব, যদি আপনার মর্জি হয়। জেনারেল রাজি হলেন এবং বললেন, জলদি ফিরে এস।

নামায আদায়ের জন্য ছুটে চললাম চাচার বাসায়। চাচা আমাকে দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। আমি অজু করে নামাযে দাঁড়িয়ে গেলাম। নামায পড়তে পড়তে খানাপিনা হাজির। খানা সেরে চাচাকে কারগুজারী শুনালাম। চাচা খুশিতে আত্মহারা। তিনি আমাকে অনেক দোয়া ও সাহস দিলেন। তারপর বিদায় নিতে চাইলে অসন্তোষ প্রকাশ করলেন। আমি অনুনয়-বিনয় করে বললাম, চাচাজান, ক্যাম্পে তোমাকে যেতেই হবে। মেজর সাহেবরা আমার অপেক্ষায় থাকবেন। চাচা অবুঝ নন। তিনি আমার মাথায় হাত বুলিয়ে বিদায় দিলেন।

আমি দ্রুত ক্যাম্পে এসে হাজির হলাম। আমাকে দেখে মেজর সাহেব বললেন, "পার্শ্ববর্তী মহল্লা থেকে দশ-বারজন সুন্দরী মেয়েকে ধরে নিয়ে এস, আজ রাতে ফুর্তি করব। অবশ্যই মৌলবাদীদের সন্তান হতে হবে। তোমার সাহায্যে সাত-আটজন সিপাহী দিচ্ছি।"

ওদের পৈশাচিক মনোভাব দেখে আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত

বিদ্যুদ্বেগে রক্ত সঞ্চালন আরম্ভ হয়ে গেল। আমি বললাম, "আমি ওসব মহল্লা সবেমাত্র ঘুরে এসেছি। এলাকার পরিস্থিতি মোটেই অনুকূল নয়।"

জেনারেল শিউরে ওঠে জিজ্ঞেস করলেন, "কোন দুঃসংবাদ নিয়ে আসনি তো?"

আমি বললাম, "স্যার! আমি আমার যে বন্ধুর বাড়ী গিয়েছিলাম, সেখান থেকে আভাস পেয়েছি, কিছু অপরিচিত লোক এলাকায় ঘোরাফেরা করছে। সবাই ধারণা করছে, লোকগুলো সশস্ত্র এবং মুজাহিদ হতে পারে। পুরো এলাকায় এক আতংক বিরাজ করছে। রাতটাও বেজায় অন্ধকার, কখন কোন্ দিক থেকে আক্রমণ হয় কে জানে। অন্যথায় এলাকা থেকে দশ-বারজন সুন্দরী আনা কোন ব্যাপার নয়। সবাই আপনাদের মনোরঞ্জনের জন্য নিজ কন্যাদেরকে দিতে কার্পণ্যের পরিচয় দেবে না। এখন আপনারা গভীরভাবে চিন্তা করুন। যা হুকুম করবেন, আমার পালন করতে দেরি হবে না।

জেনারেল ভয় পেয়ে গিয়ে বললেন, "ঠিক আছে, আজ তাহলে থাক, পরে দেখা যাবে।"

আমার কথা শুনে জেনারেলদের মাথা ঊনপঞ্চাশ। সাথে সাথে জরুরীভিত্তিতে জেনারেলদের পরামর্শ সভা ডাকলেন। উপস্থিত জেনারেল সদস্যগণকে উদ্দেশ্য করে ভারপ্রাপ্ত সেনাপতি বললেন, হে আমার অনুগত সামরিক অফিসারবৃন্দ! আজ সারাদেশে চলছে রূহানীদের দৌরাত্ম্য। আমাদের সৈন্যরা অকাতরে প্রাণ হারাচ্ছে। আমি বিশেষ সূত্রে জানতে পারলাম, এ এলাকা মুজাহিদদের পদচারণায় ভারী হয়ে উঠছে। এমনকি তারা এ ছাউনীতে আক্রমণ চালানোর পরিকল্পনাও নিয়েছে। আশু বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য কী পদক্ষেপ নেয়া যায় পরামর্শ দিন।

একজন জেনারেল দাঁড়িয়ে বলল, স্যার! দু'হাজার সৈন্যের মধ্য থেকে কমপক্ষে ত্রিশজন সৈন্য বাছাই করে পাহাদারীর ব্যবস্থ করা হোক। নিরাপত্তা জোরদার না হলে এখানে অবস্থান করা মুশকিল হয়ে যাবে মনে হচ্ছে। ত্রিশজনের মধ্যে দশজন থাকবে উত্তরের রাস্তায়। অবস্থান নেবে অর্ধ কিলোমিটার দূরে প্রাইমারী স্কুলে। আরো দশজন দক্ষিণ দিকে আধা কিলোমিটার দূরে রাস্তার পার্শ্বে গোরস্তানে লাশ রাখার

উন্মুক্ত ঘরে। বাকী দশজন ছাউনীর আশপাশে। পূর্ব-পশ্চিমে পাহারাদারীর প্রয়োজন নেই। কারণ, ঐ দু'দিক থেকে আক্রমণ আসার সম্ভাবনা নেই।

ভারপ্রাপ্ত সেনা প্রধান উক্ত জেনারেল অফিসারের পরামর্শ সাদরে গ্রহণ করলেন। তিনি ত্রিশজন সুদক্ষ সৈনিককে বাছাই করে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হওয়ার নির্দেশ দিলেন। সবাই রণসাজে সজ্জিত হতে লাগল। একটু পরেই অভিযানে বেরিয়ে যাবে। কেউ খানাপিনা তৈরির ব্যস্ত কাজে, কেউ অস্ত্র মুছতে ব্যস্ত। কেউ ম্যাগজিনে গুলী ঢুকাচ্ছে, কেউবা পিটু ব্যাল্ট কমরবন্দ কষছে। একেকজন একেক কাজে ব্যস্ত।

এ অবসরে আমি অদূরের একটি ফার্মেসী থেকে একশ' পাওয়ারের পঞ্চাশটি ঘুমের ট্যাবলেট এনে খুব গোপনে গুড়ো করে নিলাম। তারপর এক কেটলি মদের মধ্যে পাউডারগুলো ভালভাবে মিশিয়ে নিলাম। খানার শেষে সকল পাহাদারকে এক গ্লাস করে মদ পান করতে দিলাম। ওরা মনের আনন্দে কাড়াকাড়ি করে মদপান করে নিজ নিজ দায়িত্বে বেরিয়ে গেল। অন্যরাও প্রায় অর্ধগ্লাস করে পঞ্চাশ−ষাটজনে পান করে যার যার তাঁবু, মোর্চা, বাংকার বা মাদ্রাসার বিভিন্ন কামরায় গিয়ে শুয়ে পড়ল।

জামিউল উলুমের নীচ তলায় অফিস সংলগ্ন একটি রুমে আব্বু থাকতেন। আমি গিয়ে ঐ রুমে শোয়ার ব্যবস্থা করলাম। নেই কোন বিছানাপত্র, নেই আগের সেই সুরত। খানিকটা ঝেড়ে পুরাতন চট বিছিয়ে শুয়ে পড়লাম। অনেক চেষ্টা করেও চোখে ঘুম আনতে পারলাম না। অতীতের স্মৃতি-বিজড়িত কত কথাই না হৃদয় আঙ্গিনায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। একসময় এ মাদ্রাসায়ই অধ্যয়ন করেছিলাম। হেফজখানা, মক্তব, ক্লাসরুম, অফিস, কুতুবখানা ও মাতবাখ সবই আছে, নেই শুধু সেই লোকজন এবং কোলাহল। রাশি রাশি কিতাব আর কুরআন শরীফ জ্বালিয়ে দিয়েছে কাফির, বেঈমান ও খোদাদ্রোহীরা। এটা তো সেই রুম, সেখানে জীবনের বহুদিন কাটিয়েছি, আব্বুর বাহুবন্ধনে অনেক রাত কাটিয়েছি। হেফজখানা ছুটি হলেই আব্বুর রুমে এসে না খেয়েই ঘুমিয়ে পড়েছি। আব্বু ঘুম থেকে জাগিয়ে খানা খাওয়াতেন প্রায় সময়। আজ সবই স্মৃতি। আব্বু নেই, নেই ছাত্র, ওস্তাদ। এ সমস্ত বেদনাদয়ক

কথাগুলো বারবারই শিউলীর মতো হৃদয় সরোবরে ভেবে উঠছে। বাঁধনহীন ঝর্নার মতো বয়ে চলেছে অশ্রুধারা। অঘুম নয়নে জেগে আছি আমি একা।

রাত বারটা পার হয়ে যাচ্ছে। ওদের খবরাখবর নেয়া দরকার। তাই রুম থেকে বের হওয়ার চেষ্টা করলাম। কিন্তু দরজা খুলছে না যে! এখন আর বুঝতে বাকি নেই, ওরা আমাকে সন্দেহ করে বাইরে তালা লাগিয়ে দিয়েছে। কিন্তু আমাকে যে বেরুতেই হবে। অনেক চিন্তার পর মাথায় একটি বুদ্ধি আসল । এই রুমের সাথেই আছে বাথরুম। বাথরুমের একটি দরজা রুমের দিকে, অপর দরজা বাইরে টিউবওয়েলের দিকে। ছাত্ররা সোজাসুজি যাওয়ার জন্য এই দরজা খুলে টিউবওয়েলের পানি আনত। আমি প্রথমে বাথরুমে গিয়ে অপর দরজার ছিটকিনি খুলে একটু ধাক্কা দিতেই খুলে যায়। বাইরে এসে আল্লাহর শোকর আদায় করলাম।

দু'পা এগিয়ে দেখি, পাহারারত সমস্ত সৈন্য নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে। আমি কালবিলম্ব না করে ছুটে গেলাম এক সৈন্যের নিকট। একটু নাড়া দিলাম। ক্ষীণ আওয়াজে ডাকলাম। কিন্তু কোন সাড়া-শব্দ পেলাম না। ওর কোমর থেকে খঞ্জরটি খুলে নিলাম। পরখ করে খঞ্জরের শাণ দেখে নিলাম। শতাধিক জবাই করলেও ধার ক্ষয় হওয়ার নয়। আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করে প্রত্যেকের গলায় খঞ্জর চালিয়ে মাথা গর্দান থেকে আলাদা করে ফেললাম। এক এক করে নয়জনের জবাইর কাজ সমাধা করে হাবিলদারের হাতে ও শরীরে কিছু রক্ত ছিটিয়ে দিলাম। তারপর দ্রুতগতিতে ছুটে গেলাম উত্তরদিকের স্কুলে ও দক্ষিণের গোরস্তানে। সেখানে গিয়েও দেখি ঘুমের সাগরে হারিয়ে গেছে হতভাগা সৈনিকরা। উভয় স্থানে সবাইকে জবাই করে ফিরে এলাম ছাউনীতে। খঞ্জরটি হাবিলদারের হাতে ধরিয়ে দিয়ে আমার পরনের জামা-কাপড় খুলে উনুনে নিক্ষেপ করে জ্বালিয়ে ভস্ম করে দিলাম। তারপর হাত-পা ধুয়ে দরজা বন্ধ করে পূর্বের মতো শুয়ে পড়লাম।

রাত আর বেশী বাকি নেই। একটু পরেই হয়ত ভোর হয়ে যাবে। ঘুম আর হল না। হঠাৎ পাশের রুমে দরজা খোলার আওয়াজ পেলাম। আমি সাথে সাথে জানালার ছিদ্রপথে তাকিয়ে দেখি, তিনজন সৈন্য

মাঠের এক কোণে কুকুরের মতো দাঁড়িয়ে পেশাব করছে। তারপর এদিক-ওদিক হাঁটতে লাগল। জবাইকৃত লাশের দৃশ্য দেখে সবাই ভয় পেয়ে গেল। কারো মুখে কোন ভাষা নেই। সবাই ভয়ে জড়সড়। একজন বলল, "সাবধান! এ ব্যাপারে তোমরা মুখ খুলো না। আমরাও কিছু বিলম্বে রুম থেকে বের হব।" এ বলে সবাই দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ল। আমিও অযু করে তাহাজ্জুদ পড়ে নিঃশব্দে তিলাওয়াত করতে লাগলাম।

রাত শেষে ফজর পড়ে দরজা খোলার অপেক্ষায় বসে রইলাম। সকাল সাতটা। দু'একজন করে জাগতে লাগল। একজন লাশের দৃশ্য দেখে ডাকাডাকি আরম্ভ করে দিয়েছে। হায় হায়! কি সর্বনাশ! সবাইকে জবাই করে দিয়েছে! সৈন্যদের ঘুমের চাহিদা এখনো মেটেনি। তবু জোর করে উঠতে হল। মেজর, জেনারেল, হাবিলদার, সুবেদার ও সাধারণ সিপাইগণ এ মর্মান্তিক দৃশ্য ঘুরে ঘুরে দেখছে।

একজন মেজর নিজ হাতে তালা খুলে আমাকে ডাকতে লাগল। আমি সবই শুনছি। তবু ঘুমের ভান ধরে শুয়ে আছি। অবশেষে মেজর নিজেই নাড়াচাড়া দিয়ে আমাকে জাগাল। আমি শোয়া থেকে উঠে বসে জিজ্ঞেস করলাম, স্যার! এত শোরগোল শোনা যাচ্ছে কিসের? মেজর উত্তরে বললেন– সর্বনাশ হয়ে গেছে!

কি সর্বনাশ হয়েছে– জিজ্ঞেস করলে স্যার বললেন– মুজাহিদরা সব পাহাদারকে জবাই করে ফেলেছে ।

মেজরের কথায় আমি খুব হা-হুতাশ করে সমবেদনা প্রকাশ করতে লাগলাম। একটু হাঁটাহাঁটি করে হাবিলদারের নিকট গেলাম। সেখানে গিয়েই ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে ডেকে বললাম, স্যার! হাবিলদার সাহেব মরেননি! সাথে সাথে সৈন্যরা হাবিলদারের নিকট ছুটে এসে দেখে, হালিদার খঞ্জর হাতে রক্তাক্ত শরীরে শুয়ে আছে। একজন বলল,"এ হাবিলদারই ঘাতক, মদপান করে মাতাল হয়ে এ কাণ্ড ঘটিয়েছে। এখানে মুজাহিদরা ঢোকার সাহস পাবে না। সারারাত এ কাণ্ড ঘটিয়ে কসাই এখন ক্লান্ত হয়ে ঘুমাচ্ছে।"

মেজর দু'জনকে দু'টি ঘোড়া দিয়ে রাস্তার পাহারাদারদের খোঁজ নিতে প্রেরণ করেন বেশ কিছুক্ষণ আগেই। এরা সবাই ফিরে এসে বলল,

হায় হায়! ওখানেও একই কাণ্ড ঘটেছে। সকলের বিবেচনায় সুবেদারই এদের ঘাতক হিসেবে চিহ্নিত হল। ভারপ্রাপ্ত সেনাপতি লাশগুলো ময়না তদন্তের জন্য সামরিক হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়ে দিল । সুবেদারকে গ্রেফতার করা হল।

এ সংবাদ দাবানলের মতো সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। বলসেভিকদের উপর কোন ধরনের আক্রমণ আসুক তা দেশবাসী মেনে নিতে পারে না। দেশের প্রায় বার আনা জনতাই কমিউনিস্ট বিপ্লবের পক্ষে। চার আনা মুসলমান যদিও বিপক্ষে, কিন্তু তারা খুবই দুর্বল। কিছু করা তো দূরের কথা, তারা মুখও খুলতে পারে না। লাল ফৌজ সবার কাছেই সমাদৃত।

এ মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় শুধু যে সেনাবাহিনী মর্মাহত, তা নয়, পুরো কাজাকিস্তানে প্রভাব পড়বে। কাজেই এর প্রতিশোধ নিতে হবে কঠোর হস্তে। এ কথাগুলো বলছিলেন, ভারপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তা। শহরের অলিগলি ও রাজপথে নেমে এল জনতার ঢল। সবাই হাসপাতাল অভিমুখে ছুটে চলছে। কমিউনিস্ট জওয়ানরা বিক্ষোভে ফেটে পড়ছে। এরা গগনবিদারী শ্লোগান দিচ্ছে- মৌলবাদ নিপাত যাক, বলসেভিক দিচ্ছে ডাক। দুনিয়ার মজলুম এক হও। দুনিয়ার মজদুর এক হও। রুহানীরা ধ্বংস হোক। ইত্যাদি শ্লোগানে শহর প্রকম্পিত। শহরের অবস্থা দেখে মনে হল কমিউনিস্টরা বড় ধরনের কোন হাঙ্গামার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আমি অবস্থা বেগতিক দেখে আল্লাহর কাছে দোয়া করতে লাগলাম।

[ষোল]

আমীর সাহেব আহত। তেমন একটা নড়াচড়া করতে পারেন না। জেনারেল জাফর ভাই একা একা নৌকা বেয়ে চলছে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে। একদিকে হাফেজা ছায়েমা মালাকানী ও খোবায়েব জামবুলীর চিন্তা, অন্যদিকে মুসলমানদের নির্যাতনের করুণ চিত্র বারবারই ভেসে উঠছে হৃদয়ের দর্পনে। সব মিলিয়ে অসহনীয় যন্ত্রণায় ছটফট করছিলেন জাফর ভাই।

একটানা কয়েক ঘন্টা দাঁড় টেনে লোকালয় পেরিয়ে গভীর অরণ্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন। সাঝ সকালে সামান্য নাস্তা খেয়েছিলেন। দুপুর গড়িয়ে যাচ্ছে। এর মধ্যে কোন দানাপানি পেটে

পড়েনি। যোহরের নামাযও আদায় করতে হবে। আমীর সাহেব জেনারেল জাফরকে ডেকে নৌকা নোঙর করতে বললেন। জাফর ভাই বড় একটা বৃক্ষের নীচে নোঙর ফেললেন। তারপর জাফর ভাই আমীর সাহেবের অযু-গোছলের ব্যবস্থা করে নিজেও অযু-গোছল সেরে নিলেন। অতপর নামায আদায় করে জাফর ভাই খানার ব্যবস্থা করতে লাগলেন। নিজ হাতে তারকারী কেটে, বন হতে শুকনো কাঠ সংগ্রহ করে খানা পাকালেন। অতপর উভয়ে একসাথে আহারাদি সেরে কায়লুলা করছেন।

দীর্ঘ পথ অতিক্রম করায় শরীর ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত। তাই শোয়ার সাথে সাথেই উভয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। গুলীভরা এলএমজি বুকে জড়িয়ে উভয়েই ঘুমাচ্ছেন। একজন সৈনিকের সবচেয়ে প্রিয় বস্তু অস্ত্র। স্ত্রী-সন্তান দূরে রাখতে পারেন, কিন্তু মুজাহিদ তার অস্ত্র ক্ষণিকের জন্যও তার থেকে আলাদা করতে রাজি নয়। কারণ, যে কোন মুহূর্তে দুশমনের আক্রমণ আসতে পারে। তাই সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হয়। আর এটা আমীরুল মুজাহেদীন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সুন্নতও বটে। আমাদের প্রিয়নবী (সাঃ)-এর হাতে অস্ত্র আসলে তিনি স্বস্নেহে চুমু খেতেন। মিম্বরে দাঁড়িয়ে অস্ত্র হাতে নিয়ে খুতবা দিতেন। এমনকি ফরয নামায আদায় করার সময়ও অস্ত্র দূরে রাখতেন না, রাখতেন সামনে । ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) অস্ত্রকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। মাথায় তেল ছিল না, পরনে কাপড় ছিল না, পেটে ভাত ছিল না, মাথা গোঁজার ঠাঁই ছিল না, কিন্তু অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত থাকতেন।

সাহাবাগণ বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র ব্যবহার করতেন। যেমন- তীর, ধনুক, বর্শা, ঢাল, তলোয়ার, খঞ্জর, ছোরা, যেরা, শীরস্ত্রাণ, মিনজানিক (পাথর নিক্ষেপণযন্ত্র) ও ঘোড়া। একজন পথিক সাহাবা রাস্তায় চলছেন, তার কটিদেশেও তলোয়ার শোভা পাচ্ছে। একজন রাখাল সাহাবা পাহাড়ের পাদদেশে মেষ ছড়াচ্ছেন, তাকেও তলোয়ারমুক্ত দেখা যায়নি। সেদিন সারা দুনিয়া প্রত্যেক সাহাবাকে একজন যোদ্ধা হিসেবে প্রত্যক্ষ করেছে।

আজ মুসলমানরা অস্ত্র ত্যাগ করেছে। অস্ত্র রাখাকে আজ সন্ত্রাস হিসেবে গণ্য করা হয়। হাইজাকার বলে আখ্যায়িত করা হয়। নিজেরা

হয় মজলুম, তবু প্রতিশোধ নেয়ার কোন ফিকির নেই। তাই সমস্ত তাগুতি শক্তি এক হয়ে শুধু মুসলমানকে জবাই-ই করছে, মুসলিম মা-বোনদের ইজ্জতও হরণ করছে।

এতক্ষণে সূর্যটা পশ্চিমাকাশে অনেকটা হেলে পড়েছে। অল্পক্ষণ পরেই নেমে আসবে ঘোর অন্ধকার। আমীর সাহেব ঘুম থেকে জেগে জাফর ভাইকে জাগিয়ে দিলেন। তারা তাড়াতাড়ি অযু সেরে আছরের নামায পড়ে নিলেন। আমীর সাহেব জায়নামাযে বসেই পরামর্শ চাইলেন। জাফর ভাই বললেন, "এখানে অনেক সময় অবস্থান করছি, আর বেশী সময় থাকা ঠিক হবে না। এখান থেকে লোকালয় বেশি দূরে নয়। কাঠুরিয়ারা এ পর্যন্ত কাঠ সংগ্রহের জন্য আসে তার অনেক আলামাত পাওয়া গেছে। তারা দেখে ফেললে রক্ষা নেই। সাথে সাথে সংবাদ পৌছিয়ে দেবে লাল ফৌজদের ক্যাম্পে। ওরা এসে অতর্কিতে আক্রমণ করে বসবে আমাদের উপর। তাছাড়া খোবায়েব ছায়েমাকে নিয়ে এসে আমাদের খুঁজবে। না পেয়ে কোথায় জানি হারিয়ে যায়। আবার অনেক দূরে গেলেও ওরা সমস্যায় পড়বে।"

জাফর ভাইয়ের কথা শুনে আমীর সাহেব খানিকটা নীরব থেকে মাথা তুলে বললেন, "এখানেই আমরা রাত্রি যাপন করব। আল্লাহ নিশ্চয়ই আমাদের হেফাজত করবেন। এখান থেকে অন্যত্র চলে গেলে খোবায়েব বিপদে পড়ার আশংকা আছে।" মাগরিবের নামাযের সময় হলে উভয়ে নামায আদায় করলেন। আমীর সাহেব ছাপ্পরে বসে পাহারা দিচ্ছেন আর জাফর ভাই নৈশভোজের আয়োজন করছেন।

রান্না শেষ হতে না হতেই এক বিকট আওয়াজে বন-জঙ্গল প্রকম্পিত হয়ে উঠল। এতে সামান্য ভূকম্পনও অনুভূত হল। এটা কিসের শব্দ তাৎক্ষণিকভাবে অনুধাবণ করা সম্ভব হল না। আমীর সাহেব ধারণা করলেন, মর্টার, মাইন বা রকেটলাঞ্চারের আওয়াজ হতে পারে। তাছাড়া বোমা বিস্ফোরণের আওয়াজও অনেকটা এ ধরনের হয়ে থাকে। জাফর ভাইও এ ধরনের একটি কিছু মনে করছেন।

জাফর ভাই রান্না ফেলে দৌড়িয়ে আমীর সাহেবের নিকট আসলেন। কিসের আওয়াজ এ ব্যাপারে উভয়ে মতবিনিময় করছিলেন। চার-পাঁচ মিনিট অতিবাহিত হতে না হতেই রাশিয়ান মিগ-৫৬ গুপ্ত

বোমারু বিমান গাছপালার উপর দিয়ে চক্কর দিতে লাগল। হঠাৎ সামান্য দূরে আরো একটি বোমা বিস্ফোরণের শব্দ হল। মনে হল, যেন প্রথম আসমানটি প্রচণ্ড আঘাতে টুকরো টুকরো হয়ে জমিনে পতিত হয়েছে।

আমীর সাহেবের বুঝতে বাকি রইল না যে, আমাদের অবস্থান দুশমনরা জেনে ফেলেছে। তাই গুপ্ত বিমান পাঠিয়েছে। ওরা আমাদের ধ্বংস সাধন করতে চাচ্ছে। আমীর সাহেব জাফর ভাইকে হুকুম দিলেন, এন্টি্র এয়ারক্রাফট গানটি বড় বৃক্ষটির নীচে স্থাপন করতে। হুকুম পাওয়ার সাথে সাথে জাফর ভাই বিমান বিধ্বংসী গানটি ফিট করলেন সুন্দরভাবে।

আমীর সাহেব খুব কষ্ট করে নৌকা থেকে নেমে বৃক্ষের নীচে গিয়ে গানটি চেক করলেন। বেরেলটি দক্ষিণের দিকে দিয়ে গোলাভর্তি করে শিকারের অপেক্ষায় বসে রইলেন। একটু পরে জাফর ভাই আমীর সাহেবকে বললেন, চোরা বিমানটি খুব আস্তে আস্তে এদিকে অগ্রসর হচ্ছে বলে মনে হল। বিমানটির শব্দ নেই বললেই চলে। হঠাৎ আলো প্রকাশ পেল। আমীর সাহেব ট্রিগারে শাহাদাত আঙ্গুলি রেখে অপেক্ষা করছেন। আনুমানিক রেঞ্জের ভেতরে আসার সাথে সাথে তিনি উচ্চারণ করলেন, ওমা রামাইতা ইয রামাইতা অলাকিন্নাল্লাহা রামা। সাথে সাথে ট্রিগার টেনে ফায়ার করে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে একঝাঁক গুলী ছিদ্রপথে বেরিয়ে গেল। বিকট আওয়াজে বন-বাদার প্রকম্পিত হল। আগুন লেগে গেল পুরো বিমানটিতে। দু'জন পাইলটসহ হুমড়ি খেয়ে গাছপালার ডালপালা ভেঙ্গে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে জমিতে পতিত হল।

জাফর ভাই আল্লাহু আকবার ধ্বনি দিয়ে ছুটে গেলেন বিধ্বস্ত বিমানের দিকে। আগুনের প্রচণ্ড গরমে নিকটে যেতে ব্যর্থ হন। আগুনের তাপে সংরক্ষিত বোমাগুলোয় বিস্ফোরণ ঘটে যায়। বিরাট এলাকার গাছপালা পুড়ে ছারখার হয়ে গেল এক মুহূর্তে। বিকট আওয়াজে বন্যপশুরা প্রাণপণ ছুটে পালাচ্ছে দিগ্বিদিক। পুরো এলাকা দিনের মতো আলোকিত হয়ে গেল। আমীর সাহেব ও জাফর ভাই অপেক্ষাকৃত দূরে ও বৃক্ষের আড়ালে থাকার কারণে আল্লাহ তাদের হেফাজত করেছেন। তা না হলে এখানেই তাদের জীবনের অবসান ঘটত।

আমীর সাহেব জাফর ভাইকে ডেকে বললেন, ছামানাপত্র জলদী

নৌকায় তোল। এখানে এক মুহূর্তও দেরী করা ঠিক হবে না। পালাও, জলদি পালাও। আমীর সাহেবের কথামত জাফর ভাই খুব তাড়াতাড়ি ছামানাপত্র নৌকায় তুলে দাঁড় টানতে আরম্ভ করলেন। একা একা দাঁড় টানা খুবই কষ্টকর, তবুও টানতে হয়। আমীর সাহেব কোন মতে কাণ্ডারীর দায়িত্ব পালন করে চলছেন।

রাত প্রায় একটা। এতক্ষণে নৌকা অনেক ভিতরে নিয়ে এলেন। এখানে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা তেমন নেই। আমীর সাহেব নৌকা তটে ভিড়িয়ে নোঙর ফেললেন। পেটে ক্ষুধার অনল দাউ দাউ করে জ্বলছে। সন্ধ্যার পর থেকে এ পর্যন্ত কিছু খাওয়া হয়নি। তাই উভয়ে একসাথে খেয়ে কোমরটা একটু সোজা করলেন। তারপর সকলেই আল্লাহর উপর ভরসা করে ঘুমিয়ে পড়লেন।

সুবহে সাদেক ঘনিয়ে এল। বন মোরগের ডাক শেষ রজনীর নীরবতা ভঙ্গ করছে। আমীর সাহেব ও জাফর ভাই ঘুম থেকে জেগে ফজরের নামায আদায় করলেন। তারপর চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে দু'হাত প্রসারণ করলেন আকাশের দিকে। প্রার্থনা করলেন– 'হে আমাদের পরওয়ারদেগার! হে গাফ্ফার! আমাদের ক্ষমা কর। তুমি আমাদেরকে পদে পদে নুসরত করেছ, সামনেও করবে বলে আশা রাখি। হে আল্লাহ! আমরা ইসলামকে বিজিত হিসেবে দেখতে চাই। অতএব তুমি ইসলামের বিজয় দান কর। হে আল্লাহ! আমাদের জান-মাল ও সময় তোমার রাস্তায় খরচ করার তাওফীক দাও। হে আল্লাহ! অসহায় হাফেজ খোবায়েব জামবুলী ও হাফেজা ছায়েমা মালাকানীকে আমাদের মাঝে ফিরিয়ে দাও। আমীন, আমীন, আমীন।"

দোয়া শেষে জাফর ভাই নাস্তা তৈরী করে দু'জনে খেলেন। আমীর সাহেব জাফর ভাইকে পাহারাদারীর নির্দেশ দেন। জাফর ভাই ক্লাশিনকভ হাতে নিয়ে পাহারা দিচ্ছেন আর আমীর সাহেব শুয়ে বিশ্রাম নিচ্ছেন।

[সতের]

'আমি তিন দিন সেনা ছাউনীতে কাটিয়ে দিলাম। কিভাবে ওদের থেকে বিদায় নেব সে ফন্দি আঁটছিলাম। একদিন গভীর রাত। একাকী শুয়ে আছি। ঘুম আসছে না। খানাপিনা, আরাম-আয়েশ ও নিদ্রা কে যেন

হরণ করে নিয়ে গেছে। ছায়েমাকে রেখে এলাম কত দূরে। সে তো কেঁদে কেঁদে উড়না ভিজাচ্ছে প্রতিদিন। এদিকে হতভাগিনী আম্মুর চিন্তায় দুনিয়ার সবকিছু ভুলে গেছি। তিনি দিন-রাত পথপানে চেয়ে চেয়ে তিলে তিলে ক্ষয় হচ্ছেন। কখন যে আম্মুর কাছে আব্বুর শাহাদাতের খবর নিয়ে যেতে পারব, তা একমাত্র আল্লাহই ভাল জানেন। তাছাড়া আমীর সাহেব ও জাফর ভাই কোথায় কিভাবে সময় কাটাচ্ছেন কে জানে। তারাও তো আমার জন্য খুব চিন্তা করছেন।

একদিন এক সেনা অফিসার আমাকে ডেকে জিজ্ঞেস করল, তুমি কি কখনো ওই বনে গিয়েছ?

আমি উত্তর দিলাম, স্যার, অরণ্যে বসবাস করে বাঘ, হাতি, হরিণ, ভাল্লুক, সিংহ ও বিষধর সাপ আর নাম না-জানা হিংস্র প্রাণী। ওখানে গেলে তো তাদের খোরাক হতে হবে। সেখানে যাওয়ার প্রয়োজনও হয়নি কোনদিন। তবে দু'একবার গিয়েছি গোয়েন্দাগিরির উদ্দেশ্যে। তাও গভীরে প্রবেশ করার সাহস পাইনি।

তিনি আবার প্রশ্ন করলেন, কোন কাঠুরিয়াকে কি ওখানে কাঠ কাটতে দেখেছ?

আমি বললাম, হ্যাঁ স্যার, কিছু দুঃসাহসী কাঠুরিয়া আছে, তারা মাঝে-মধ্যে দলবদ্ধভাবে গভীর অরণ্যে কাঠ কাটতে যায়। তবে বাঘ-ভাল্লুকের এলাকায় নয়।

সেনা অফিসার আমাকে বললেন, গতকাল কয়েকজন কাঠুরিয়া এসে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট বলেছে, ওরা জঙ্গলের মধ্যে দু'জন সশস্ত্র মুজাহিদকে ঘুমিয়ে থাকতে আর একটি নৌযান ঘাটে বাঁধা দেখেছে। এ সংবাদ শুনে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তিনজন পাইলটসহ জঙ্গী বিমান মিগ-৫৬ প্রেরণ করেছেন বোম্বিং করে মুজাহিদদের আস্তানা ধ্বংস করার জন্য।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, স্যার! মিগ-৫৬ কি ধরনের বিমান? তিনি উত্তর দিলেন, এটি একটি শক্তিশালী গোয়েন্দা বিমান। কেউ এটাকে চোরা বিমানও বলে, আওয়াজ নেই বললেই চলে। বিমানটি উড়ার বেশ কিছুক্ষণ পর অরণ্যে বিধ্বস্ত হয়ে যায়। বিমানটির কোন অংশই অক্ষত নেই। জ্বলে-পুড়ে ছারখার হয়ে গেছে। মুজাহিদ ঘাঁটির কোন ক্ষয়ক্ষতির সংবাদও পাওয়া যায়নি। বিমানটি নিখোঁজ হলে আরো একটি অনুসন্ধানী

বিমান উড়ান হয়। ওরা আকাশ থেকে দূরবীনের মাধ্যমে বিধ্বস্ত বিমানের ধ্বংসাবশেষের সন্ধান পেয়েছে। তারপর বিমান বাহিনীর কয়েকজন সদস্য অবতরণ করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে রিপোর্ট দেয়, যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে বিমানটি বিধ্বস্ত হয়েছে। তবে একজন ছত্রীসেনা রিপোর্ট দিয়েছে বিমান বিধ্বস্তের সামান্য দূরে একটি বৃক্ষের নিচে ছোট একটি চুলার সন্ধান পাওয়া গেছে। তাতে দু'একজনের রান্না হতে পারে, তার বেশী নয়। এটা যদি মুজাহিদদের ব্যবহৃত চুলা হত, তবে দশ-পনেরজনের রান্না করার মত বড় হত। খুব সম্ভব এটা কাঠুরিয়াদের চুলা।

সেনা অফিসারের কথা শুনে আমি আনন্দে আল্লাহর শোকর আদায় করতে লাগলাম। সঠিক সংবাদ না জানা পর্যন্ত নিশ্চিন্তে থাকা যায় না। কথা শোনার সাথে সাথে আমার অন্তর আমাকে রেখে চলে গেছে অরণ্যভূমিতে জাফর ভাইদের সন্ধানে। অফিসারের কথা বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখলাম, আমার সাথীদের কোন ক্ষতি হয়নি। ছায়েমার সন্ধানে যাওয়ার সময় ওদেরকে আমি আল্লাহর হাতে আমানত রেখে গিয়েছিলাম। আর আল্লাহ আমানতের খেয়ানত করেন না।

জাফর ভাইদের সন্ধানে আমার মন ব্যাকুল হয়ে উঠল। আমি ভারপ্রাপ্ত সেনা অফিসারকে বললাম, স্যার! বাড়ী থেকে এসেছি বেশ ক'দিন হয়ে গেল। আপনার অনুমতি পেলে আমি একটু বাড়ী যাব।

সেনানায়ক আমাকে ছুটি দিলেন। আমি শেষ রাতে উঠে ঘোড়াটিকে ছোলা ও ঘাস-ভূষি খেতে দিলাম। ঘোড়া পেট ভরে ঘাস-পানি খেল। আমিও সকালে নাস্তা খেয়ে সকলের নিকট থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। জেনারেল সাহেব পিছন দিক থেকে ডেকে বললেন, বেশি দেরি করো না কিন্তু। দু'তিন দিনের মধ্যে ফিরে আসবে। তুমি আমাদের অনেক উপকারে আসবে। সকলের নিকট যেতে পার, ফিরতে পার, তাই সব ধরনের সংবাদ সংগ্রহ করা তোমার পক্ষেই সম্ভব। কাজেই বেশি দেরি করো না।

আমি ঘোড়ার পিছনে চাবুকের সামান্য আঘাত করতেই ঘোড়া বিদ্যুদ্গতিতে ছুটে চলল। নদীর আঁকাবাঁকা পথঘাট পেরিয়ে দুপুর বারটার দিকে অরণ্যে এসে পৌছলাম। ঘোড়া থেকে অবতরণ করে

নদীর স্বচ্ছ পানিতে অজু করে কয়েক আজলা পানি পান করলাম। ঘোড়াও পানি পান করে কাঁচা ঘাস খেতে আরম্ভ করল। আমি একটু বিশ্রাম নেয়ার উদ্দেশ্যে বৃক্ষের ছায়ায় বসলাম। সবগুলো চিন্তা আর পেরেশানী একসঙ্গে আক্রান্ত করল আমাকে। এ অবস্থায় আমি ঘুমের কোলে ঢলে পড়লাম।

বেলা দু'টো পার হওয়ার পথে। গাছের শুকনো একটি ডাল ভেঙ্গে পড়তেই আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। তাড়াতাড়ি অজু সেরে নামাজ আদায় করলাম। তারপর আবার নৌকার সন্ধানে ছুটে চললাম। কোথায় যাব স্থির করতে পারছিলাম না। পথহারা পথিকের মত বিজন বনে চলছি। আল্লাহর কাছে দোয়া করলাম, হে আল্লাহ তুমি আমাকে সঠিক পথে নৌকার দিকে নিয়ে যাও।

বেশকিছু পথ অতিক্রম করার পর আছরের নামাজ পড়ে আবার ঘোড়া হাঁকালাম। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। কিছুক্ষণ পরেই বন্য হায়েনারা শিকার ধরার জন্য ঘোরাফেরা করবে। আমি ভাবলাম, এখনো অন্ধকার হয়নি। আরো একটু পথ অতিক্রম করে ঘোড়াটি একটি বৃক্ষের সাথে হালকা করে বেঁধে নেব, যেন বন্য হায়েনার আক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে, দৌড়ে পালাতে পারে। তারপর আমি একটি উঁচু গাছের ডালে চড়ে রাত পোহাব। এ সব চিন্তা করতে করতে আরো কিছু সামনে এগিয়ে গেলাম।

চলতে চলতে হঠাৎ দেখলাম, জাফর ভাই অস্ত্রসজ্জিত হয়ে মাগরিবের নামাজ পড়ছেন। আমি দূর থেকে ডেকে বললাম, জাফর ভাই! তুমি একা একা নামাজ পড়ছ? আমাকে নিয়ে পড়। আমি ফিরে এসেছি। আল্লাহ আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছেন। আমীর সাহেব ছাপ্পরের উপর থেকে ঘাড় ফিরিয়ে আমাকে অবলোকন করলেন। আমি দৌড়িয়ে গিয়ে এক রাকাতে শামিল হলাম।

নামায শেষে দু'জন আলিঙ্গনাবদ্ধ হলাম। জাফর ভাই খুশিতে আত্মহারা হয়ে বারবার আমার কপালে চুমু খাচ্ছেন। তারপর উভয়ে নৌকায় গিয়ে আমীর সাহেবের শারীরিক অবস্থার খোঁজ-খবর নিলাম। আমীর সাহেবও আমাকে পেয়ে খুব আনন্দিত। তিনি আগের তুলনায় এখন অনেকটা সুস্থ। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন. "বাবা!

তোমার জন্য খুব পেরেশান ছিলাম। আল্লাহর শোকর, ফিরে এসেছ। হয়ত সারাদিন আহার জুটেনি। তোমার চেহারায় ক্ষুধার আলামত পাওয়া যাচ্ছে। এখানে খোরমা, আপেল, আঙ্গুর, বেদানা আছে, হালকা কিছু খেয়ে নাও। পরে খানাপিনার ব্যবস্থা হবে।" আমীর সাহেবের কথায় আমি বেশকিছু ফল খেয়ে ক্ষুধার যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেলাম।

জাফর ভাই ও আমীর সাহেব ছায়েমার সংবাদের জন্য ব্যাকুল। তিনি আমার সাথে ছায়েমাকে না দেখে খুব চিন্তায় পড়ে গেলেন। আমীর সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, "বাবা! ছায়েমা কি বেঁচে আছে? নাকি জিন্দানখানায় বন্দী?"

আমি বললাম, আল্‌হামদুল্লিাহ! হাফেজা ছায়েমা মালাকানী বেঁচে আছে। সাথে সাথে উভয়ে সেজদায় লুটিয়ে পড়ে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন। আমি এক এক করে তার বন্দী হওয়ার ঘটনা ও অনেক বন্দীকে মুক্ত করার কাহিনী শোনালাম। এভাবে সবগুলো অভিযানের ঘটনা ও আল্লাহর নুসরতের কাহিনী গুনে আমীর সাহেব ও জাফর ভাই কাঁদলেন। তারা আল্লাহর প্রশংসা করতে আরম্ভ করলেন। আমীর সাহেব ভাবাবেগে বলে উঠলেন, "খোবায়েবের পবিত্র জবান থেকে কথাগুলো শোনার পর আমার ঈমানী শক্তি অনেকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ঈমান তাজা হয়েছে। আল্লাহর উপর একীন বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। জিহাদের জযবা বেড়ে গেছে। হাজার মাছলার সমাধান হয়েছে। দুনিয়ার মহব্বত আর জীবনের ভয় অন্তর থেকে বিদায় নিয়েছে।"

আমীর সাহেব জাফর ভাইকে খানা তৈরি করতে নির্দেশ দিলেন। জাফর ভাই খানা পাকানোর কাজে মনোনিবেশ করলেন। আমি জাফর ভাইকে সাহায্য করার জন্য যেতে চাইলে আমীর সাহেব বাধা দিয়ে বললেন, তুমি এখানে বস। আমি তোমাকে দেখে নছিহত গ্রহণ করি, গোনাহ মাফ করাই। এতসব প্রশংসায় আমি লজ্জায় মাথানত করে বসে রইলাম। জাফর ভাই খুব তাড়াতাড়ি রান্না করে নৌকায় নিয়ে এলেন। তারপর সবাই এক সাথে আহারাদি শেষ করে ঈশার নামায আদায় করলাম।

আমীর সাহেব জাফর ভাইকে বললেন, আজ রাতে পাহারা আমরা দু'জনেই দেব। খোবায়েব সফর করে এসেছে, সে ক্লান্ত। তাকে

বিশ্রামের সুযোগ দিতে হবে। আমি আমীর সাহেবের এজাজত নিয়ে বললাম, হুজুর! আমারও ইচ্ছা কিছু সময় আল্লাহর রাস্তায় পাহারাদারী করব। আমি সাওয়াব থেকে মাহরুম থাকতে চাই না। আমি আপনার অনুগ্রহের ভিখারী হয়ে আরজ করছি। আমীর সাহেব আমার কথায় রাজী হয়ে গেলেন। তারপর রাত্রিকে তিন ভাগ করে প্রথমভাগে আমীর সাহেব, দ্বিতীয় ভাগে জাফর ভাই আর তৃতীয় ভাগে আমাকে সাব্যস্ত করলেন। আমরা পালাক্রমে পাহারাদারী করে রাত কাটালাম।

ফজর হল। নামাজ শেষ করে তিলাওয়াত ও তাস্‌বীহ-তাহ্‌লীলে মশগুল হলাম। পরে আমীর সাহেব সবাইকে নিয়ে পরামর্শে বসলেন। প্রথমেই আমার দিকে ইশারা করে আমার মতামত জানতে চাইলেন। আমি বললাম, আমাদের সামনে বড় ধরনের দু'টি সমস্যা দেখা দিয়েছে। প্রথমত, যেভাবেই হোক ছায়েমাকে আমাদের কাছে ফিরিয়ে আনা। দ্বিতীয়ত, অতিসত্বর এ স্থান ত্যাগ করে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যাওয়া। কারণ, যে কোন মুহূর্তে বোমা হামলা হতে পারে। বোমা হামলা থেকে আত্মরক্ষামূলক কোন ব্যবস্থা আমাদের নেই। আমার কথা শুনে আমীর সাহেব মাথা নেড়ে সম্মতি জ্ঞাপন করলেন।

নিরাপদ আশ্রয় কোথায় পাব, তা নিয়ে আলোচনা চলছে। আমি বললাম, হুজুর! আমি কাজাকিস্তানের মানচিত্র ভালভাবে দেখেছি। নদীগুলোর শাখা-প্রশাখা জেনেছি। তাতে দেখলাম, এ নদীটি সাইবেরিয়া পর্বতমালা থেকে প্রবাহিত হয়ে এঁকে-বেঁকে শত শত মাইল দূরে চলে গেছে। নদীটি খুবই গভীর। কোথাও চর জাগেনি। খরস্রোতা নদী। আবহমানকাল থেকে বিরামহীনভাবে কল কল রবে বয়ে চলছে। নৌকা কোথাও আটকে যাবার ভয় নেই। ছায়েমাকে যেখানে রেখে এসেছি, এ নদী তার সাত কিলোমিটার দূর দিয়ে বয়ে গেছে। আমি বললাম, আমি ছায়েমার নিকট ফিরে যাই আর আপনারা নৌকা নিয়ে উসান্দভী বাজারের নিকটবর্তী কোন খালে নৌকা ভিড়িয়ে আমাদের জন্য অপেক্ষা করুন। অথবা আমি ছায়েমাকে নিয়ে তথায় অপেক্ষা করব। এখান থেকে নদীপথে উসান্দভী পৌছতে আনুমানিক চার-পাঁচ দিন লাগতে পারে।

আমি মানচিত্রটি আমীর সাহেবের হাতে দিলাম। আমীর সাহেব

ভালভাবে দেখে বললেন, হ্যাঁ, তোমার পরামর্শ খুবই সুন্দর। জাফর ভাই পরামর্শ দিলেন, আমীর সাহেব অসুস্থ, তার পক্ষে দাঁড় টানা সম্ভব নয়। আশা করি তিনি কান্ডারীর দায়িত্ব পালন করতে পারবেন। তিনি আরো বললেন, আমরা যদি পাল তুলতে পারি, তবে দ্রুত চলতে অনেকটা সহায়ক হবে।

আমীর সাহেব বললেন, আমরা পাল পাব কোথায়? জাফর ভাই বললেন, গ্রাউনশীট সেলাই করে পাল তৈরি করা যাবে। আমি বললাম, গ্রাউনশীটে পাল হবে না, হবে মরণফাঁদ। কারণ, এগুলো যে সেনাবাহিনীর তা কে না জানে? কেউ যদি প্রশ্ন করে, এগুলো কোথায় পেলেন, তবে উত্তর দেয়ার পথ থাকবে না। জাফর ভাই বললেন, জিমু বৃক্ষের ছাল-পাতা পানিতে জাল করে যে কোন কাপড়ে লাগালে বেগুনী রং ধরণ করে। আর এটা হয় পাকা রঙ। আমি বললাম, তা হলে পরীক্ষা করা হোক।

সকাল সাতটা। খানাপিনা করে স্থান ত্যাগ করতে হবে। আমীর সাহেব জাফর ভাইকে খানা তৈরির হুকুম দিলেন। জাফর ভাই আমাকে নিয়ে খানা পাকাতে গেলেন। রুটি তৈরি করে সেকা হল। তরকারীর হাড়ি উনুনে রেখে জাল দিচ্ছি। জাফর ভাই দা নিয়ে বনের ভেতর চলে গেলেন। একটু পরে জিমু গাছের ছাল ও পাতা নিয়ে আসলেন। উনুন থেকে হাড়ি নামিয়ে ছাল-পাতাগুলো একটু থেতলিয়ে কিছু পানি দিয়ে জাল করে গ্রাউনশীট চুবানো হল। সত্যিই চকচকে বেগুনী কালার হয়ে গেল। রং করে একটু সেলাই করে পাল রচনা করা হল। সবাই নাস্তা খেয়ে নৌকায় পাল উঠালাম। আমি ঘোড়া নিয়ে ছায়েমার অনুষনন্ধানে চলে গেলাম।

বিকাল চারটায় আসমাআতার নিকট পৌছলাম। যতই সামনে এগুচ্ছি, ততই ভয়ে ছাতি কাঁপতে লাগল। এলাকার অবস্থা অনুকূল নয়। আমাকে যদি ওরা চিনতে পারে, তাহলে মর্মান্তিকভাবে শহীদ করে দেবে। শহীদ হওয়াটা খুবই খোশ-নসিবের কথা। তবে আমার তো ইচ্ছা কমিউনিজমের কবর রচনা করে, জুলুম-নির্যাতন বন্ধ করে, সকল বন্দীদের মুক্তি দিয়ে সারা দুনিয়ায় ইসলামকে বিজয়ী করা। তারপর শহীদ হলেও আপত্তি থাকবে না। আমার ইচ্ছা, মুসলমানদের জান-মাল,

ইজ্জত-আব্রু ও তাহজীব-তামাদ্দুনের হেফাজত করে শহীদ হব।

এসব চিন্তা করতে করতে আমি আলমাআতা শহরে এসে হাজির হলাম। পানির পিপাসায় বুক দুরু দুরু করছে। ঘোড়ার মুখ থেকেও অনবরত লালা ঝরছে। এদিকে নামাজের সময়ও বিদায় নেয় নেয়। তাই একটি কূপের ধারে ঘোড়াটি রেখে অজু করে পানি পান করলাম আর ঘোড়াটিকেও পানি পান করালাম। নামাজ আদায় করে কিছু সময় বিশ্রাম নিলাম।

আমাকে নামায পড়তে দেখে ঐ মহল্লার কিছু বখাটে যুবক আমার নিকটে দৌড়ে এল। চোখগুলো আগুনের মত লাল করে প্রশ্ন করল, ওহে পথিক! তুমি কি রূহানী?

আমি প্রশ্ন করলাম, রূহানী কাকে বলে? তোমাদের নাম কি? কি কর তোমরা?

এসব প্রশ্ন করতে করতে আমি পকেট থেকে কাগজ-কলম বের করে ওদের নাম-ঠিকানা লেখতে চাইলাম। আমার হাবভাব দেখে ওরা ভয় পেয়ে গেল। আমাকে ওরা গুপ্তচর মনে করেছে। কারণ, ওরা ভাবছে , আমি নামাজ পড়লাম, আবার গায়ে হাতুড়ী মার্কা স্টিকার শোভা পাচ্ছে। তাই ওরা ঠিকানা বলতে ভয় পাচ্ছে। কেউ ঠিকানা দিতে রাজী নয়। আমিও পরিস্থিতির সদ্ব্যবহার করলাম। বড় একটি ধমক দিয়ে বললাম, এখান থেকে দূর হও। আমার ধমকে দুষ্ট ছেলেগুলো চলে গেল। আমিও ঘোড়ার লাগাম কষে পৃষ্ঠদেশে আরোহণ করে শহরের ভিতর দিয়ে সেনা ছাউনীতে পৌছলাম।

আমার আগমন বার্তা পেয়ে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, মেজর জেরারেল ও ছোট অফিসারগণ ছুটে আসল। নতুন কোন বার্তা আছে কিনা তা জানতে চাইল। আমি তাদের হাবভাব বুঝে হাস্যোজ্জ্বল মুখে বললাম, স্যার! আজকে মোবারক সংবাদ নিয়ে এসেছি। সকলেই চাতকের ন্যায় আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

আমি বললাম, সেদিন যে গোয়েন্দা বিমান গভীর অরণ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদী জঙ্গী মুজাহিদদের ওপর বোমা হামলা করেছিল, তাতে ৪০ জন মুজাহিদ নিহত হয়েছে। আর আহত হয়েছে ২০-২৫ জন। আহতদের এখনও সরিয়ে নিতে পারেনি। লাশগুলো অরণ্যে ক্ষতবিক্ষত

অবস্থায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে আমাদের বিমানটি যদি বিধ্বস্ত না হত, তবে ঐ এলাকা মুজাহিদমুক্ত এলাকা হিসেবে ঘোষণা করা যেত। বিশ্বস্ত সূত্রে আরো জানতে পারলাম, দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে মুজাহিদরা অরণ্যভূমিতে ছুটে আসছে। আমার মনে হয় ৩-৪ দিনের মধ্যে সবাই এসে পড়বে। এ ব্যাপারে আমার একটি পরামর্শ হল, আগামী ৩-৪ দিন পর আমরা যদি আবার বিমান হামলা করতে পারি, তাহলে ওদের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করতে পারব। এমনকি স্বমূলে ধ্বংসও করতে পারব।

আমার কথায় একজন সেনা অফিসার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে বললেন, স্যার বিলম্ব না করে ২-১ দিনের মধ্যেই হামলা করা হোক। ওরা যেন একত্রিত হতে না পারে। অফিসারের কথা শুনে আমি বললাম, এটা যুক্তিসঙ্গত নয়। সবাই যদি জড় হয়, তবে সবাই নিপাত যাবে। আর আগেই হামলা করা হলে মুজাহিদরা বিভিন্ন স্থানে অক্ষত থেকে যাবে। আমি তাদেরকে এ পরামর্শ এ কারণে দিলাম যে, আমীর সাহেব ও জাফর ভাই দু'এক দিনের মধ্যে নিরাপদ স্থানে যেতে পারবেন না। তাদের নিরাপদ স্থানে যেতে প্রায় ৩-৪ দিন সময় লেগে যাবে। যাই হোক আমার কথায় সেনাপ্রধান বললেন, খোবায়েবের পরামর্শই ঠিক, তা-ই করা হবে।

আর্টিলারী বিভাগের একজন কর্মকর্তা বললেন, আমাদের প্রস্তুতি নিতেও ৩-৪ দিন সময় লেগে যাবে। তবে আক্রমণ অবশ্যই করতে হবে। নয়তো আমরা নিরাপদ থাকতে পারব না। কারণ, মাত্র অল্প ক'দিনেই আমাদের শক্তিশালী কমান্ডোসহ শতাধিক সৈন্যের প্রাণহানি ঘটেছে। মুজাহিদদের সমূলে ধ্বংস করতেই হবে।

ভারপ্রাপ্ত প্রধান সেনাপতি আর্টিলারী বিভাগের প্রধানকে ডেকে এনে বললেন, আপনাকে দায়িত্ব দেয়া হল, আপনি নিজে বিমান বাহিনীর প্রধান এয়ার মার্শাল দিজনের সাথে আলোচনা করে কমপক্ষে ৫টি বোমারু বিমান ও ১৫ জন পাইলট এবং প্রয়োজনীয় শক্তিশালী বোমা উক্ত হামলার জন্য প্রস্তুত করুন। সব ধরনের প্রস্তুতি দু'দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ করতে হবে। তিনি আরো বললেন, যদি মার্শাল দিজন পদাতিক বাহিনী ব্যবহারের প্রয়োজন মনে করেন, তবে আমার কাছে

যেন বার্তা পাঠান। আমি অস্ত্রসজ্জিত দু'তিনশ' ফৌজ তৈরি করে রাখব।

এরপর সকলেই নিজ নিজ কাজে চলে গেল। কেউ পাহারাদারীতে, কেউ খানার এন্তেজাম করতে, আবার কেউ বিশ্রাম নিতে। আমি আমার সংবাদ পৌঁছে দিয়ে চাচার বাসায় চলে গেলাম।

গভীর রাত। সকলেই ঘুমের ঘোরে অচেতন। আমরা দু'জন খানা খেয়ে আলাপ করছি। চাচা আমার কারগুজারী শুনে খুব খুশী হলেন। তিনি উপদেশ ও সান্ত্বনা দিয়ে ঘুমোতে চলে গেলেন। আমিও শুয়ে পড়লাম।

[আঠার]

ছায়েমা ভাবছে আমার কথা। কতদিন পার হয়ে গেল খোবায়েব এখনো ফিরে আসল না। রজনী প্রভাত হয়, দিন ফুরিয়ে রাত আসে। এভাবে প্রহর গুণছে ছায়েমা। অপলক নেত্রে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমার আগমনের পথপানে চেয়ে থাকে। রাতেও অঘুম নয়নে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে চলছে। গাছের শুকনো পাতা ঝরে পড়ার শব্দ পেলেই চমকে উঠে, এই বুঝি খোবায়েব ফিরে এসেছে। হঠাৎ ডেকে উঠে, খোবায়েব ভাইয়া! তুমি এসেছ?

এদিকে ছায়েমার সাথে নাঈমা ও বেলেন্তিনার গভীর সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। ক্ষণিকের তরেও ওরা ছায়েমাকে ছাড়া থাকতে পারে না। বেলেন্তিনা তার স্কুলের বান্ধবীদের কাছে ছায়েমার বীরত্বগাঁথা কাহিনী শোনায়। মেয়েরাও এসে ভীড় জমায় ছামেয়াকে দেখতে। ছায়েমাও ভাব জমিয়ে তাদের সাথে আলাপ করে। অধিকাংশ সময় মুসলিম বীরাঙ্গনাদের ইতিহাস, চমকপ্রদ কাহিনী, শহীদের মর্যাদা, জিহাদের ফজিলতসহ অনেক খুঁটিনাটি মাসআলা বয়ান করে।

তরুণ-তরুণীরা প্রথম দর্শনে অনেকেই তাকে মেয়ে বলে মনে করেনি। তাদের ধারণা ছিল, সে হয়ত তরুণ সিপাহসালার, বীর পুরুষ। কিছু কিছু মেয়েকে অবশ্য বেলেন্তিনা ছায়েমার আসল পরিচয় বলেছে। ওরা অনেক নিরীক্ষা করে তার মেয়েলীর আলামত জানতে সক্ষম হয়েছে। অনেক তরুণ-তরুণী ছায়েমার অনলবর্ষী বক্তৃতায় জীবন স্বপ্নের পাতা উল্টিয়ে নতুন অধ্যায়ের সন্ধান পেয়েছে। তরুণ-তরুণীরা সকলেই জিহাদ করার তামান্না ব্যক্ত করতে লাগল। আঁধার রজনীতে গ্রামের

যুবকরা আসে আবদুর রশীদের বাড়ী। ছায়েমা তাদেরকে গোপনে অস্ত্রের প্রশিক্ষণ দিতে লাগল।

বন্দী মুক্তির পরপরই বলসেভিকরা গুপ্তচরদের লেলিয়ে দিয়েছে বিভিন্ন এলাকায়। ওরা ফেরীওয়ালা, দিনমজুর, মুচি সেজে গ্রামগঞ্জে ঘুরে তথ্য সংগ্রহ করে। আবার কিছু কিছু মহিলা বাসাবাড়িতে কাজের ছুতোয় মুজাহিদ আনাগোনা, কথাবার্তা ও অস্তিত্ব খুঁজে বেড়ায়।

ছায়েমা একদিন কয়েকজন মহিলাকে তালিম দিচ্ছে। এমন সময় একজন অপরিচিতা মহিলা এসে উক্ত মাহফিলে যোগ দেয়। ছামেয়া তাকে সন্দেহ করে। সে মহিলাকে প্রশ্ন করল, আপনাকে তো আর কোনদিন দেখিনি। আপনার বাড়ী কোথায়? পরিচয় কি? এখানে আপনার আগমনের উদ্দেশ্য কি?

মহিলা দূরের একটি গ্রামের নাম উল্লেখ করে বলল, ওই গ্রামে আমার বাড়ী। আমি একজন দুঃখিনী। আমার সংসারে কেউ নেই। বলসেভিকরা আমার স্বামী-সন্তানকে হত্যা করেছে, ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে দিয়েছে। আমি এখন সর্বহারা হয়ে পথে পথে ঘুরছি।

মহিলার সাজান কথায় ছায়েমার সন্দেহ আরো বেড়ে যায়। তার মনে প্রশ্ন জাগে, একজন অসহায় নারী এমন দুঃখের কাহিনী এমন শান্তভাবে বলতে পারে না। তার চেহারায় নেই মলিনতার ছাপ, নেই কোন পরিবর্তন। ছায়েমার বুঝতে বাকি রইল না, সে একজন মহিলা গোয়েন্দা। ছায়েমা বলল, আপনার দুঃখে আমিও দুখিত, আমরাও ব্যথিত, আমরাও চিন্তিত। আপনাকে সান্ত্বনা দেয়ার ভাষা আমার জানা নেই। তবে এতটুকু বলতে পারি, মহানুভব লেলিন সমাজতন্ত্র নিয়ে আমাদের মাঝে আত্মপ্রকাশ করেছেন। একমাত্র রূহানীরা ছাড়া অন্যসব লোকই সে আদর্শ গ্রহণ করেছে। রূহানীদের চিন্তাধারা যাদের মধ্যে বিদ্যমান, তাদের এমনটাই হওয়া স্বাভাবিক। কাজেই আপনাকেও সে আদর্শে বিশ্বাসী হতে হবে। অন্যথায় এর চেয়ে করুণ পরিণতি আপনাকে ভোগ করতে হবে। মহিলাকে এক বদনা পানি এগিয়ে দিয়ে ছায়েমা বলল, আপনাকে ক্ষুধার্ত মনে হচ্ছে, আপনি হাত-পা ধুয়ে কিছু খেয়ে নিন। মহিলা বদনা নিয়ে হাত-পা ধুতে গেলে ছায়েমা সবাইকে সতর্ক করে দিল। বেলেন্তিনা কিছু খাবার

এনে মহিলাকে খেতে দিল। মহিলা খেয়ে মাহফিলে বসে পড়ল।

ছায়েমা তার সুর পাল্টিয়ে উপস্থিত মহিলাদের খেতাব করে বলল, হে আমার প্রিয় বোনেরা! মৌলবাদীরা আমাদেরকে শুধু পর্দার কথা বলে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন রাখতে চায়। সমাজে আমাদের অবদান কম নয়। ওরা শুধু নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাতের ওয়াজ শুনিয়ে আমাদেরকে দূরে রাখতে চায়। এবাদত-বন্দেগী যার যার মনের অভিরুচি। যার ইচ্ছা করবে, যার ইচ্ছা করবে না। এ নিয়ে বাড়াবাড়ী করা আদৌ উচিত নয়। একমাত্র মৌলবাদীরাই আমাদের প্রগতির ও উন্নয়নের অন্তরায়। নারী সমাজকে রূহানীরা উন্নতির শিখরে আরোহন করতে দেয়নি। ওরাই আমাদের নারী স্বাধীনতা হরণ করেছে। হে আমার বোনেরা! আমরা পুরুষের পাশাপাশি উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অবদান রাখব। মহামহিম লেলিনের আদর্শ মেনে চলব। উন্নয়নশীল দেশের মত আমরাও পুরুষের পাশাপাশি মাঠে-ঘাটে, হাট-বাজারে, কল-কারখানায়, মিল-ফ্যাক্টরীতে কাজ করব। এতে কারও ওয়াজ-নছিহত শুনব না, কারও বাধা মানব না। অন্যান্য মহিলারা এক বাক্যে বলে উঠল ঠিক-ঠিক।

গোয়েন্দা মহিলা ছায়েমার বক্তৃতা শুনে বিশ্বাস করে নিয়েছে যে, এরা সবাই কমুনিস্ট। এখানে গোয়েন্দাগিরি অনর্থক। মহিলাটি কিছু বলার অনুমতি চাইলে ছায়েমা তাকে অনুমতি দিল। মহিলাটি তার আসল পরিচয় প্রকাশ করে বলল, হে আমার বোনেরা! আমি বলসেভিকদের একজন গুপ্তচর। তোমাদের এখানে এসেছিলাম তোমার গতিবিধি লক্ষ্য করতে। এখন আমার ভুল বুঝাবুঝির অবসান ঘটল। তোমাদের কর্মতৎপরতায় আমি খুবই খুশি।

ছায়েমা মহিলার পরিচয় জেনে ভাবল, একে হত্যা না করে ছেড়ে দেয়া ঠিক হবে না। তাই মহিলাকে দু'একদিন এখানে থাকার অনুরোধ জানালে মহিলা রাজি হল। মহিলাকে সারাদিন আদর-যত্নে রেখে গভীর রাতে ছায়েমা, বেলেন্তিনা ও নাঈমা তিনজনে মিলে ফাঁস লাগিয়ে মহিলাকে হত্যা করে গোয়েন্দাগিরির কাজ চিরতরে শেষ করে দেয়।

[উনিশ]

আমি চাচার বাসায় সারারাত ছটফট করে কাটালাম। ছায়েমার চিন্তায় চেষ্টা করেও চোখে ঘুম আনতে পারিনি। নিশিথিনীর শেষ প্রহরে পাখপাখালির কলকাকলিতে শয্যা ত্যাগ করে অযু-এস্তেঞ্জা সেরে কয়েক রাকাত তাহাজ্জুদের নামায আদায় করে জায়নামাযে বসে যিকির করছি। তারপর ফরজ পড়ে চাচাকে ডেকে বললাম, আমি বাসকাউন্ডে ছায়েমার নিকট যাব। আমার জন্য দোয়া করবেন। চাচা আমার কথা শুনে ঘরে গিয়ে কিছু নাস্তা এনে বললেন, বাবা! এগুলো খেয়ে বের হও। অনেক দূরের পথ। কিছু না খেয়ে বের হওয়া উচিত নয়। আমি নাস্তা খেয়ে ঘোড়া সাজালাম। চাচা কিছু টাকা ও ফল-মূল এনে বললেন, এগুলো সাথে নিয়ে যাও, কাজে আসবে। আমি চাচার কথামত এগুলো নিয়ে বাসকাউন্ডের দিকে ঘোড়া হাঁকালাম।

তুরাগ আমাকে নিয়ে চলল সোজা দক্ষিণে। দু'ক্রোশ দক্ষিণে গিয়ে আবার পশ্চিমের রাস্তা ধরলাম। প্রায় সাত-আট মাইল রাস্তা অতিক্রম করলে একটি নদী দৃষ্টিগোচর হল। সাথে সাথে মানচিত্র বের করে মিলিয়ে দেখলাম এটাই সেই নদী, যে নদী বেয়ে জাফর ভাই ও আমীর সাহেব আসছেন। নদীর কূল বেয়ে আরো একটু সামনে গিয়ে একটি সেনাছাউনী দেখতে পেলাম। সেনা ছাউনী দেখে মন আঁৎকে উঠল। কারণ, এ নদী বেয়েই তো ওরা আসবে। সেনাবাহিনীর জোয়ানরা যদি তাদেরকে দেখতে পায়, তবে আর রক্ষা নেই। মনে মনে ফন্দি আঁটলাম, যেভাবেই হোক এদেরকে তাড়াতে হবে।

আমি সোজা ক্যাম্পের দিকে অগ্রসর হলাম। আমাকে দেখে বেশ ক'জন সৈন্য ফায়ার পজিশনে অস্ত্র তাক করে দাঁড়াল। আমি বুঝতে পারছি, রেঞ্জে প্রবেশ করার সাথে সাথে ফায়ার করবে। তাই ঘোড়া থেকে অবতরণ করে সাদা গেঞ্জিটা গা থেকে খুলে উড়াতে লাগলাম। সাদা গেঞ্জির নড়াচড়া দেখে সেনা অফিসার মনে করল, কোন শান্তি মিশন ফ্ল্যাগ মিটিং করতে আসছে। তাই সৈন্যদেরকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে নিল। আমি সোজা সেনা ছাউনীতে ঢুকে পড়লাম।

অফিসার আমার পরিচয় জানতে চাইলে জেনারেল মার্শাল বোদায়েভের লিখিত পরিচয়পত্র দেখালাম। তারা পরিচয়পত্রটা

ভালভাবে পরখ করে দেখল। তারপর আমাকে মেহমানখানায় নিয়ে গেল। একজন সিপাইকে আপ্যায়নের হুকুম দিলে সে কলা-রুটি, চা-বিস্কুট নিয়ে আসল। আমি সামান্য কিছু খেয়ে পানি পান করলাম।

মেজর সাহেব আমার নিকট থেকে দেশের সার্বিক অবস্থা জানতে চাইলেন। আমি মোটামুটি সবদিকের কিছু ধারণা দিলাম। এভাবে দেশের বিভিন্ন পরিস্থিতির উপর কিছুক্ষণ কথোপকথন হলে জানতে পারলাম, নদীপথ চেক দেয়ার জন্য তারা এখানে ছাউনী ফেলেছে। শুনে আমার গা শিউরে উঠল। একদিকে আমি ভয়ে আতংকিত, অপরদিকে আল্লাহর প্রশংসা করছি এই জন্য যে, যদি সোজা উত্তরে বাসকাউন্ডের সঠিক রাস্তায় চলে যেতাম, তাহলে তো এদের টহল চোখে পড়ত না। এখন আর যাই হোক কিছু করতে না পারলেও অন্তত জাফর ভাইদের ফিরিয়ে রাখা যাবে। আসলেই এটা আল্লাহর বড় নুছরত। দুশমনের সন্ধান পাওয়া সাধারণ বিষয় নয়। এ নুছরত পাওয়ার একমাত্র কারণ হল, আমি সুন্নতের উপর আমল করেছি। মহানবী (সাঃ) কোন অভিযানে বের হওয়ার আগে সাহাবাদেরকে রাস্তার সন্ধান জিজ্ঞেস করতেন। যদি যুদ্ধের ময়দান পশ্চিমদিকে হত, তবে পূর্বদিকের রাস্তার খবর নিতেন। সবাই মনে করত, তিনি পূর্বদিকে যাবেন। আজ আমি এ হাদীসের উপর আমল করার কারণেই এত বড় বিপদ থেকে রক্ষা পেলাম।

মনে মনে ভাবছি, কিভাবে এদেরকে অন্যত্র সরানো যায়। যদি জাফর ভাই তাদের হাতে ধরা পড়ে, তবে হয়ত চিনে ফেলবে, সে সেনাবাহিনীর লোক হয়ে লেনিন পক্ষ ত্যাগ করে মুজাহিদ হয়ে গেছে। সব ধরনের শাস্তি তার উপর পতিত হবে। তাই আমি সেনা অফিসারের নিকট মুজাহিদদের রণকৌশল ও সাহসিকতার কথা এমনভাবে বিকৃত করলাম, যা অতীতে কোনদিন করিনি। আমার কথায় তাদের মনে ভয়ের সঞ্চার হল। সকলেই যেন তখনই ক্যাম্প ত্যাগ করে ফিরে যাবে। তাদের মধ্যে আতংকের সৃষ্টি হল। আমি তাদেরকে আরো দুর্বল করার জন্য বললাম, স্যার! অপ্রিয় হলেও সত্য যে, মুজাহিদরা এ পর্যন্ত যত ধরনের হামলা করেছে, তাতে আমাদের কমান্ডোসহ শতাধিক সৈন্য ও একটি শক্তিশালী মিগ-৫৬ বিমান বিধ্বস্ত হয়েছে। কাজেই, এদের সাথে

লড়াই করে পেরে ওঠা সাধারণ ব্যাপার নয়। আরো বললাম, গোপন সূত্রে সাংবাদ পেয়েছি, দু'একদিনের মধ্যে মুজাহিদরা এ ক্যাম্পে আক্রমণ করবে। এ সংবাদ নিয়ে আমি আলমাআতা থেকে এ পর্যন্ত এসেছি। এখন চিন্তু করুন, আশু বিপদ থেকে সেনা ভাইদেরকে কি করে রক্ষা করা যায়।

মেজর বললেন, তোমার কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। ওয়ারলেসের মাধ্যমে বারবার আমাদেরকে সতর্ক থাকার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। সত্যি ওদের মত লড়াকু সৈন্য আমাদের মাঝে নেই। দশ-বারজন মুজাহিদ দু'চারশ' বলসেভিক ও লাল ফৌজের মোকাবেলা করতে সক্ষম।

একজন সিপাই বলল, স্যার! ওদের উপর আক্রমণ করে অযথা জীবন বিপন্ন করার অর্থ নেই। কাজেই আমার মনে হয়, তিন-চারদিনের জন্য আমরা অন্যত্র সরে যাই। ওরা নৌযান নিয়ে আসার সম্ভাবনাই বেশী। ওরা এসে আমাদেরকে না পেয়ে ব্যর্থ হয়ে ফিরে যাবে। তারপর আবার এখানে ফিরে আসব।

মেজর পরামর্শ চাইলেন কোথায় যাবেন? কিভাবে যাবেন?

আমি মেজর সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললাম, স্যার! আমাকে যদি একটু সময় দেন, তবে ঘোড়া দাবড়িয়ে এলাকা ঘুরে দেখে আসি কোথাও নিরাপদ স্থান পাওয়া যায় কিনা।

মেজর বললেন, তোমাকে ধন্যবাদ, তাই কর।

আমি এক মুহূর্ত বিলম্ব না করে পূর্বদিক হয়ে সোজা দক্ষিণ দিকে নদীর কূলে চলে গেলাম। আল্লাহর কাছে দোয়া করলাম, যেন জাফর ভাইয়ের সন্ধান মিলে যায়। প্রায় দশ-বার মাইল রাস্তা অতিক্রম করার পর দূর থেকেই দেখতে পেলাম, নদীতটে এক প্রকাণ্ড মহীরূহ। তারই নীচে আমাদের রণতরী নোঙর ফেলেছে। জাফর ভাই আমাকে দূর থেকেই চিনে ফেললেন। তাই এস্তেকবালের জন্য আমার দিকে দ্রুতবেগে ছুটে আসলেন। নিকটে আসতেই উভয়ের সালাম বিনিময় হল। তারপর চলে গেলাম আমীর সাহেবের নিকট। আমীর সাহেব আমার নিকট থেকে সব ঘটনা শুনে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি ধারণা? কি করা যায়? আমি বললাম, ওদেরকে নদীকূল থেকে বহু দূরে সরিয়ে নেয়া যাবে। ওদের মধ্যে আতংক বিরাজ করছে। আমীর সাহেব

আমার কথার উত্তরে বললেন, "না, তাদেরকে সরিয়ে নেয়া ঠিক হবে না। আমরা যদি আল্লাহর উপর ভরসা করে আক্রমণ করি, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহর সাহায্য পাব। দুশমনকে ছেড়ে দেয়া ঠিক নয়। আল্লাহ নিজেই হুকুম দিয়েছেন, "কাফেরদের যেখানে পাও সেখানেই হত্যা কর।" কাজেই আমরা আয়াতে কারীমার উপর আমল করব।

আমীর সাহেব আরো বললেন, আল্লাহ আমাদেরকে পর্যাপ্ত পরিমাণ গোলাবরূদ ও অস্ত্রশস্ত্র দান করেছেন। তা দিয়ে যদি আমরা আক্রমণ করি, তবে মনে হয় কেউ ফিরে যেতে পারবে না। আমরা প্রথমে অটোগান ব্যবহার করব, যদি ওরা বাংকারে লুকিয়ে থাকে, তবে গ্রেনেড ব্যবহার করব। আর যদি কোন শক্ত প্রাচীরবেষ্টিত কোথাও অবস্থান নেয়, তবে রকেটলাঞ্চার চালাব। কেউ পালাবার সময় পাবে না। আল্লাহ অবশ্যই সাহায্য করবেন। মহান রাব্বুল আলামীন পবিত্র কালামে ইরশাদ করেন, "যুদ্ধ কর তাদের (কাফেরদের) সাথে। আল্লাহ তোমাদের হাতে তাদের শাস্তি দেবেন, তাদের লাঞ্ছিত করবেন, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের জয়ী করবেন এবং মুসলমানদের অন্তরসমূহ শান্ত করবেন।" (সূরা তাওবা ঃ আয়াত ১৪)

আমীর সাহেব আরো বললেন, বাতাস আমাদের অনুকূলে বইছে। পাল তুলে যদি নিরলসভাবে দাঁড় টানতে পারি তবে রাত দু'তিনটার দিকে সেনা ছাউনীতে হামলা করে প্রভাতের পূর্বেই তিন-চার মাইল রাস্তা অতিক্রম করতে পারব ইনশাআল্লাহ।

আমীর সাহেবের আলিশান হিম্মতে আমরা মোবারকবাদ জানালাম। তার নিকট এ মুহূর্তে আমার করণীয় কি তা জানতে চাইলে তিনি বললেন, তুমি এখনই সেনা ছাউনীতে ফিরে যাও। ওদেরকে অভয় দিয়ে বল, ওরা যেন আগামীকাল ছাউনী ত্যাগ করে। এটাও বলে দাও, তুমি অনেক স্থান প্রদক্ষিণ করেছ, কিন্তু কোথাও মুজাহিদদের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করনি। কাজেই তাড়াহুড়া না করে সকালে গেলেই ভাল হয়। তারপর গভীর রাতে অত্যন্ত সন্তর্পণে তুমি নদীর কূলে এসে আমাদের জন্য অপেক্ষা করবে। আর আক্রমণের পূর্ণ নকশা তৈরি করে সাথে নিয়ে আসবে।

আমি আমীর সাহেব থেকে বিদায় নিয়ে চলে আসার পূর্বক্ষণে

জাফর ভাই হেসে বললেন, ওহে পলাতক! এতদিন পরে সাক্ষাত করে তুমি খানা না খেয়েই বুঝি নিরুদ্দেশ হতে চাচ্ছ? এই বলে তিনি খানা এনে হাজির করলেন। আমি জাফর ভাইয়ের আবদার রক্ষা করে খানা খেয়ে ঘোড়ায় চড়ে বিদায় নিলাম।

আঁকাবাকা গ্রাম্য পথঘাট পেরিয়ে সন্ধ্যার প্রাক্কালে আমি সেনা ছাউনীতে এসে পৌছলাম। আমাকে দেখে সেনা ছাউনীর ছোট-বড় সব অফিসার ও সাধারণ সেনারা সংবাদ জানার জন্য দৌড়ে আসলেন । আমি সবাইকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, আজ রাতে ছাউনী ত্যাগ না করে আগামীকাল সকালে আমরা ছাউনী ত্যাগ করলেই চলবে। আশা করি রাতে কোন অসুবিধা হবে না। কারণ, আমি বহু পথ-ঘাট, গ্রাম-গঞ্জ চষে এসেছি, অনেক মানুষের সাথে মতবিনিময় হয়েছে, কেউ মুজাহিদদের পদচারণার কথা বলেননি। উল্টো গ্রামে স্বেচ্ছাসেবকরা মুজাহিদদের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য পাহারা দিচ্ছে। কাজেই আমাদের এত ভয় পাওয়ার কিছু নেই।

মেজর সাহেব নিরাপদ স্থানের সন্ধান পেলাম কিনা জানতে চাইলে বললাম, স্যার! দু'কিলোমিটার দূরে মজবুত দেয়াল ও ছাদবিশিষ্ট একটি প্রাইমারী স্কুল আছে। বাউন্ডারী ওয়ালও বেশ উঁচু। সাথেই রয়েছে খেলার মাঠ ও পুকুর। এলাকাটা খুবই মনোরম। জনগণ সবাই কমিউনিস্ট। আমরা ওখানে আশ্রয় নিলে মুজাহিদরা কিছুই করতে পারবে না। আমার কথায় সবাই খুশী হল এবং পরদিন সকালে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল।

গভীর রাত। ভীষণ অন্ধকার। সবাই এতক্ষণে গা এলিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। কোন বাড়ীতে কোন প্রদীপ জ্বলছে না। আমার চোখে ঘুম নেই। আক্রমণের অদম্য নেশায় শুধু প্রহর গুণছি। সৈন্যরা সবাই ঘুমে অচেতন। পাহারাদারগণও এখন আর জেগে নেই। সন্ধ্যায় ওদেরকে বলেছিলাম, মুজাহিদরা প্রথমেই পাহারাদার জবাই করে। তারপর অন্যদের উপর আক্রমণ করে। তাই পাহারাদারগণ পূর্ব থেকেই ভয় পেয়ে যায়। মেজর সাহেবের ভয়ে ওরা পাহারা দিতে রাজি হয়েছে। সন্ধ্যার পরপরই ওরা ঘুমিয়ে পড়েছে।

আমি এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখলাম, সবাই নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে।

কাফেররা মৃত্যুকে যে এত ভয় পায়, তা আগে জানতাম না। ওদের অবস্থা দেখে আমার এতটুকু সাহস হচ্ছে যে, ওদের জন্য আমি একাই যথেষ্ট। মনে মনে ভাবলাম, এখনই চলে যাওয়ার উপযুক্ত সময়। তাই অপেক্ষা না করে সোজা নদীর কূল অভিমুখে ছুটে চললাম। রাত একটায় নদীর সন্ধান পেলাম বটে, কিন্তু জাফর ভাইয়ের এখনও সাক্ষাৎ মেলেনি। আমি হতাশ হয়ে কূলে ঘুরে বেড়াচ্ছি। এমন সময় বৈঠার আওয়াজ কানে আসল। চেয়ে দেখি আঁধারে নৌকা অনেক নিকটে এসে গেছে। আমি বলে উঠলাম, জাফর ভাই, ও জাফর ভাই। জাফর ভাই আমার কণ্ঠ বুঝতে পেরে ডাকলেন, খোবায়েব এসেছ? নৌকায় এস। নৌকা কূলে ভিড়লে আমি গিয়ে নৌকায় উঠলাম এবং জাফর ভাইয়ের সাথে দাঁড় টানতে লাগলাম। মাত্র কয়েক মিনিটে আমরা ঘাটে এসে পৌঁছে গেলাম।

আমীর সাহেব আমার নিকট নকশা তলব করলেন। আমি নকশাটি তার সামনে পেশ করলাম। তিনি ভালভাবে নিরীক্ষণ করে কিছু উপদেশ দিলেন। তারপর সবাই গোলা-বারূদ, অস্ত্রশস্ত্র ও গ্রেনেড নিয়ে হামলার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম। কিছু সময়ের মধ্যেই সেনা ছাউনীতে পৌঁছে গেলাম। আমীর সাহেব নকশা অনুযায়ী প্রথম ও প্রধান খিমার নিকট দাঁড়ালেন। আমরাও তাই করলাম। তারপর আমীর সাহেবের সংকেতের সাথে সাথে একযোগে গর্জে উঠল তিন তিনটি এলএমজি। মুহূর্তের মধ্যে তাঁবুর ত্রিশটি প্রাণের সমাপ্তি ঘটে গেল। এখানকার কেউ বাঁচতে পারেনি। ফায়ারের আওয়াজে অন্য সব তাঁবুর সৈনিকরা আমাদের লক্ষ্য করে বৃষ্টির মত গোলা নিক্ষেপ করতে লাগল। আমরা সাথে সাথে মাটিতে শুয়ে পড়লাম।

আল্লাহর মেহেরবানীতে আমরা অক্ষত রয়ে গেলাম। তারপর ক্রলিং করে একটি প্রাচীরের অন্তরালে গিয়ে আমরাও পাল্টা গুলীবর্ষণ করলাম। আমাদের আক্রমণ প্রতিহত করতে না পেরে অনেকেই প্রাণ হারাল। আবার অনেকেই আহত অবস্থায় চিৎকারে ফেটে পড়ল। অন্যরা জীবন নিয়ে পালিয়ে গেল। আমরা বিনা বাধায় গনীমত কুড়িয়ে নিয়ে কয়েকটি গাড়ীতে অগ্নিসংযোগ করে নৌকায় ফিরে গেলাম।

রাত প্রায় শেষ। এখান থেকে দ্রুত চলে যেতে হবে। তাই

জীবনের মায়া ত্যাগ করে পাড়ি জমালাম বহুদূরে। প্রায় ৩-৪ মাইল পথ অতিক্রম করে ফজরের নামায আদায় করলাম। জাফর ভাই রাতের পাকানো বাসি-পান্তা এনে হাজির করলেন। সবাই নাস্তা করে নিলাম।

আমীর সাহেব বললেন, "সারারাত তো ঘুমাতে পারনি, বিশ্রাম নেয়া নেহায়েত দরকার। এখানে অবস্থান নেয়া নিরাপদ নয়। তাই অন্যত্র যেতে হবে।" আমরা সবাই দাঁড় টেনে আরো কিছু পথ অগ্রসর হলে একটি খালের সন্ধান পেলাম। খালটি খুবই ছোট, পানিও তেমন নেই। দু'ধারে শালবন। আমীর সাহেব আস্তে করে নৌকাটা খালের ভেতর নিয়ে গেলেন। এখানে কোন নৌকা আছে দূর থেকে কেউ বুঝতে পারবে না। বিশ্রামের জন্য এটাই উপযুক্ত স্থান। আমরা আল্লাহর উপর ভরসা করে নিজ নিজ বিছানা পেতে ঘুমিয়ে পড়লাম।

[বিশ]

ভারপ্রাপ্ত সেনাপতির নির্দেশে বিমান হামলার প্রস্তুতি সুসম্পন্ন হয়েছে। আটটি বোমারু বিমান ১৬ জন করে পাইলট, আট-দশটি করে শক্তিশালী বোমা নিয়ে আকাশে উড়ছে। দুপুর বারটার দিকে বিমানের আওয়াজে আমাদের ঘুম ভেঙ্গে গেল। বিমানগুলো চোখের পলকে মাথার উপর দিয়ে চক্কর দিতে শুরু করল। কানফাটা আওয়াজে গরু-বাছুর হাম্বা হাম্বা করে ছুটাছুটি করতে লাগল। গ্রামবাসীরা ভয়ে আতংকিত। অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে, কিয়ামত সংঘটিত হবে। আমীর সাহেব বুঝিয়ে বললেন, এটা বোম্বিং-এর পূর্ব মহড়া। এরপরই ওরা বোমা নিক্ষেপ করবে।

বারটা ত্রিশ মিনিটে আরম্ভ হল বোম্বিং। মাটি কাঁপিয়ে তুলছে। মনে হল, ভূমিকম্প আরম্ভ হয়ে গেছে। বন-জঙ্গল বোমার আঘাতে একাকার হয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ যেন পথ ভুলে একটি বিমান আমাদের মাথার উপর দিয়ে চক্কর খেল। জাফর ভাই এন্টি-এয়ারক্রাফট গানটি তাক করে বসে পড়লেন। এক পর্যায়ে বিমানটি আবার আমাদের দিকে অগ্রসর হল। জাফর ভাই 'অমা রামাইতা ইয রামাইতা' বলে ট্রিগার টানলেন। সাথে সাথে অর্ধ কিলোমিটার দূরে বিমানটি বিধ্বস্ত হয়ে ভূপাতিত হল। এটা যে গুলীর আঘাতে ভূপাতিত হল, তা কেউ টের পেল না।

আমীর সাহেব নির্দেশ দিলেন, তোমরা জলদি এখান থেকে

পালানোর ব্যবস্থা কর। এখানে আর বিলম্ব করা যাবে না। তার নির্দেশে আমরা দাঁড় টানতে আরম্ভ করলাম। তিনি ছাপ্পরে বসে বাসকাউন্ডের দিকে নৌকার গতি ঘুরিয়ে দিলেন। প্রাণপণ নৌকা বেয়ে তিনরাত তিনদিন পর আমরা কারাজলের নিকট এসে পৌঁছলাম।

বিকেল ৫টা। এখান থেকে আর ছয়-সাত কিলোমিটার পথ পায়ে হেঁটে ছায়েমার আশ্রয়স্থলে পৌঁছা যাবে। আমীর সাহেব পূর্বের মত একটি খালের ভেতর নৌকা নোঙর করলেন। তিনি আমাকে ছায়েমার সন্ধানে চলে যেতে নির্দেশ দিলেন।

আমি সেখান থেকে পদব্রজে চলছি। কিছু রাস্তা অতিক্রম করতেই সন্ধ্যা নেমে এল। চলতে চলতে মিলিওনিয়া নামক একটি গ্রামে পৌঁছলে চার-পাঁচজন যুবক আমার দিকে দৌড়ে এল। তাদের ডাকাডাকি আর হৈচৈ-এ আরো সাত-আটজন যুবক এসে গেল। একজন আমাকে প্রশ্ন করল, "পথিক! তুমি কোত্থেকে এলে, তোমার পরিচয় কি? রাতের আঁধারে কোথায় যাচ্ছ?"

যুবকদের প্রশ্নের উত্তর কি দেব ভেবে পাচ্ছি না। কারণ, চেহারা-ছুরতে এদের দ্বীনদার বলে মনে হয় না। সত্য কথা বললে আবার কোন্ বিপদে পড়ি কে জানে? তাই বললাম, আমি একজন কমিউনিজমের অনুসারী। মাঠকর্মী। আলমাআতা কলেজে লেখাপড়া করি।

আমার কথা শেষ হতে না হতে চারদিক থেকে কিল-ঘুষি, লাথি আসতে লাগল। অগত্যা আমার জবান থেকে বেরিয়ে এল, ইয়া আল্লাহ! তুমি আমাকে রক্ষা কর, তুমি ছাড়া আমাকে রক্ষা করার আর কেউ নেই। অন্য একজন যুবক এসে মোটা রশি দিয়ে আমাকে মজবুত করে বেঁধে ফেলল।

তারা আমাকে তাদের ক্লাবে নিয়ে এল। আমাকে হত্যার আয়োজনে মেতে উঠেছে যুবকরা। কেউ ছোরা শাণ দিচ্ছে, কেউবা দা ধারাচ্ছে, কেউ রশী পাকাচ্ছে। কেউ বলছে নদীর অববাহিকায় হত্যা করে টুকরো টুকরো করে বস্তায় ভরে নদীগর্ভে নিক্ষেপ করা হোক। আবার কেউ সে কথার বিরোধিতা করে ফাঁস লাগিয়ে হত্যা করে গাছে ঝুলিয়ে রাখার পরামর্শ দিচ্ছে। কেউ বলছে, না, লেনিনের বন্ধুকে হত্যা করে কমিউনিস্টদের চোখের সামনে রাস্তার পাশে ঝুলিয়ে রাখব। ওরা

যেন এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে, খোদাদ্রোহীদের পরিণাম এমন-ই হয়ে থাকে। বিড়াল যেমন ইঁদুরকে নিয়ে খেলা করে, তাদের অবস্থাও এর চেয়ে কম নয়।

আমি ওদের কথাবার্তায় বুঝতে পারলাম, ওরা কমিউনিস্ট বিপ্লবে বিশ্বাসী নয়, পাক্কা ঈমানদার। তাই অনুনয়-বিনয় করে দলপতিকে বললাম, ভাই আমি একজন মুসলমান। আপনাদেরকে ভুল বুঝে বাঁচার জন্য মিথ্যা কথা বলেছি। আমি শুধু একজন মুসলমানই নই, একজন জানবাজ মুজাহিদও বটে।

আমার বক্তব্য তারা হাসাহাসি করে উড়িয়ে দিল। এখন বুঝতে পারলাম যে, মাখলুকের কাছে ফরিয়াদ করে কোন লাভ নেই। এদের কাছে অনুরোধ করা অর্থহীন। তাই বিড় বিড় করে জপতে লাগলাম ঃ ফাল্লাহু খাইরুন হাফিজাও ওয়াহুয়া আরহামুর রাহিমীন। এক যুবক আমার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, কি হে বন্দী! বিড় বিড় করে কি জপছ? যুবকের প্রশ্নে আমি উচ্চস্বরে উক্ত তছবিহ পাঠ করতে লাগলাম। অন্য এক যুবক বলে উঠল, বাহ! খুব সুন্দর ফন্দী। বাঁচার জন্য ইস্টনাম জপ করছে!

তাদের আচরণ দেখে আমি নিজেকে পূর্ণরূপে আল্লাহর কাছে সোপর্দ করে দিলাম।

হত্যার আয়োজন সম্পন্ন। কিছুক্ষণের মধ্যেই হয়ত আমার প্রাণবায়ু উড়ে যাবে। আমাকে হত্যা করা হবে। ও আল্লাহ! অন্তিম সময়ে ছায়েমার সাক্ষাৎ হল না। হল না মা জননীর চেহারা দর্শন। অকালেই বুঝি দুনিয়ার মায়া ত্যাগ করে পরকালের সফরে চলে যেতে হবে। হায়, মুসলমানের হাতে মুসলমানের জবাই! এসব চিন্তায় আমি অস্থির। দলপতি এসে বলল, আমরা একা এ মোবারক কাজ সমাধান করব তা হয় না। সে এক যুবককে ডেকে বলল, হাবিল! তুমি এখনই দৌড়ে গিয়ে আমাদের মহামান্য কমান্ডারকে নিয়ে আস। তাকে সাথে নিয়ে এ-কাজ সমাধা করব।

হাবিল ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল। আমি অন্ধকার কক্ষে ছটফট করছি আর আল্লাহর কাছে গুনাহ মাফের দরখাস্ত জানাচ্ছি। প্রায় আধা ঘন্টা পর কানে ভেসে আসল অশ্বের পদধ্বনি। গা শিউরে উঠল। ওদের

কমাণ্ডার এসে পড়েছে বোধ হয়। এখনই হয়ত ওরা আমাকে বিদায় জানাবে। দুনিয়া জানাবে আল-বিদা।

হঠাৎ ঘরের দরজা খুলে গেল। বাইরের এক ঝলক আলো বিনা বাধায় ঘরে প্রবেশ করল। চেয়ে দেখি এক যুবককে ঘিরে অনেকেই দণ্ডায়মান। কি যেন শলা-পরামর্শ করছে তারা। কমান্ডার হুকুম দিলেন প্রদীপ আনতে। কয়েকজন যুবক প্রদীপ হাতে কমান্ডারের সাথে ঘরে প্রবেশ করল। কমান্ডার হঠাৎ 'খোবায়েব খোবায়েব' বলে আমাকে জড়িয়ে ধরল। চেয়ে দেখি, সে আর কেউ নয়, যুবকদের প্রধান সেনাপতি হাফেজা ছায়েমা মালাকানী।

ছায়েমা নিজ হাতে আমার বন্ধন খুলে মুক্ত করে দিল। দীর্ঘক্ষণ বন্ধন অবস্থায় থাকার দরুণ আমি সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছি না। ছায়েমা তার নরম হাতে বন্ধনের স্থানগুলো ম্যাসেজ করে। চোখের পানি মুছতে মুছতে বলতে লাগল, ওরে হতভাগা পলাতক! আজ ক'দিন কালের গর্ভে বিলীন হতে চলেছে তুমি আমাকে ছেড়ে পালিয়ে গেলে কোন্ সুদূরে। আমি দিন-রাত তোমার আগমনের পথপানে চেয়ে থাকি। খানাপিনা ও আরাম-আয়েশ হারাম করে দিয়ে অঘুম নয়নে দিন কাটাচ্ছি। প্রতিটি মুহূর্ত আমার কাছে একটি বছর বলে মনে হচ্ছে। আমি যে ক্ষণিকের তরে তোমায় দূরে রেখে থাকতে পারি না, তা কি তোমার জানা নেই?

ছায়েমার কান্না ও মমতামাখা কথাগুলো শুনে যুবকদের মুখ শুকিয়ে যায়। অনুতাপ আর অনুশোচনায় চেহারায় মলিনতার ছাপ লেগে যায়। যেন পূর্ণিমার চাঁদকে এক খণ্ড কালো মেঘে ঢেকে দিয়েছে। সকলেই হাতে-পায়ে ধরে ক্ষমা শিক্ষা চাইল। আমিও হাস্যোজ্জ্বল বদনে সবাইকে ক্ষমা করে সান্ত্বনা দিলাম। ছায়েমা আমাকে পেয়ে যেন আত্মা ফিরে পেয়েছে। খুশিতে চেহারায় নূরানী আভা বিচ্ছুরিত হচ্ছে। মুখভরা হাসিতে যামিনী উজালা। ছায়েমার হালত দেখে আমার দুঃখ-কষ্ট অনেকটা উপশম হল।

ছায়েমা আনন্দে গদগদ হয়ে উপস্থিত যুবকদের আমার পরিচয় দিতে গিয়ে বলল, হে আমার টগবগে প্রাণপ্রিয় মুজাহিদ বন্ধুরা! তোমরা যাকে হত্যার জন্য বন্দী করেছিলে, তিনিই আমার ভাই খোবায়েব

জামবুলী। তিনিই আমাকে সুনিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে আল্লাহর রহমতে উদ্ধার করেছিলেন। তিনিই সেই অকুতোভয় সিপাহসালার, যিনি একাধিক অভিযানে বিজয়ী হয়েছেন। তিনিই আমার খুনরাঙ্গা জিহাদের অনুপ্রেরণা। তার হস্ত মোবারকেই আমি জিহাদের বাইয়াত গ্রহণ করেছি।

ছায়েমা যুবকদের কাছে আমাকে এমনভাবে উপস্থাপন করল, যার ফলে ওদের কাছে আমার মান-মর্যাদা ও ইজ্জত লক্ষ গুণ বৃদ্ধি পেল। ছায়েমার বক্তব্যে যুবকরা লজ্জায় নতশীরে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কাঁদো কাঁদো ভাষায় আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে লাগল।

আমি যুবকদের বুকে জড়িয়ে নিয়ে সান্ত্বনা দিলাম, হে আমার প্রাণের ভায়েরা! ভুল বুঝাবুঝির কারণে এমনটা হয়ে থাকে। এতে দুঃখ পাওয়ার কিছু নেই। আমার বেশভূষা দেখে বলভেসিক মনে করা তোমাদের অন্যায় হয়নি। তোমরা তো ঈমানী দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে এমনটি করেছ। এতে অবশ্যই আল্লাহ তোমাদের পুরস্কৃত করবেন। আল্লাহ যাকে ইজ্জত দান করতে চান, তাকে কেউ বেইজ্জতি করতে পারে না। আর আল্লাহ যদি কাউকে বেইজ্জতি করেন, তাকে কেউ ইজ্জত দিতে পারে না। আল্লাহ যাকে রক্ষা করেন, তাকে কেউ বধ করতে পারে না। আমার কথায় যুবকদের মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠল।

আমার শরীরের কয়েকটি স্থানে জখম হয়েছে। ছায়েমা ধরে ধরে আমাকে নিয়ে আবদুর রশীদের বাড়ী চলল। সঙ্গে চলছে যুবকদের কাফেলা। রাত নয়টা নাগাদ আমরা আবদুর রশীদের বাড়ীতে এসে হাজির হলাম।

আমার আগমনের সংবাদ মুহূর্তের মধ্যে গোটা এলাকায় ছড়িয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে চারদিক থেকে জনতার ঢল নামল । আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা হুল্লা করে ছুটে আসল আবদুর রশীদের আঙ্গিনায়। সকলেই আমাকে এক নজর দেখার জন্য ভীড় জমাচ্ছে। লোকজন আসার পূর্বেই বেলেন্তিনা ও নাঈমা আমায় ঘিরে আছে। গণপিটুনীতে আমার চেহারা অনেক বদলে গেছে। এ দৃশ্য দেখে বেলেন্তিনা ও নাঈমা কান্না সামলিয়ে রাখতে পারল না। তারা অবুঝ বালিকার ন্যায় কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। সে দৃশ্য আজও ভুলতে পারি না।

গভীর রাত। কেউ বাড়ী ফিরতে রাজি নয়। সকলেই চায় আমার জবানী থেকে কিছু কারগুজারী শুনতে। আমি আমার অভিযানগুলোর পূর্ণ বিবরণ এক এক করে শোনালাম। সকলেই নীরবে আমার কথাগুলো শুনছে। আবদুর রশীদ টুকরি ভর্তি করে আপেল নিয়ে এল। বেলেন্তিনা ও নাঈমা এগুলো দ্রুত বন্টন করে দিল।

ছায়েমা দাঁড়িয়ে সবাইকে বলল, হে আমার ভাই-বোনেরা! আপনারা অবশ্যই আপনাদের প্রাণপ্রিয় কমান্ডারকে অবলোকন করেছেন। তিনি খুবই অসুস্থ। কথা বলতে খুবই কষ্ট হচ্ছে। এখন তাকে বিশ্রাম নিতে হবে। শরীরের ক্ষতস্থানে ওষুধ মালিশ করতে হবে। তাই আজকের মত আপনাদেরকে বিদায় দেয়া হল। আগামীকাল সকাল আটটার দিকে আবার আসবেন।

ছায়েমার অনুরোধে সবাই সালাম দিয়ে যার যার গৃহাভিমুখে চলে গেল। বেলেন্তিনা নাঈমাকে নিয়ে খানা হাজির করল। ছায়েমা নিজ হাতে গোশত-রুটি আমার মুখে উঠিয়ে দিল। আমি প্রয়োজন মত আহার করলাম। তারপর তায়াম্মুম করে নামায আদায় করলাম। ছায়েমা, বেলেন্তিনা ও নাঈমা একত্রে বসে আহার করল। বেলেন্তিনা আমার জন্য নরম শয্যা রচনা করল। আমি তাতে গা এলিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়লাম।

একটু পরে নাঈমা একটি পাত্রে করে প্রজ্বলিত অংগার নিয়ে এল। সাথে আনল গামছা। ছায়েমা বিষ-বেদনা ও ক্ষত নিরাময়ের জন্য কয়েকটি ট্যাবলেট খাওয়াল। তারপর কি এক বাম বেলেন্তিনাকে নিয়ে ফুলা জায়গাগুলোতে মালিশ করতে লাগল। নাঈমা গামছা গরম করে সেঁক দিতে লাগল। এতে আমি তাৎক্ষণিকভাবে কিছু আরাম অনুভব করলাম।

তাদের সেবা-যত্নে কখন আমি নিদ্রাপুরীতে চলে গেলাম, বলতে পারব না। যামিনীর শেষ প্রহরে নিদ্রা ভেঙ্গে গেল। চেয়ে দেখি শিয়রে ও ডানে-বামে ওরা এখনো অঘুম নয়নে আমার সেবা করছে। তাদের কাণ্ড দেখে আমি আশ্চর্য না হয়ে পারিনি। একটু পরেই ছোবহে সাদেক ভোরের বার্তা নিয়ে সকলের ঘরে ঘরে হাজির হল। নাঈমা অজুর জন্য গরম পানি নিয়ে এল। আমি ছায়েমার সাহায্যে অজু করে নামায পড়ে নিলাম।

সকাল সাতটার দিকে আবদুর রশীদের গৃহে ফিরে এলাম । বেলেন্তিনা দৌড়ে নাস্তা নিয়ে এল। আমি একা বসে নাস্তা খাচ্ছি। এমন সময় এলাকার লোকজন আসতে আরম্ভ করল। নাস্তা শেষ করতে না করতেই অনেক লোক এসে হাজির হল। নাস্তা সেরে আমি আঙ্গিনায় এলাম। সকলকে বসতে বললাম। সকলে যার যার সুবিধামত স্থানে বসে পড়ল। নাঈমা একটি কেদারা এনে বলল, মুসাফির ভাই! আপনি অসুস্থ, তাই দাঁড়িয়ে থাকা কষ্টকর হবে। এখানে আসন গ্রহণ করুন। সকলের অনুরোধ আমি কেদারায় বসলাম। ছায়েমাও আমার পার্শ্বে দণ্ডায়মান।

ছায়েমা লোকদেরকে উদ্দেশ করে বলল, হে আমার বীর মুজাহিদ সাথীরা! পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, "হে নবী, আপনি আপনার উম্মতদেরকে কিতালের প্রতি উদ্বুদ্ধ করুন।" এ আয়াতে কারীমার পরিপ্রেক্ষিত মহানবী (সাঃ) যখন মসজিদে নববীর মিম্বরে দাঁড়িয়ে তেজোদ্বীপ্ত কণ্ঠে বয়ান করতেন, তখন কোন মুসলমানই স্থির থাকতে পারতেন না। জিহাদের নেশায় শিরায় শিরায় শোণিতধারার ছুটাছুটি আরম্ভ হয়ে যেত।

মদীনার মিনার থেকে যখন ধ্বনিত হত হাইয়্যা আলাল জিহাদ হাইয়্যা আলাল জিহাদ- এসো জিহাদের দিকে, এসো জিহাদের দিকে, তখন যুবক-যুবতী, কিশোর-কিশোরী, ছেলে-মেয়ে, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, ধনী-গরীব, সর্বস্তরের মুসলমান বিবি-বাচ্চা, বাড়ীঘর, ক্ষেত-খামার, দোকানপাট, বাগ-বাগিচা, আত্মীয়-স্বজন সবকিছু ফেলে ছুটে আসতেন মসজিদের পানে- জিহাদে যাওয়ার অদম্য নেশা নিয়ে।

নবীর ঘোষণার সাথে সাথে সাহাবারা তীর, ধনুক, বর্শা, অশ্ব, ঢাল-তলোয়ার, খঞ্জর, জেরা, শীরস্ত্রাণ ও মিনজানিক নিয়ে হাজির হতেন। তারা একে অপরকে সাহায্য করতেন। এক মহিলা তার নবজাতক শিশু সন্তানকে এনে মহানবী (সাঃ)কে বললেন, ওগো আল্লাহর নবী! জিহাদে পাঠানোর মতো আমার ঘরে কেউ নেই। দয়া করে আমার কলিজার টুকরা নয়নের মণি এই বাচ্চাটিকে জিহাদের জন্য কবুল করুন। মহানবী (সাঃ) মহিলাকে জিজ্ঞেস করলেন, এই শিশু দ্বারা আমি কিভাবে জিহাদ করব? মহিলা উত্তর দিল, কাফেররা যখন

আপনাকে লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করবে, তখন আমার সন্তানটিকে ঢাল হিসেবে সামনে ধরবেন। তীর এলে সন্তানের গায়ে লাগবে, আপনি রক্ষা পাবেন। আর আমি শহীদের জননী হিসেবে কিয়ামতের দিন আল্লাহর দরবারে হাজির হব।

সাহাবা কেরাম দ্বীনকে এত ভালবাসতেন যে, নিজের জীবন, সন্তান-সন্তুতিও তার কাছে এত প্রিয় ছিল না। অনেক পিতা-মাতার এমন ইতিহাসও রয়েছে যে নিজের সন্তানকে যুদ্ধের সাজে সুসজ্জিত করে নবীর নিকট নিয়ে আসতেন এবং সুপারিশ করতেন, তিনি যেন তার সন্তানকে গ্রহণ করেন। সুবহানাল্লাহ! কি ছিল তাদের দ্বীনের দরদ।

ছোট বালকদের জিহাদী জযবা দেখে দয়ার নবী (সাঃ) বলতেন, তোমরা এখনো ছোট, আরো বড় হয়ে জিহাদ করবে। বালকরা কুস্তি লড়ে, তীর-ধনুক নিয়ে নিশানাবাজি করে নবীকে রাজি করানোর প্রতিযোগিতা করত। এমনকি পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলীতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে বলত, ইয়া রাসূলুল্লাহ! দেখেন তো আমি কত বড় হয়েছি। তাদের কাকুতি-মিনতি ও জযবা দেখে মহানবী (সাঃ) যুদ্ধে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। এতে বুঝা যায়, জিহাদের জন্য বালেগ হওয়া শর্ত নয়। শর্ত নয় হাফেজ, আলেম, ক্বারী, মুবাল্লেগ হওয়া।

আজকাল দেখা যায়, অনেকেই বলে থাকেন, আগে আলেম হও, তারপর জিহাদ কর। কেউ বলে, হেফজ শেষ করে নাও তারপর জিহাদ যাবে। আবার কেউ বলে, পীরের কাছে বাইয়াত হয়ে কলব ছাফাই করে জিহাদ যাবে। আবার কেউ বলে, চিল্লা বা সাল লাগিয়ে ঈমান মজবুত কর তারপর জিহাদ করবে। আফসোস, নবীর কথার সাথে এদের কথার মিল নেই। নবী (সাঃ) এমন কিছুই বলেননি।

হে আমার মুজাহিদ বন্ধুরা! জিহাদ করলে ঈমান বাড়বে, আমল বাড়বে, সাহস বাড়বে, মা-বোনদের ইজ্জতের হেফাজত হবে। মসজিদ-মাদ্রাসা সংরক্ষণ হবে। অর্থাৎ জিহাদের মাধ্যমে গোটা দ্বীনের হেফাজত ও সংরক্ষণ হবে। আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন গালিব হবে। জিহাদ থেকে মুসলমান পিছিয়ে থাকার কারণে আজ বলসেভিকদের হাত কেড়ে নিচ্ছে আলেম-উলামা, পীর-মাশায়েখ ও পরহেজগার-মুত্তাকীদের জান। পাইকারীভাবে লুণ্ঠিত হচ্ছে মা-বোনদের ইজ্জত। জ্বালিয়ে দিচ্ছে

ঘরবাড়ী ও দোকানপাট। আর মসজিদ-মাদ্রাসা ও খানকাগুলোকে বানিয়েছে মধ্যশালা, আস্তাবল, পতিতালয়, মন্দির ও সিনেমাহল। হায়! এ করুণ ও মর্মান্তিক ঘটনা আর দেখতে ও শুনতে চাই না।

ছায়েমার তথ্যপূর্ণ বক্তৃতায় সকলেই জিহাদের বাইয়াত গ্রহণের জন্য অঙ্গীকার ব্যক্ত করল। আমি তাদেরকে জিহাদের উপর বাইয়াত নিলাম। তারপর রুদ্ধকক্ষে অস্ত্রের প্রশিক্ষণ দিয়ে আবদুর রশীদকে আমীর নিযুক্ত করলাম। গনীমতের অস্ত্রশস্ত্র থেকে প্রায় ২০ জনের মধ্যে হাতিয়ার বন্টন করে জিহাদের নিয়ম-নীতি বলে দিলাম।

হযরত মুয়ায (রাঃ) থেকে বর্ণিত, আমীরুল মুজাহিদীন হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এরশাদ করেন, জিহাদ দুই প্রকার। যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি তালাশ করল, আমীরের কথা মেনে চলল, নিজের মূল্যবান মাল খরচ করল, সাথীদের সাথে সদয় ব্যবহার করল এবং ফেৎনা-ফাসাদ থেকে বিরত থাকল, তার শয়ন-স্বপন সবই সওয়াব। আর যে ব্যক্তি গৌরব ও প্রসিদ্ধি লাভের উদ্দেশ্যে জিহাদ করল, আমীরকে অমান্য করল এবং দুনিয়ার বুকে ফেৎনা-ফাসাদ সৃষ্টি করল, সে বিন্দু পরিমাণ সওয়াব নিয়েও জিহাদ থেকে ফিরে আসতে পারবে না।

উক্ত হাদীস দ্বারা জিহাদের ৬টি মূলনীতি বের হয়ে আসছে– ১) খালেছ নিয়ত ২) আমীরের অনুগত্য ৩) জিহাদে নিজের উত্তম মাল খরচ করা ৪) সাথীদের সাথে নম্র ব্যবহার করা ৫) ফেৎনা-ফাসাদ না করা ও ৬) যশ ও খ্যাতির জন্য জিহাদ না করা। প্রত্যেক মুজাহিদদের জন্য এই ৬টি নীতি মান্য করা ফরয। আমি আমীর সাহেবের সাথে পরামর্শ করে জিহাদ করার উপদেশ দিয়ে সবাইকে বিদায় দিলাম।

কারাজলে আবদুর রশীদের বাড়ীতে তিন দিন অতিবাহিত হয়ে গেল। জাফর ভাই ও আমীর সাহেব আমার চিন্তায় হয়ত অস্থির হয়ে গেছেন। তাই এখানে আর দেরী না করে জাফর ভাইদের খোঁজে যেতে হবে। আমরা দিনের বেলা যাওয়া ঠিক হবে না ভেবে রাতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। সন্ধ্যার পরপরই অস্ত্রগুলো সাজিয়ে রেখেছে ছায়েমা। দু'টি এলএমজি, ৬টি গ্রেনেড, তিন কার্টুন গুলী ও ৪টি ম্যাগজিন। আমাদের চলে যাওয়ার খবর মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ায় অনেকেই দেখতে আসল।

রাত আটটা। আমরা বিদায় হব। এমন সময় বেলেন্তিনা ও নাঈমা এসে ছায়েমার পায়ে লুটিয়ে পড়ল। নাঈমা চাপা কণ্ঠে বলল, আপামণি! এত নিষ্ঠুর হয়ে আমাদের থেকে কিভাবে বিদায় নিচ্ছ! তুমি না এখানে থাকার ওয়াদা করেছিলে? বুঝতে পেরেছি খোবায়েব ভাইয়াকে পেয়ে তোমার বোনদের কথা ভুলে গেছ। নাঈমার 'আপা' ডাকে সকলের মধ্যে এক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হল। অনেকেই ভাবছে, তাহলে কি ইনি মেয়ে? এতদিন তো যুবক হিসেবেই মনে করেছি। এবার সকলের ভ্রম ভেঙ্গে গেল। সকলের সন্দেহ দূর হল। সকলেই এবার ছায়েমাকে আবিষ্কার করে ফেলল ।

ছায়েমা বিদায়লগ্নে সবাইকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, আমাদের মিলন আল্লাহর খাতিরে, আর আমাদের বিরহও দ্বীনের খাতিরে। কাজেই, তোমরা বিচলিত হয়ো না। খেলাফত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেও দ্বীনকে গালিব করার জন্য জান ও মাল নিয়ে শত্রুর সাথে লড়াই চালিয়ে যাও। দ্বীন বিজয়ী না হওয়া পর্যন্ত কোন মুসলমানের মুখে হাসি আসতে পারে না। কোন মুসলমান নিশ্চিন্তে থাকতে পারে না। মহান রাব্বুল আলামীন পবিত্র কালামে ইরশাদ করেন, "যারা ঈমান এনেছে, দেশ ত্যাগ করেছে এবং আল্লাহ রাহে মাল ও জান দিয়ে জিহাদ করেছে, তাদের বড় মর্যাদা রয়েছে আল্লাহর কাছে, আর তারাই সফলকাম।" (সূরা তওবা ঃ আয়াত ২০)।

আপনারা যদি আল্লাহর ভালবাসা ও মর্যাদা চান, তবে জিহাদ করতে থাকুন। কমিউনিজমের কবর রচনা করা সমস্ত মুসলমানের উপর ফরয। কাফেরদের সাথে কখনো বন্ধুত্ব রাখা যাবে না। তাদের সমরশক্তি দেখে ভীত হওয়া যাবে না। কেননা, পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, "অতএব আপনি কাফেরদের অনুগত্য করবেন না এবং তাদের সাথে কঠোর সংগ্রাম করুন।" (সূরা ফুরকান ঃ আয়াত ৫২)।

ছায়েমা যুবকদেরকে আরো বলল, হে আমার প্রিয় ভায়েরা! তোমরা পরস্পর ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হয়ো না। নিজেদের ঝগড়া-ফাসাদে অনেক জনপদ বিরান হয়ে গেছে। বন্ধুবেশে অনেক মুনাফেক তোমাদের ডানে-বামে ঘুরে বেড়ায়। ওদের প্রতি খুব নজর রাখবে। তোমরা যদি জান-মালের মহব্বত দূর করতে পার, তবে তোমাদের বিজয় কেউ ঠেকাতে পারবে না।

ছায়েমার বক্তৃতার পর যুবকদের নেতা আবদুর রশীদ, ইউসুফ কারাজলী ও আসিফকে আমাদের সাথে নদীর কূলে নিয়ে চললাম নৌকা থেকে আরো কিছু অস্ত্র ওদেরকে দেয়ার জন্য। আমাদের পিছু পিছু সবাই যেতে আরম্ভ করল। আমি অনুরোধের সুরে বললাম, ভায়েরা! তোমরা আর এক কদম সামনে অগ্রসর হয়ো না। আমাদের নিরাপদে যেতে দাও। আমার কথায় সকলেই চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে বিদায় নিল। আমরা পাঁচজন নদীর দিকে এগিয়ে চললাম।

[একুশ]

ইস, কি অন্ধকার! দু'চোখে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। পায়ে আঘাতের কারণে হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে। ছায়েমা আমার হাত ধরে চলছে। অস্ত্রশস্ত্র, গোলা-বারুদ, গ্রেনেড, পানীয় ও খাবারসহ ওজন প্রায় ৩০-৩৫ কেজি হবে। এগুলো পাঁচজনে ভাগাভাগি করে নিলাম। কিছুদূর অগ্রসর হয়ে পেছনে তাকিয়ে দেখি, বেলেন্তিনা ও নাঈমা প্রদীপ হাতে এখনো দাঁড়িয়ে আছে। ওদেরকে ঘরে ফিরে যেতে কে বলবে? আমরা তো অনেক দূর চলে এসেছি।

সারা দুনিয়া নিথর-নিস্তব্ধ। কোথাও জনমানবের সাড়া-শব্দ নেই। রাস্তাটি সরু ও আঁকাবাঁকা। দ্রুত চলা যাচ্ছে না। আমাদের চলার শব্দ পেয়ে ঘুমজাগা কুকুরগুলো ঘেউ ঘেউ করে রাতের নীরবতা ভেঙ্গে দিচ্ছে। পায়ে দলিত শুকনো পাতার মর্মর ধ্বনিতে পাখীরা পালক ঝেড়ে পত পত আওয়াজ তুলে কোথায় জানি পালাচ্ছে। মাঝে-মধ্যে যেন ক্ষীণ তড়িৎ চমকাচ্ছে। আসলে তড়িৎ নয়, আলেয়া।

ঘন্টা কয়েক চলার পর আমরা মধ্য রজনীতে নদীর কূলে এসে পৌঁছলাম। এদিক-ওদিক তাকিয়ে কোথাও কোন প্রদীপ বা নৌকা দৃষ্টিগোচর হল না। হয়ত কোন খালে নোঙর ফেলে ঘুমোচ্ছে জাফর ভাই। সকলেই ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত। কিছুক্ষণ বিশ্রাম না নিয়ে উপায় নেই। নদীর কূলে একটি পাকুর বৃক্ষের নীচে ছামানা রেখে বসলাম। ছায়েমা থলে থেকে খেজুর, আপেল আর কিসমিস বের করে বলল, খোবায়েব ভাই! এগুলো মেহমানদের নিয়ে খেয়ে কোমরটা একটু সোজা কর। আমরা সবাই ফল খেয়ে ক্ষুধার যন্ত্রণা থেকে মুক্তিলাভ করলাম।

ছায়েমা, ইউসুফ কারাজলী ও আসিফকে ছামানার নিকট বসিয়ে

আমি আব্দুর রশীদকে নিয়ে নৌকার সন্ধানে বের হলাম। প্রথমে দক্ষিণ দিকে দু'তিন কিলোমিটার হাঁটলাম, কিন্তু কারো দেখা পেলাম না। নিরাশ হয়ে পুনরায় উত্তরের দিকে আরো তিন কিলোমিটার পথ অতিক্রম করলাম। কিন্তু কোন খোঁজ পেলাম না। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ফিরে এলাম। পাকুর গাছের নীচে ইউসুফ ও আসিফ শুয়ে ঘুমাচ্ছে আর ছায়েমা পাহারা দিচ্ছে। রাত প্রায় শেষ। একটু না ঘুমালে দিনে আবার বেশ কষ্ট করতে হবে। তাই ইউসুফ ও আসিফকে পাহারার কাজে লাগিয়ে আমরা ঘুমিয়ে পড়লাম।

রাতের শেষ প্রহর ভোরের আগমনীবার্তা নিয়ে হাজির হল। ইউসুফ কারাজলী সবাইকে নামাযের জন্য জাগিয়ে দিল। আমরা নদীর স্বচ্ছ পানিতে অজু করে ফজরের নামায আদায় করলাম। সূর্য উদিত হওয়ার আর বাকী নেই। পূর্ব আসমান রাঙা হয়ে উঠেছে। এখন লোকজন রাস্তায় বের হবে। অস্ত্রশস্ত্রসহ পথ চলা যাবে না। তাই সবাই পরামর্শে বসলাম। ছায়েমা বলল, খোবায়েব ভাই! দিনের বেলায় যেহেতু কোথাও যেতে পারব না, সেহেতু আত্মগোপন করেই থাকতে হবে। আমি বললাম, এমন কোন স্থান তো দেখছি না? ছায়েমা বলল, ঐ যে বিশাল কাশবন দেখা যাচ্ছে, ওর ভেতরেই থাকতে হবে, সেখানে হয়ত লোকজনের যাতায়াত নেই। আমরা যদি অনেক গভীরে লুকিয়ে থাকি, তবে কেউ আমাদের দেখতে পাবে না।

আমরা সবাই ছায়েমার পরামর্শ মত ছামানা নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কাশবনে ঢুকে পড়ি। বিশাল এলাকাজুড়ে নদীতটেই কাশবন। কাশবনের ভেতরে রয়েছে ঝাউ গাছ। আমরা ঝাউ গাছের নীচে নিজ নিজ বিছানা বিছিয়ে শুয়ে পড়লাম। সারাটা কাশবন জুড়ে খেকশেয়ালের গর্ত। আমরা সেখানেই অবস্থান নিলাম।

সকাল আটটা। আমি ছাড়া সবাই ঘুমিয়ে। আমি পাহারা দিচ্ছি। এক কৃষক নদীর চরে চাষ করছিল। সে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে গিয়ে কাশবনে ঢুকল। এস্তেঞ্জা সেরে উল্টো দিকে যাচ্ছিল। হঠাৎ আমাকে দেখে বলে উঠল, কে রে কাশবনে? চুরি করতে এসেছ বুঝি?

কৃষক ভেবেছে আমি কাশবন কেটে উজাড় করছি। লোকটা একপা-দু'পা করে আমার নিকটে এগিয়ে আসল । আমিও ভয় পাচ্ছি।

কৃষকও আমাকে ভয় পাচ্ছে। এবার কৃষক সবাইকে দেখে ভাবল, আমরা ডাকাত দল। অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে রাতে ডাকাতি করি আর দিনের বেলায় কাশবনে আত্মগোপন করে থাকি। আমি কৃষককে পাশে বসিয়ে আলাপ জুড়ে দিলাম। অভয়বাণী শোনালাম। আমাদের পরিচয় সত্য সত্য দিলাম।

কৃষক আমাদের কিছু আলোচনা শুনে প্রশ্ন করলেন, তাহলে কি আপনারা দ্বীনের মুজাহিদ? আমি উত্তর দিলাম, হ্যাঁ, আমরা মুজাহিদ। ইলায়ে কালিমাতুল্লার জন্য আমরা জিহাদ করি, নিরীহ মানুষকে আমরা কিছু করি না। বঞ্চিতের অধিকার ছিনিয়ে আনি। বন্দী-বন্দীনীকে মুক্ত করি, বলসেভিক, কমিউনিস্টদের হত্যা করে প্রতিশোধ গ্রহণ করি।

আমার কথা শুনে কৃষক বলে উঠলেন, বাবা আমি মুজাহিদদের খুব ভালবাসি। নাম জিজ্ঞেস করলে কৃষক বললেন, আমার নাম হামিদ জায়ী, ওই গ্রামে আমার বাড়ী।

হামিদ জায়ী আমাকে বললেন, বাবা! এমনভাবে পাঁচজন লোক এখানে থাকা নিরাপদ নয়। অন্য কোন মানুষ যদি তোমাদেরকে এ অবস্থায় দেখে, তবে দস্যু মনে করে ডাকাডাকি আরম্ভ করবে আর চারদিক থেকে লোকজন এসে তোমাদেরকে পাকড়াও করবে। তাই তোমরা সবাই আমার জমিতে কাজ করতে থাক। কেউ দেখলে মনে করবে, তোমরা আমার ক্ষেতশ্রমিক। অস্ত্রগুলো আপাতত শিয়ালের গর্তে লুকিয়ে রাখ। তারপর হেফাজতের ব্যবস্থা হবে। আমি সবাইকে জাগিয়ে ঘটনা খুলে বললাম। সবাই একমত হয়ে জমিনে কাজে লেগে গেলাম। অস্ত্রগুলো রেখে দিলাম শিয়ালের গর্তে।

হামিদ জায়ী বাড়ীতে গিয়ে কিছু সাধারণ কাপড়-চোপড় নিয়ে এলেন। আমরা ওগুলো পরিধান করলাম। তারপর তিনি কাশবৃক্ষ কেটে আঁটি বানালেন। তার ভেতরে অস্ত্রগুলো রেখে দিলেন। বেশক'টি বোঝা রচনা করলেন। কাশের বোঝা নিয়ে আমরা একজন একজন করে হামিদ জায়ীর বাড়ীতে গেলাম। দুপুরে খানাপিনা তিনি করালেন। খানা খেয়ে আবার ক্ষেতমজুরের কাজে নদীতটে চলে এলাম। হামিদ জায়ীও আছেন আমাদের সঙ্গে।

ছায়েমা হামিদ জায়ীকে জিজ্ঞেস করল, চাচাজান! আপনি এখানে

কাজ করাকালীন নদীতে দু'একদিনের মধ্যে কোন নৌকা দেখেছেন কি?

হামিদ জায়ী বললেন, হ্যাঁ দেখেছি। গতকাল সন্ধ্যার পর বলসেবিক বাহিনী সাঁড়াশি আক্রমণ চালিয়ে দু'জন মাল্লাকে হত্যা করেছে। তারা নৌকাসহ নদীগর্ভে ডুবে গেছে।

হামিদ জায়ীর কথায় সকলেই কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। আমি যথাসাধ্য সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করছি। আমি কৃষককে জিজ্ঞেস করলাম, চাচাজান, যেখানে নৌকাটি নিমজ্জিত হয়েছে, সে স্থানটি কি চেচেন? বললেন, হ্যাঁ চিনি।

জিজ্ঞেস করলাম, কিভাবে এ মর্মান্তিক ঘটনার সূত্রপাত হলো?

হামিদ জায়ী বললেন, বাবা! আমাদের মহল্লার ইমাম সাহেব কমিউনিজমে বিশ্বাসী। নৌকাটি কয়েকবার এদিক-ওদিক আনাগোনা করতে দেখে তিনি তাদেরকে মুজাহিদ হিসেবে চিনে নিয়েছেন। তারপর থানায় খবর দিলে অসংখ্য সৈন্য সাঁড়াশি আক্রমণ করে নৌকাটির মাঝি-মাল্লাদেরকে শহীদ করে দেয়।

জাফর ভাই ও আমীর সাহেবের শাহাদাতের সংবাদে আমরা ভেঙ্গে পড়লাম। কি করব কিছুই ভেবে পাচ্ছিলাম না। আমি বর্তমান অবস্থা ধামাচাপা দিয়ে সাথীদের অন্তরে সাহস দিতে লাগলাম। আমি বললাম, আহ! তারা কতইনা সৌভাগ্যশালী। আজ তারা শহীদ হয়ে জান্নাতে আশ্রয় নিয়েছেন। কতইনা উত্তম। কতইনা উত্তম।

মহান রাব্বুল আলামীন পবিত্র কালামে ইরশাদ করেন, "আর যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়, তাদের মৃত বল না, তারা জীবিত, কিন্তু তোমরা তা বুঝ না।" (সূরা বাকারা ঃ আয়াত ১৫৪)

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে– "ওদেরকে মৃত বলে ধারণা করো না।"

সুবহানাল্লাহ! তাদের কত মর্যাদা !

আমরা সারারাত অস্থিরতার মধ্যে কাটালাম। কেউ ঘুমাতে পারিনি। অসহনীয় বেদনায় সকলেই অস্থির। এর মধ্যে ফজর হল। নামায আদায় করে পরামর্শে বসলাম। দীর্ঘ আলোচনার পর আমি বললাম, এখানে আমাদের বেশী সময় অতিবাহিত করা ঠিক হবে না। আবদুর রশীদ, ইউসুফ ও আসিফ বাড়ি চলে যাক। আর আমরা জামবুল

গিয়ে আম্মুর সাথে সাক্ষাৎ করে সব খবর দিয়ে দু'চার দিন আম্মুর সাথে কাটিয়ে তুর্কমেনিস্তানে চলে যাব। সেখানে আনোয়ার পাশার বাহিনীতে যোগ দিয়ে জিহাদ চালিয়ে যাব। আমার কথা শেষ হতে না হতে ছায়েমা চোখ দু'টি কপালে তুলে বলল, "আহা রে! আমার বীর পুরুষ, জাফর ভাইদের ঘাতকদের শাস্তি না দিয়ে আম্মুর কাছে যেতে চাচ্ছ! ছিঃ যাদের মা নেই, তারা যাবে কোথায়?" বলসেভিকদের নির্মম অত্যাচারে অনেকের মা-বাবার জান চলে গেছে। তাদের রেখে যাওয়া সন্তানরা তো আর কোনদিন মাতা-পিতার কাছে ইচ্ছা করলেও যেতে পারবে না। লক্ষ্য মায়ের বুকের ধন কেড়ে নিয়েছে নরাধম-নরপশু কমিউনিস্ট হায়েনারা। কেড়ে নিয়েছে অসংখ্য নারীর স্বামীকে। ভেঙ্গে দিয়েছে বাসরঘর। সেসব সন্তানহারা জননীর আর্তচিৎকারে, স্বামীহারা বিধবা মায়ের বুকফাটা আর্তনাদে, এতিম ও অসহায়ের কান্নায় কাজাকিস্তানের আকাশ-বাতাস ভারি হয়ে উঠেছে। এদের জবাব দেয়ার জন্য কোন মুসলমান যুবক আজ দাঁড়াচ্ছে না। তুমিও আজ মায়ের কোলে ফিরে যেতে চাও। তুমি কি ভুলে গেছ আল্লাহর বাণী— "বল তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের পত্নী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা, যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় কর এবং তোমাদের বাসস্থান, যাকে তোমরা পছন্দ কর, আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর রাহে জিহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা কর আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত আর আল্লাহ ফাসেক সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না।" (সূরা তওবা ঃ আয়াত ২৪)

ছায়েমা কথাগুলো খুব আবেগের সাথে বলছিল। সে আমাকে আরো ধিক্কার দিয়ে বলল, আমীর সাহেব আর জাফর ভাইয়ের শাহাদাতের রক্ত বৃথা যাবে, তা কি করে হয় খোবায়েব ভাইয়া! তোমার অন্তরে কি প্রতিশোধের অগ্নি প্রজ্বলিত হচ্ছে না?

ছায়েমার অগ্নিঝরা কথাগুলো আমার অন্তরে সাংঘাতিকভাবে রেখাপাত করছে। শিরায় শিরায়, ধমনিতে ধমনিতে প্রতিশোধের অগ্নি প্রজ্বলিত হচ্ছে। আমি হাতের ইশারায় ছায়েমাকে বারণ করে বললাম, তুমি শান্ত হও। প্রতিশোধ না নেয়া পর্যন্ত আমি গৃহে ফিরে যাব না।

আবদুর রশীদ, ইউসুফ কারাজলী ও আসিফ এক সুরে বলে উঠল, আমরাও তাতে একমত। অবশ্যই প্রতিশোধ নিতে হবে।

সকলের পরামর্শক্রমে আমাকে আমীর নিযুক্ত করা হল। আমি যথারীতি এ্যাকশন গ্রুপ তৈরি করে দায়িত্ব বন্টন করে দিলাম। ছায়েমা ও আবদুর রশীদকে আমার সাথে তারুজী (আক্রমণ) গ্রুপে রেখে ইউসুফ কারাজলী ও আসিফকে আমাদের হেফাজতের জন্য নিযুক্ত করলাম। ওরা আমাদের থেকে একটু দূরে অবস্থান করবে। আমাদের উপর যদি কোন আক্রমণ আসে, তবে দূর থেকে সাহায্য করবে।

সকাল আটটা ছাড়িয়ে যাওয়ার পথে। আমাদের আশ্রয়দাতা কৃষক হামিদ জায়ী খানা এনে বললেন, বাবারা! গরীবানামত কিছু খানা খেয়ে নাও। তারপর পরামর্শ করো। আমরা সবাই খানা খেতে বসলাম। কৃষক গরীব হলেও তার দিলটা গরীব নয়। তিনি বড় ভাল মানুষ, খুব অতিথিপরায়ণ। তিনি নিজ হাতে খানা পরিবেশন করলেন। এ গৃহে এত সুস্বাদু খানা তৈরি হবে, তা কোন সময় ভাবতেও পারিনি। আমরা অল্প সময়ে আহারাদী সেরে নিলাম।

ইউসুফ কারাজলী আমাকে প্রশ্ন করলেন, মোহতারাম আমীর সাহেব! আমরা কি দিয়ে যুদ্ধ করব? আমাদের তো অস্ত্র নেই।

সঙ্গে সঙ্গে ছায়েমা বলে উঠল, আমাদের যা আছে, তা দিয়েই আরম্ভ করব। আল্লাহ আমাদেরকে সাহায্য করবেন। অস্ত্র নেই বলে যুদ্ধ থেকে বিরত থাকা, বড় হাতিয়ার না থাকার কারণে পিছিয়ে থাকা তো জায়েজ মনে করি না। আল্লাহপাক এরশাদ করেছেন-

"তোমরা বের হয়ে পড় স্বল্প বা প্রচুর সরঞ্জামের সাথে এবং জিহাদ কর আল্লাহর পথে নিজেদের জান ও মাল দিয়ে, এটি তোমাদের জন্য অতি উত্তম যদি তোমরা বুঝতে পার।"(সূরা তওবা ঃ আয়াত ৪১)

ছায়েমা আরো বলল, হে আমার মুজাহিদ ভাইয়েরা! মহান আল্লাহ কালামে মজীদে আমাদের সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন-

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন কাফেরদের মুখোমুখি হবে, তখন পশ্চাদপসরণ করবে না।" (সূরা আনফাল ঃ আয়াত ১৫)

আমরা শহীদ হলেও পিছপা হব না। এটাই আমাদের অঙ্গীকার। এভাবে যদি লড়াই চালিয়ে যেতে পারি, তবে অবশ্যই আল্লাহ আমাদের বিজয়ী করবেন।

ছায়েমার কথা শুনে আমার মনে ঈমানী চেতনা আরো বৃদ্ধি পেল। আমি মনে মনে ভাবলাম, জাফর ভাই ও আমীর সাহেবের ভাগ্যে শাহাদাত ছিল। তা-ই হয়েছে। নৌকায় হয়ত কিছু অস্ত্র অক্ষত থেকে যেতেও পারে। তাই হামিদ জায়ীকে ডেকে জিজ্ঞেস করলাম, চাচা মিয়া! আমাদের সাথে নদীতে চলুন। যে স্থানে নৌকাটি নিমজ্জিত হয়েছে, তা দেখিয়ে দিন। আমরা লাশগুলো উদ্ধার করে জানাজার ব্যবস্থা করব। হামিদ জায়ী বললেন, তা অবশ্যই করা দরকার, এটা কঠিন কোন কাজ নয়। নদীতে চার-পাঁচ হাতের বেশি পানি হবে না। আমি তো প্রায় সময় মাছ শিকার করে থাকি।

আমি হামিদ জায়ী ও আমাদের অন্যান্য সাথীদের নিয়ে নদীর দিকে চললাম। সাথে নিলাম মোটা রশি ও বাঁশ। চলার পথে আসিফ এসে বলল, আমীর সাহেব! আমি যদিও দক্ষ ডুবুরী নই, তবু ছোটখাট নদীতে ডুবুরীর কাজ করেছি। ডুবে যাওয়া অনেক নৌকাও সন্ধান করেছি। আশা করি আমাকে দায়িত্ব দিলে ভাল হবে। হামিদ জায়ীও আমাকে এমন কথাই বললেন। অগত্যা তাদেরকেই এজাজত দেয়া হল। আমরা নদীর তটে দাঁড়িয়ে বেশি বেশি দোয়া করছি। আসিফ ও হামিদ জায়ী ডুবোতে লাগলেন। একটু পর হামিদ জায়ী মাথা উত্তোলন করে আমাকে ডেকে বললেন, আমীর সাহেব! নৌকা পেয়েছি তবে অক্ষত বলে মনে হয় না। হামিদ জায়ীকে বললাম, আপনি রশি বেঁধে আসুন, তিনি তাই করলেন। অতঃপর সবাই টানাটানি করে এক-তৃতীয়াংশ তটে নিয়ে এলাম। কিন্তু কোন লাশের সন্ধান পেলাম না। চিন্তা করে হামিদ জায়ী ও আসিফকে বললাম, আপনারা আর একটু চেষ্টা করুন দেখি লাশের সন্ধান পাই কিনা।

আমার কথা মত উভয়ে ডুবাতে ডুবাতে দুই-তৃতীয়াংশ অস্ত্র উদ্ধার করলেন কিন্তু লাশ পাওয়া গেল না। ছায়েমা বলল, "ভাইজান! আশেপাশে লাশ তালাশ করা দরকার। হয়ত পেয়েও যেতে পারি।"

হামিদ জায়ী আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, "মুহতারাম আমীর সাহেব! এতগুলো অস্ত্র অধিক সময় নদী-তটে ফেলে রাখা ঠিক হবে না। যে কোন মুহূর্তে যে কোন দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। অতএব এখনই অস্ত্রগুলো নিরাপদ স্থানে নিয়ে হেফাজত করা হোক। উক্ত প্রস্তাব অনতিবিলম্বে পালন

করার জন্য নির্দেশ দিলে পূর্বের মত কাশবন কেটে গাঠুরী বেঁধে, তার ভিতর অস্ত্র লুকিয়ে হামিদ জায়ীর বাড়ি নেয়া হল। এতে বেশ কিছু সময় পেরিয়ে গেল। অতঃপর শ্রমক্লান্ত মুজাহিদরা নদীর তটে বসেই বিশ্রাম নিতে লাগল।

ছায়েমার কথা শুনে হামিদ জায়ী ও আসিফ বলে উঠলেন, "হ্যাঁ তা সত্য। আমীর সাহেবের নির্দেশ হলে আমরা আরো একটু তালাশ করে দেখতে পারি।" আমি তাদেরকে নির্দেশ দিলে তারা কাশবনে তালাশ করতে লাগল। এরই মধ্যে ইউসুফ কারাজলী প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে গিয়ে কাশবনের গভীরে গিয়েছিলেন। তিনি দু'জন ব্যক্তিকে পাশাপাশি শায়ীত দেখে বিস্মিত হয়ে দৌড়ে এসে আমাকে সংবাদ দিলেন। আমি দ্রুত গিয়ে দেখি সত্যি আমীর সাহেব ও জাফর ভাই আহত অবস্থায় পড়ে আছেন। প্রচুর রক্তক্ষরণের কারণে মরণাপন্ন অবস্থায় পড়ে রইলেন। কিন্তু এখনো জ্ঞান হারায়নি। হামিদ জায়ী দৌড়ে বাড়ি থেকে ভ্যান গাড়ি নিয়ে এলেন। আমরা ধরাধরি করে ভ্যানে তুলে বাড়ি নিয়ে গেলাম। হামিদ জায়ী দৌড়ে গিয়ে ডাক্তার নিয়ে এলেন।

ডাক্তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখলেন, যখম তেমন মারাত্মক নয়। শুধু মাংসপেশীতে আঘাত লেগেছে। তবে দু'একটি গুলীর ছড়া এখনো ভিতরে রয়ে গেছে। ডাক্তার সাহেব নরমাল অপারেশনের মাধ্যমে ছড়াগুলো বের করে ব্যাণ্ডিস করে ঘা শুকানোর ও বেদনা নিরসনের জন্য উন্নতমানের ঔষধ দিলেন। আর শক্তির জন্য ইঞ্জেকশন ও অন্যান্য ঔষধ দিলেন। ডাক্তার সাহেব বললেন, "এসব ঔষধ নিয়মিত ব্যবহার করলে দু'সপ্তাহের মধ্যেই চলাফেরা করতে পারবেন।"

ডাক্তার হামিদ জায়ীর নিকট রোগীদের সার্বিক অবস্থা জানার পর চিকিৎসা বাবদ একটি পয়সাও গ্রহণ করেননি বরং পথ্যের জন্য আরো একশ ডলার দিয়ে গেলেন এবং বললেন, "এক সপ্তাহ পর এসে সেলাই কেটে যাব, আপনারা কোন চিন্তা করবেন না।"

আমরা সবাই মিলে রোগীদের সেবাযত্ন করতে লাগলাম। দু'তিন দিন অতিবাহিত হওয়ার পর ছায়েমা জাফর ভাইকে তাদের আহত হওয়ার

ঘটনা জিজ্ঞাসা করলে জাফর ভাই বললেন, "সারাদিন আমরা তোমাদের অপেক্ষায় নদীতে মাছ ধরার ছলে ঘোরাফেরা করছিলাম। আমরা যদি কোন খালে নোঙ্গর ফেলি তবে তোমরা খুঁজে পাবে না মনে করে নদীতেই রয়ে গেলাম। আমরা মাগরিবের নামায আদায় করে ছৈ-এর ভিতর বসে তাছবিহাত আদায় করছিলাম। এমন সময় দু'দিক থেকে প্রচণ্ড আওয়াজে গুলী আসতে থাকে। দুঃখের বিষয় জবাব দেয়ার মত কোন মওকা আমাদের ছিল না। প্রথমেই আমরা যখমী হয়ে লুটিয়ে পড়লাম। এরই মধ্যে নৌকা তলিয়ে যাচ্ছিল। আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আমরা নদীতে ডুব দিয়ে অনেক দূরে গিয়ে একটু নাক ভাসিয়ে শ্বাস নিলাম। অন্ধকার থাকার দরুণ দুশমন আমাদেরকে চেক দিতে পারেনি। এভাবে একটু দূরে গিয়ে ক্রুলিং করে কাশবনের অভ্যন্তরে আশ্রয় নেই। শরীর দুর্বল হয়ে যাওয়ার কারণে অন্য কোথাও যেতে পারিনি। এভাবেই রাতটি কাটিয়ে দিলাম।"

জাফর ভাই এর কথা শুনে ছায়েমা গেয়ে উঠল ঃ

"কাদেরে কুদরত তু দারী হারচে খাহি আঁকুনী

মুর্দারাতু জানে বখশী জিন্দারা বে জাঁকুনী।"

অর্থাৎ ঃ আল্লাহ্ তা'আলা এভাবেই তাঁর কুদরত প্রকাশ করে থাকেন যে, তিনি মৃতকে জীবন দান করেন ও জ্যান্তকে দান করেন মওত। আল্লাহর কারিশমা বোঝার সাধ্য কার আছে?

রোগীদের সেবা যত্নে এক সপ্তাহ চলে গেল। আল্লাহ্র রহমতে ওঁরা পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেন। এবার সবাইকে বলশেবিকদের কেল্লায় আক্রমণের সিদ্ধান্ত দিয়ে আমি হামিদ জায়ীকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি বলসেবিক বা লাল ফৌজের আস্তানার সন্ধান দিতে পারবেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, দিতে পারব। উসান্দাভী থেকে ৫ কিলোমিটার উত্তরে ক্লোফিউট থানা শহর। সেখানে ৪/৫ হাজার ফৌজের মিনি সেনানিবাস। ওরা ওখান থেকেই এসে এখানে আক্রমণ করেছিল। ক্লোফিউট কিভাবে যেতে হয়, সে রাস্তার সন্ধান হামিদ জায়ীর কাছ থেকে জেনে নিলাম।

রাত অনেক হয়েছে। খানাপিনা ও নামায এখনো আদায় করতে পারিনি। আমীর সাহেবের নির্দেশক্রমে হামিদ জায়ী খানা এনে হাজির করলেন। আমরা খানাপিনা সেরে নামায আদায় করে পাহারাদারী বন্টন করে ঘুমিয়ে পড়লাম।

[বাইশ]

মোরগ ডাকছে। ডালিম শাখে বসে শীষ দিচ্ছে দোয়েল। কাক উড়ে উড়ে ভোরের পূর্বাভাস ছড়িয়ে দিচ্ছে প্রকৃতিতে। আমরা ঘুম থেকে উঠে অযু-এস্তেঞ্জা সেরে নামায আদায় করলাম।

আমীর সাহেব আমাকে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা দিয়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য যেতে হুকুম দিলেন। এদিকে হামিদ জায়ী এসে বললেন, এত সকালে কিছু না খেয়ে বের হওয়া ভাল নয়। এই বলে তিনি ঘর থেকে খানা নিয়ে আসলেন। আমি একাই খেয়ে বিদায় নিলাম।

ছায়েমা বেশকিছু পথ আমাকে এগিয়ে নিয়ে চলল। চোখ তার ভেজা, চেহারা মলিন। কি যেন হারাতে বসেছে মেয়েটি। আমি তার গতিবিধি লক্ষ্য করে বললাম, আর এস না। অনেক পথ এগিয়ে এলে যে? এখন ফিরে যাও। তার চোখে অশ্রু ঝরছে। সে অবুঝ বালিকার মত বলে উঠল, তুমি আমার কোন খবরই নিচ্ছ না। মনে হচ্ছে এড়িয়ে চলতে চাও। একান্তে কথা বলারও কোন ফুরসত মেলেনি।

আমি বললাম, তাহলে কি প্রোগ্রাম বাতিল করব?

সে বলল, আমি তা বলেছি নাকি? এগুলো বলছ যে? তারপর আমার হাত ধরে বলল, খোবায়েব ভাইয়া! তোমাকে আল্লাহর কুদরতী হাতে সোপর্দ করলাম। তাছবীহাত খুব বেশী বেশী পড়বে।

এই বলে সে রাস্তার পাশে থেমে গেল।

আমি একা একা পথ চলছি। দু'তিনটি পাড়া অতিক্রম করেই নদী পেলাম। খেয়া পার হয়ে খানিকটা পূর্বদিকে গিয়ে পেলাম উসন্দাভী বাজার। এখান থেকে সোজা উত্তর দিকে চলে গেছে ক্লোফিউটের পিচঢালা মহাসড়ক। অগণিত গাড়ী-ঘোড়া আসা-যাওয়া করছে। রাস্তার পাশে একটু দাঁড়িয়ে থাকার পর এক টাঙ্গাওয়ালা ডাকছে ক্লোফিউট। আমি টাঙ্গায় গিয়ে বসতেই যানটি খট খট করে এগিয়ে চলতে শুরু করল। বেলা দু'টোর দিকে টাঙ্গা আমাকে

ক্রোফিউট শহরে নামিয়ে দিল।

ক্রোফিউট একটি থানা শহর। প্রাকৃতিক দৃশ্য খুবই সুন্দর ও মনোরম। শহরটি বেশ পরিচ্ছন্ন। শহরের পূর্বদিকে রয়েছে পাহাড়ী এলাকা, ঘন বন-জঙ্গল। ছায়াঢাকা পাহাড়ের পাদদেশেই গড়ে উঠেছে সেনানিবাস। টাঙ্গা স্টেশন থেকে পায়ে হেঁটে মাত্র দু'তিন মিনিটের পথ।

তথ্য সংগ্রহের জন্য হয়ত দু'তিন দিন সময় লাগবে। তাই যেখানে সেখানে থাকা ঠিক হবে না ভেবে এক আবাসিক হোটেলে গিয়ে উঠলাম। হোটেল ম্যানেজার আমাকে খুব খাতির-তওয়াজ দেখালেন। আমি তার ব্যবহারে যারপরনাই আনন্দিত হলাম। তিনি আমাকে এক মনোরম কক্ষে নিয়ে গেলেন এবং তালা-চাবি বুঝিয়ে দিয়ে বললেন, ভাই, যতদিন ইচ্ছে আপনি এখানে অবস্থান করুন। আশা করি কোন অসুবিধা হবে না। আমি আপনার খেদমতে নিয়োজিত আছি। কোন অসুবিধা হলে দয়া করে জানাবেন।

লোকটি আমাকে রেখে চলে গেলেন। আমি অযু-এস্তেঞ্জা সেরে নামায পড়ে বসে আছি। কিছুক্ষণ পর নিজেই একজন মেসিয়ারসহ খানা নিয়ে এলেন। আমি খানা খেয়ে বিশ্রামের উদ্দেশ্যে খাটে শুয়ে পড়লাম। দু'ঘন্টা বিশ্রাম করে আসরের নামায পড়ে রুমে তালা লাগিয়ে শহরে বের হলাম।

ছোট শহর। সবটুকু ঘুরে আসতে মাত্র দু'ঘন্টা লাগল। মাগরিবের নামায পড়ে আবার বেরুলাম ছোট ছোট অলি-গলি ঘুরে দেখতে। দু'টো মসজিদ দেখতে পেলাম। কিন্তু এগুলোতে নামায পড়া হয় না বলে মনে হল। একটি মসজিদে দেখলাম, সন্ধ্যার পরপরই যুবক-যুবতীরা অর্ধনগ্ন অবস্থায় এসে ভীড় জমাচ্ছে। ঢলাঢলি-মাখামাখি করছে। এ ধরনের কুকীর্তি ইতিপূর্বে আমি কখনো দেখিনি। তাই চোখ বন্ধ করে হোটেলে ফিরে এলাম।

আমি একা একা নামায পড়ে বসে চিন্তা করছি, কিভাবে কি করা যায়। এমন সময় ম্যানেজার এসে আমার কক্ষের দরজায় দাঁড়িয়ে বললেন, আস্‌সালামু আলাইকুম, আসতে পারি ভাই? আমি বিস্ফারিত নেত্রে ম্যানেজারের দিকে তাকিয়ে রইলাম। ম্যানেজার আবার আমাকে প্রশ্ন করলেন, কি ভাই! অমন করে ডাগর দু'টি আঁখি মেলে ফ্যাল ফ্যাল

দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন যে? ম্যানেজার আমাকে চুপি চুপি বললেন, ভাই! আমি জামেউল উলুমের মেশকাত জামাতের ছাত্র ছিলাম। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, আজ আমি এখানে। এই বলে সে আমাকে জিজ্ঞেস করল, আমাদের কোন খবর শুনেননি ভাই? আমি বললাম, না তেমন কিছু জানি না। তারপর ম্যানেজার বলতে লাগল, মাদ্রাসা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর আমি বাড়ীতে চলে আসি। তার কিছুদিন পর আমরা বলসেভিকদের নির্মম অত্যাচারের শিকার হই। কারণ, আমাদের গ্রামে একমাত্র দ্বীনদার পরিবার বলতে আমাদের পরিবারটিই ছিল। আর মাওলানা বাড়ী হিসেবে আমাদের বাড়ীই প্রসিদ্ধ। গ্রামের অন্যান্য মুসলিম পরিবারগুলো অনেক আগেই কমিউনিজম ধর্ম গ্রহণ করেছে। একমাত্র আমরাই এ কুফরী মতবাদ মেনে নিতে পারিনি। তাই ওরা আমার আব্বা ও বড় ভাইকে শহীদ করে দিয়েছে। দু'বোনকে বলসেভিকরা ধরে নিয়ে গেছে। আমি বাড়ীতে ছিলাম না বিধায় বেঁচে গেছি। তারপর থেকে বাড়ী ছেড়ে অনেক ঘোরাফেরা করে ক্লোফিউট শহরে এসে জীবন বাঁচানোর তাগিদে সামান্য বেতনে হোটেলে চাকুরী নেই।

আমিও তার নিকট আমার ও ছায়েমার করুণ কাহিনী তুলে ধরলাম। এভাবে উভয়ে অনেক ঘাত-প্রতিঘাত, জুলুম-নির্যাতনের আলাপ-আলোচনা করলাম। হঠাৎ জিজ্ঞেস করলাম, ভাই আপনার নামটা জানি কি? তিনি বললেন, জায়েদ বিন দেলোয়ার। নাম বলার সাথে সাথে আমি তাকে চিনে ফেললাম।

তিনি ক্লোফিউটে আমার আগমনের কারণ জিজ্ঞেস করলে আমি তাকে সব ঘটনা ও উদ্দেশ্য খুলে বললাম। জায়েদ আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করলেন, একি বলছ খোবায়েব ভাই! চার-পাঁচজন লোক একটা সেনানিবাস হামলা করে বিজয়ী হতে চাও! আমি জায়েদের প্রশ্নের উত্তরে আল্লাহ বাণী শোনালাম-

"যুদ্ধ কর ওদের (কাফেরদের) সাথে, আল্লাহ তোমাদের হস্তে তাদের শাস্তি দেবেন। তাদের লাঞ্ছিত করবেন, মুসলমানদের অন্তরসমূহ শান্ত করবেন।" (সূরা তওবা ঃ আয়াত ১৪)

আমার কথা শুনে জায়েদ অবাক হয়ে বললেন, আচ্ছা, তুমি

তোমার জরিপ রিপোর্ট তৈরি কর। যতদিন ইচ্ছে এখানেই থাকবে, ভাড়া দিতে হবে না।

তার কথায় আমি আশ্বস্ত হলাম। তারপর খানা খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।

রজনীর শেষ প্রহরে উঠে কয়েক রাকাত নামায আদায় করে দোআ করলাম। তারপর ফজর পড়ে প্রায় তিন পারা কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করে হাল্কা নাস্তা খেয়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য বের হলাম। সেনানিবাসের ফটকগুলো প্রথমে দেখে নিলাম। তারপর আস্তে আস্তে প্রধান গেটে এসে হাজির হলাম। দ্বাররক্ষী আমার পরিচয় চাইলে মার্শাল বোদায়েভের লেখা ও অন্যান্য জেনারেলদের দেয়া পরিচয়পত্র বের করে দিলাম। দ্বাররক্ষী তন্ন তন্ন করে উল্টিয়ে পাল্টিয়ে সব দেখে ভেতরে যেতে এজাজত দিল।

আমি ভেতরে প্রবেশ করতেই আর একজন সৈন্য দৌড়ে এলেন। তিনি পরিচয়পত্রটি দেখে নিয়ে গেলেন ব্রিগেডিয়ার ক্লাইভউয়ের নিকট। তিনিও পরিচয়পত্র দেখলেন। মিস্টার ক্লাইভউয়ে একজন বড় মাপের নাস্তিক। অনেক মুসলমানের ঘাতক। তিনি আমার আপাদমস্তক তীক্ষ্ণ নজরে দেখলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, হে যুবক! তোমার পূর্ণ পরিচয় দাও।

আমি বললাম, নাম মিস্টার ব্রাট। বাড়ী জামবুল। কলেজে পড়ি। আমি বলসেভিকদের একজন অনুরাগী। কমিউনিস্ট পার্টি করি।

ব্রিগেডিয়ার ক্লাইভউয়ে আবার আমাকে প্রশ্ন করলেন, মিস্টার ব্রাট! তুমি কখন থেকে কমিউনিস্ট পার্টি ভালবাস?

আমি উত্তর দিলাম, স্যার, শুরু থেকেই। এর উপর আমি অনেক বই-পুস্তক পড়েছি। তারপর থেকে এ পার্টিকে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি।

ব্রিগেডিয়ার আবার প্রশ্ন করলেন, তুমি কি এখানে চাকুরী করবে?

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কি চাকুরী স্যার?

তিনি বললেন, বাবুর্চির চাকুরী।

আমি বললাম, আমি রান্না করতে জানি না স্যার।

তিনি বললেন, শিখে নেবে।

আমি বললাম, না স্যার, আমি ওসব পারব না।

তিনি বললেন, তবে এখানে এলে যে?

আমি বললাম, স্যার, আপনাদেরকে দেখতে এসেছি, আর অবসর সময়টা ভ্রমণ করে কাটাতে এসেছি।

তিনি বললেন, আচ্ছা, তাহলে ঘুরেফিরে দেখ।

এর মধ্যে এক সিপাই চা-বিস্কুট নিয়ে এল। চা-নাস্তা করে ব্রিগেডিয়ারকে বললাম, স্যার, আপনাদের বাগান দেখতে ইচ্ছা করছে। বললেন, হ্যাঁ, ঘুরে দেখ। আমি নির্বিঘ্নে ঘুরেফিরে সব অবলোকন করতে লাগলাম। অফিসার কোয়ার্টার, অস্ত্র গোডাউন, তেলের ডিপো, বিদ্যুৎ বিতরণ কেন্দ্র, ওয়ারলেস টাওয়ার ইত্যাদি স্থাপনাগুলোর অবস্থান খুব পরখ করে দেখে নিলাম। কোন্টার দূরত্ব কতটুকু তাও একটা অনুমান করে নিলাম।

ভেতরের দিক জরিপ করে শেষ করতে প্রায় দু'ঘন্টা সময় লাগল। এখন বাহির দিকটা দেখে নেয়া দরকার। তাই পূর্বদিকের ফটক দিয়ে বের হয়ে দুর্গম পাহাড়ের দিকে চলছি। সামনে অগ্রসর হয়ে দেখলাম, দু'টি চৌকি রয়েছে পাহাড়ে। প্রতি চৌকিতে পাহারাদার মাত্র দু'তিনজন করে। ওদের অস্ত্রগুলোও নড়বড়ে, তেমন শক্তিশালী নয়। পাহাড়ের গায়ে কৃষ্ণশিলাগুলো বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। ছোট-বড় অনেক পাথরই রয়েছে! এসব এলাকায় যুগ যুগ ধরে কোন মানুষ চলাফেরা করে না বলেই মনে হল।

একেতো পাহাড়ী পথ, তার উপর সামরিক এলাকা। এসব স্থানে সাধারণ মানুষের চলাফেরা নিষিদ্ধ। আমি অল্পক্ষণের মধ্যেই অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে তথ্য সংগ্রহের কাজ সম্পন্ন করে ক্যান্টনমেন্ট ত্যাগ করলাম। বেলা দু'টোয় হোটেলে এসে গোসল করে খানা ও নামায সেরে নিয়ে বিছানায় গা এলিয়ে আক্রমণের পরিকল্পনা করছি।

জায়েদ বিন দেলোয়ার আমার রুমে প্রবেশ করে জিজ্ঞেস করলেন, খোবায়েব! ঘুমাচ্ছেন কি? আমি শোয়া থেকে উঠে বললাম, জ্বি না। বলল, মকছুদ হাসেল হয়েছে কি? বললাম, হ্যাঁ আল্লাহর শোকর, উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। তারপর বললাম, ভাই জায়েদ! আমি প্রত্যুষে চলে যাব, দোয়া করবেন, আল্লাহ যেন আমার মিশনকে সফল করেন এবং আমি বর্বরদের টুটি চেপে ধরতে পারি। কমিউনিজমের কবর রচনা করে খেলাফত প্রতিষ্ঠা করতে পারি। জায়েদ বলল, আমীন।

জায়েদ বিদায় হল। আমি দরজা বন্ধ করে ঘুমিয়ে পড়লাম।

ভোরে উঠে নামায সেরে চাবি ম্যানেজার জায়েদকে বুঝিয়ে দিলাম। তিনি আমাকে কিছুদূর পথ এগিয়ে দিলেন। টাঙ্গায় উঠার পূর্বে পকেট থেকে ৫ হাজার টাকা বের করে বললেন, ভাই এ টাকাগুলো জিহাদ ফান্ডে দান করলাম। প্রয়োজনে খরচ করবেন। আমি আল্লাহর শোকর আদায় করে বিদায় নিলাম।

সকাল দশটার দিকে কৃষক হামিদ জায়ীর বাড়ীতে এসে পৌঁছলাম। আমার আগমনের সাথে সাথে আমীর সাহেব, জাফর ভাই, ছায়েমা, আবদুর রশীদ, আসিফ ও ইউসুফ কারাজলী ছুটে আসলেন খবর শোনার জন্য। ছায়েমা হামিদ জায়ীকে বলল, যদি খানা থাকে, তাহলে নিয়ে আসুন, মুসাফির খুব ক্লান্ত। হামিদ জায়ী খানা আনতে গেলেন।

আমি আমীর সাহেবের শারীরিক অবস্থা জেনে খুব খুশী হলাম। এত অল্প সময়ে তারা এতটুকু সুস্থ হবেন কল্পনাও করতে পারিনি। তারপর এক এক করে পুরো সফরের বর্ণনা দিলাম এবং জরিপ রিপোর্ট পেশ করলাম। আমীর সাহেব ও জাফর ভাই জরিপ রিপোর্টের উপর পূর্ণ মেধা খরচ করে গবেষণা চালালেন। কৃষক খানা নিয়ে আসলে আমি খেয়ে নিলাম।

আমীর সাহেব আমার নকশা অনুযায়ী আক্রমণের গ্রুপ রচনা করলেন। আমাকে আমীর নিযুক্ত করে কার কি দায়িত্ব তা বন্টন করে বুঝিয়ে দিলেন। কার আক্রমণের বস্তু কোন্‌টি হবে, তাও বলে দিলেন। কাকে কি হাতিয়ার দেয়া হবে, কে কোন্‌ দিকে থাকবে এসব বারবার বুঝিয়ে বললেন। তারপর আক্রমণের ধরণ কি হবে, তা নিয়েও পরামর্শ চাইলেন। সকলেই নিজ নিজ যুক্তি দেখিয়ে মতামত ব্যক্ত করলাম। এর মধ্যে ছায়েমার পরামর্শ সকলের নিকট বেশী পছন্দ হল। আমীর সাহেব তার উপরই ফয়সালা দিলেন।

ছায়েমার পরামর্শ হল, আমাদের হাতে রয়েছে ১২টি রকেট আর ৩টি লাঞ্চার। আমরা যদি পাহাড়ের নিরাপদ স্থান থেকে একসাথে আক্রমণ করে অফিসার কোয়ার্টার, তেলের ডিপো, ট্রান্সফরমার, ওয়ারলেস টাওয়ার ও গোলা-বরুদের ডিপো ধ্বংস করে দিতে পারি,

তবে ওরা পাগল হয়ে দিগ্বিদিক ছুটতে শুরু করবে। আমাদের অন্য সাথীরা যদি এসএলআর, এলএমজি ও ক্লাসিনকভ দিয়ে ব্রাশফায়ার আরম্ভ করে, তবে সেনানিবাস বলতে কিছুই থাকবে না। পরদিন এটা হবে সাংবাদিক আর ফটোগ্রাফারদের চারণভূমি। আমাদের এ আক্রমণ ১৫ থেকে ২০ মিনিট স্থায়ী হতে পারে। ছায়েমার এ পরামর্শে আমীর সাহেব খুব খুশী হলেন এবং বললেন, তোমার পরিকল্পনার কাছে বড় বড় সেনাপতিরাও হার মানবে।

আমীর সাহেব পরামর্শ দিলেন, রাত ১১টায় তোমাদের বেরিয়ে পড়তে হবে। পাঁচ-সাত কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেবে। তারপর রাত দু'টো কি তিনটার দিকে আক্রমণ করবে। মহাসড়কে প্রায়ই পুলিশের পাহারা থাকে এবং সারারাত যানবাহন চলাচল করে। তাই পায়ে চলা মেঠো পথে পদব্রজে পথ চলতে হবে। আমীর সাহেবের কথা শিরোধার্য।

আমি ছায়েমাকে নিয়ে অস্ত্রগুলো খুলে খুলে সুন্দরভাবে মুছে গানঅয়েল লাগিয়ে ঠিকঠাক করে নিলাম। অস্ত্র খোলা, মোছা ও ফিট করা শিখিয়ে দিলাম হামিদ জায়ী, আসিফ, আবদুর রশীদ ও ইউসুফ কারাজলীকে।

রাত ১০টা। হামিদ জায়ী খানা নিয়ে আসলেন। আমরা সবাই খানা খেয়ে নিলাম। তারপর আমীর সাহেব আমাকে বললেন, তোমার সাথে থাকবে, ছায়েমা ও আবদুর রশীদ। তোমরা থাকবে তারুজী গ্রুপে (আক্রমণকারী দলে)। আর আসিফ ও ইউসুফ থাকবে প্রতিরক্ষা দলে।

আমীর সাহেব আমার গ্রুপে দিলেন ৩টি লাঞ্চার ও ৬টি রকেট। আসিফ ও ইউসুফ কারাজলীকে দিলেন ২টি এসএলআর ও তিনশ' রাউন্ড গুলী। তাছাড়া প্রত্যেককেই ৩টি করে গ্রেনেড ও ২টি মাইন দিয়ে বললেন, হে আমার প্রাণপ্রিয় মুজাহিদ সাথীরা! তোমরা পবিত্র কালামের বাণী সবসময় স্মরণ রাখবে। আল্লাহ ইরশাদ করেছেন–

"আর তাদের সাথে (কাফেরদের সাথে) যুদ্ধ করতে থাক, যতক্ষণ না ভ্রান্তির অবসান ঘটে এবং আল্লাহর সমস্ত বিধান প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। আল্লাহ তাদের কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ করেন।" (সূরা আনফাল ঃ আয়াত ৩৯)

তিনি আরো বললেন, হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত। আমাদের প্রিয়নবী (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর রাহে যখমী হয়েছে, আল্লাহই ভাল জানেন তার রাহে কে যখমী হয়েছে, সে কিয়ামতের দিন এভাবে উপস্থিত হবে যে, তার যখম থেকে রক্ত ঝরতে থাকবে। তার রং হবে রক্তের কিন্তু ঘ্রাণ হবে মেশকের।" (বুখারী, মুসলিম)

কাজেই তোমরা দুর্বার গতিতে আক্রমণ করবে। প্রয়োজনে যখমী হবে, শহীদ হবে, তবু বিজয় অর্জন না করে পিছপা হবে না। আমীর সাহেব দোয়া করে, সালাম-মুসাফাহা করে আমাদেরকে কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে বিদায় জানালেন।

আমরা নদী পার হয়ে সোজা পূর্বদিকে প্রায় দু'কিলোমিটার পথ ঝোঁপ-ঝাঁড়ের ভেতর দিয়ে অতিক্রম করলাম। তারপর উত্তর দিকে চলছি। দু'তিন ঘন্টা হাঁটার পর সেনানিবাসের বাতিগুলো দেখতে পেলাম। বাতিগুলো ঝলমল করে জ্বলছে। আরো একটু হেঁটে পাহাড়ের গা বেয়ে অতিকষ্টে সেনানিবাসের নিকট পৌঁছলাম। সেখানে গিয়ে সামান্য নাস্তা-পানি খেয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে শরীরটা চাঙ্গা করলাম।

আমরা প্রথমে যেখানে অবস্থান নিলাম, সেখান থেকে আক্রমণ সুবিধাজনক মনে হল না, তাই সবাইকে এখানে বসিয়ে আমি ক্রলিং করে ঘুরে ঘুরে কে কোথায় পজিশন নেবে তা নির্ণয় করে আসলাম। তারপর একজন একজন করে সাথীদের নিয়ে বড় বড় পাথরের আড়ালে বসিয়ে দিলাম, যাতে সম্মুখ থেকে আক্রমণ করে কিছুই করতে না পারে। সবাইকে বলে দিলাম সতর্ক অবস্থায় থাকতে।

রাত ৩টা। আমরা প্রথম আঘাত হানলাম অফিসার কোয়ার্টার, বিদ্যুৎকেন্দ্র ও অস্ত্র গোডাউনে। দ্বিতীয়বার আঘাত হানলাম তেলের ডিপো, ওয়্যারলেস টাওয়ার ও আর্মি কোয়ার্টারে। সাথে সাথে আগুন ধরে উক্ত স্থাপনাগুলো বিধ্বস্ত হয়ে গেল। ব্যারাকের অন্যান্য ফৌজ দিশেহারা হয়ে এলোপাতাড়ি ছুটাছুটি ও গোলাবর্ষণ করতে লাগল। তেলের ডিপোর আগুন ছড়িয়ে সেনাযানগুলো পুড়ে ছারই হয়ে গেল। অস্ত্র গোডাউনের সংরক্ষিত মাইন, বোমা ও গ্রেনেড ব্রাস্ট হয়ে পুরো এলাকা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। আমরা ব্রাশফায়ার করে বেশকিছু সৈন্য জাহান্নামে পাঠালাম।

দু'দলের গোলাগুলীর আওয়াজে কান ফেটে যাওয়ার উপক্রম। আগুনের লেলিহান শিখায় পুরো এলাকা দিবালোকের মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। বারুদের গন্ধে শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। তবু সাহসিকতার সাথে বীরদর্পে ফায়ার করে করে সামনে এগুচ্ছি। অধিকাংশ সৈন্য পাশের লেকে পরিজশন নিয়েছিল, তা আমরা প্রথমে বুঝতে পারিনি। অনেক সৈন্য পালানোর সময় অস্ত্রও নিয়ে যেতে পারেনি। দু'চারজন যদিও অস্ত্র নিয়েছে, কিন্তু ম্যাগজিনের গুলী ছাড়া অন্য কোন গুলী নিতে পারেনি। আমরা লেকের অদূরে অবস্থান নিয়েছিলাম। হঠাৎ লেকের দিক থেকে গোলাবৃষ্টি আসতে শুরু করলে আমরা একটি পুরাতন দেয়ালের অন্তরালে আশ্রয় নিয়ে ফায়ার আরম্ভ করলাম।

ছায়েমা আসিফের হাত থেকে অস্ত্রটি নিয়ে কয়েকটি রৌশনী গুলী আকাশের দিকে ছুঁড়ে মারল। এতে পুরো আকাশটা আলোকিত হয়ে গেল। এদিকে দুশমনের ম্যাগজিনের গুলী শেষ হয়ে আসছে। তাদের দিক থেকে তেমন ফায়ার হচ্ছে না। তারপর আমরা একটি ব্যারাকে প্রবেশ করে দেখি স্তরে স্তরে সাজানো রয়েছে নানা ধরনের অস্ত্র। এর মধ্যে কিছু ধ্বংস হয়েছে। আরো কিছু অক্ষত অবস্থায় রয়েছে। দু'জনকে প্রতিরক্ষার জন্য রেখে অন্যদেরকে হুকুম দিলাম, তোমরা যা পার গনীমত কুড়িয়ে নাও। আমার হুকুমের সাথে সাথে কেউ হাল্কা মেশিনগান, কেউ পিঠে বহনযোগ্য মর্টার আবার কেউ এসএলআর, রকেটলাঞ্চার ও গোলাবারুদ নিয়ে ফায়ার করতে করতে সংরক্ষিত এলাকা পেরিয়ে পাহাড়ে চলে আসলাম।

রাত তেমন বাকী নেই। ছুবহে সাদেক অতি নিকটে। এ সময় লোকালয়ে বের হওয়া ঝুঁকিপূর্ণ। অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এত অল্পসময়ে গন্তব্যে যাওয়া সম্ভব নয়। তাই পাহাড়ের জঙ্গলে দিনটি কাটাতে সিদ্ধান্ত নিলাম। আমরা কয়েকটি ছোট টিলা পেরিয়ে গভীর বনভূমিতে বড় একটি বৃক্ষের নীচে অবস্থান নিলাম।

সকলেই ক্লান্ত, ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর। পা সামনে এগুচ্ছে না। শরীর কাঁপছে। অল্পসময়ে ফিরে আসব মনে করে খানাপিনাও বেশী করে সঙ্গে আনা হয়নি। সামান্য কিসমিস ও কয়েক মুঠো খেজুর ছাড়া কারো কাছে কোন খাবার নেই। ছায়েমা এগুলো বের করে দিলে আমরা

তা খেয়ে নিলাম। সামান্য পানি ছিল। তা দিয়ে এক ঢোক এক ঢোক করে সকলে গলা ভিজিয়ে নিলাম। তারপর ফজরের নামায আদায় করে সবাইকে ঘুমানোর নির্দেশ দিলাম।

সবাই শুয়ে ঘুমাচ্ছে। আমি ঘুরেফিরে সাথীদের হেফাজতের জন্য পাহারা দিচ্ছি।

জঙ্গলটি যদিও পরিত্যক্ত, তবু মানুষের আনাগোনার যথেষ্ট আলামত বিদ্যমান। কিছু পলিথিনপেপার ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আছে। ম্যাচ ও সিগারেটের ফেলে দেয়া অংশ ও কর্তিত বৃক্ষ নজরে পড়ল। এতে মনে হল কোন কাঠুরিয়া বা দস্যু এসব স্থানে চলাফেরা করে। এখানে বেশী সময় অবস্থান নেয়া ঠিক হবে না মনে করে স্থান পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিলাম।

নতুন স্থানের সন্ধানে আমি সাথীদেরকে ঘুমন্ত অবস্থায় রেখে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে দক্ষিণ-পূর্বদিকে এগিয়ে গেলাম। সেখানে একটি গুহার সন্ধান পাওয়া গেল। গুহাটি তেমন ছোট নয়। তবে আবর্জনায় ভরা। গুহার সামনে বিশালাকার একটি কৃষ্ণশিলা পড়ে আছে। মনে হল গুহাবাসীর হেফাজতের জন্য অনেক আগেই কে যেন তা রেখে দিয়েছে। এ যেন আল্লাহর এক কুদরতী আয়োজন। আমি ভয়ে ভয়ে গুহাভ্যন্তরে প্রবেশ করে কিছু পরিষ্কার করে নিলাম। তারপর সাথীদের কাছে গিয়ে তাদেরকে ঘুম থেকে জাগিয়ে মালামালসহ গুহায় নিয়ে আসলাম।

কিছুক্ষণ পরই মর্টারের এক গোলা এসে পূর্বের বিশ্রামের স্থানে বিস্ফোরিত হল। এখানে আল্লাহর অপার রহস্য ও তার অনুগ্রহ দেখে সবাই সিজদায় পড়ে শোকর আদায় করতে লাগলাম। আহ! অল্পের জন্য আল্লাহ আমাদের হেফাজত করেছেন।

পরপর কয়েকটি গোলাবর্ষণ হয়েছে বটে, কিন্তু আমাদের কোন ক্ষতি করতে পারেনি। সকলে পরিশ্রান্ত। কিন্তু ঘুমানোর সাহস কারো নেই। বসে বসে আল্লাহর গুণ-কির্তনে সময় অতিবাহিত করতে লাগলাম। পানির পিপাসায় কাতর হয়ে অনেকেই বৃক্ষপত্র চিবিয়ে রসপান করে জঠর জ্বালা নিবারণ করল।

সূর্যটা পশ্চিম আকাশে রক্তিম আভা ছড়িয়ে পালানোর আয়োজন করছে। আমরা পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিলাম, বাদ মাগরিব গুহা ত্যাগ

করে গন্তব্যের দিকে এগিয়ে যাব। মাগরিবের নামাজ পড়ে নিজ নিজ ছামানা নিয়ে পাহাড়ের কূল বেয়ে নীচে নেমে এলাম। তারপর আঁকাবাঁকা গ্রাম্য পথ ধরে নদী পার হয়ে কৃষক হামিদ জায়ীর বাড়ীতে গিয়ে হাজির হলাম।

রাত তখন দশটা। হামিদ জায়ী আমাদের অপেক্ষায় বাইরে পায়চারি করছেন। আমাদের পায়ের শব্দ পেয়ে দৌড়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন, এত রাতে কে আপনারা? তার চিরচেনা কণ্ঠ কানে আসতেই উত্তর দিলাম, আপনার মোসাফির ভাই খোবায়েব। আবেগাপ্লুত কণ্ঠে তিনি বলে উঠলেন, ওহ! খোবায়েব ভাই! তুমি ফিরে এসেছ? তোমার চিন্তায় আজ দু'দিন যাবৎ খানাপিনা কিছুই পেটে ঢুকছে না। বলতে বলতে তিনি আমাদেরকে বাড়ির ভেতর নিয়ে গেলেন। সেখানেও দেখি সবাই জেগে আছে। হামিদ জায়ী অযুর পানি এগিয়ে দিয়ে খানা এনে হাজির করলেন। আমরা তৃপ্তি সহকারে খানা খেয়ে নামায আদায় করলাম।

আমি আমীর সাহেব ও জাফর ভাইয়ের শারীরিক অবস্থা জানতে চাইলে আমীর সাহেব বললেন, আল্লাহর খাছ মেহেরবানীতে দু'দিনে একেবারেই সুস্থ হয়ে উঠেছি। খানাপিনা করতে পারছি। একটু একটু হাঁটতেও পারছি। শরীরের সবগুলো ঘা শুকিয়ে গেছে। জাফর ভাইয়ের অবস্থাও ভাল।

তাদের অবস্থা জেনে আমি আল্লাহর শোকর আদায় করলাম।

আমীর সাহেব ও অন্যান্য সাথীরা হামলার কারগুজারী শোনার পর আমার মুখপানে চেয়ে আছেন। আমি এক এক করে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত ঘটনাবলী ও খোদায়ী মদদের কথা বর্ণনা করলাম। সকলেই মহা আনন্দে দু'রাকাত করে নামাজ পড়ে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল।

রাত প্রায় ১টা বাজে। ঘুমের আক্রমণে সকলের চোখ ছোট হয়ে আসছে। আমীর সাহেব সবাইকে ঘুমানোর এজাজত দিলেন। আমরা সবাই ঘুমিয়ে পড়লাম। বাকি রাত জাফর ভাই ও আমীর সাহেব ভাগাভাগি করে পাহারা দিলেন।

কিছুক্ষণ পরেই তুলহে ছাদিকের আঁধার কেটে ভোরের সূর্য রক্তিম

আভায় পূর্বাকাশ রাঙিয়ে তুলছে। পাখিরা পালক ঝেড়ে আপন আপন গান ধরছে। শিশিরভেজা বৃক্ষের শাখায় বুলবুলি, দোয়েল, শ্যামা, পাপিয়ারা নাচানাচি করছে। পাখ-পাখালির কলকাকলিতে আমাদের ঘুম ভেঙ্গে গেল। আমরা ফজরের নামায আদায় করে তাছবীহাত পড়তে লাগলাম। প্রায় এক ঘন্টাকাল বিভিন্ন আমলে কাটিয়ে দিলাম।

[তেইশ]

তাছবীহ-তাহলীলের পর আমীর সাহেব সবাইকে নিয়ে পরামর্শে বসলেন। তিনি একজন একজন করে প্রত্যেকের কাছে পরামর্শ চাইলেন। সকলেই যার যার খেয়াল পেশ করলেন। সকলের মতামতের পর ছায়েমার বলার পালা। ছায়েমা তার যুক্তিগুলো উপস্থাপন করে মত প্রকাশ করতে লাগল। সে বলল, মোহতারাম আমীর সাহেব! সেনানিবাস আক্রমণ সাধারণ বিষয় নয়। এটা কোন পুলিশ ফাঁড়ি, থানা বা সাধারণ ছাউনি নয়। সেনানিবাসে আক্রমণ করা বিশাল সামরিক শক্তির কাজ। তাই এ আক্রমণের খবর শুধু তাজাকিস্তানেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, আশপাশের দেশগুলোতেও ছড়িয়ে পড়বে। কোথা থেকে এ হামলা হয়েছে, তা খুঁজে বের করার জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করা হবে। কাজেই এখান থেকে দ্রুত স্থানান্তরিত হওয়া দরকার।

ছায়েমার পরামর্শ দিক-নির্দেশনামূলক। আমীর সাহেব আর কথা না বাড়িয়ে এর উপরই ফয়সালা দিলেন। আমীর সাহেব, আব্দুর রশীদ, আসিফ ও ইউসুফ কারাজলীকে ২টি রকেটলাঞ্চার, ৪টি রকেট, ৩টি ক্লাশিনকভ, ৩টি এসএমজি দিয়ে বললেন, তোমরা এক্ষুণি নিজ এলাকায় ফিরে যাও। এই বলে তিনি যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ প্রদান করে পবিত্র কালামের বাণী শুনিয়ে দিলেন-

"আর লড়াই কর আল্লাহর পথে তাদের সাথে, যারা লড়াই করে তোমাদের সাথে। অবশ্য কারো প্রতি বাড়াবাড়ি করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না।" (সূরা বাকারা ঃ আয়াত ১৯০)

উক্ত আয়াতে কারীমা সম্পর্কে হযরত রাবি ইবনে আনাস (রাঃ) বলেন, এটাই মদীনা হিজরতের পর সর্বপ্রথম জিহাদের আয়াত। উক্ত আয়াতে আল্লাহ বলেন, বাড়াবাড়ি ও সীমালঙ্ঘন কর না। এর অর্থ হল, কিছু কিছু উপাসনারত সন্নাসী, পাদ্রী, অন্ধ, পঙ্গু, খঞ্জর আর কাফেরদের

অধীনে যারা চাকুরী করে এমন লোকদেরকে হত্যা করা শরীয়তে জায়েয নেই। তাই কেউ যদি এদেরকে হত্যা করে, তবে এটাই হবে বাড়াবাড়ি বা সীমালজ্ঘন। কিন্তু উল্লেখিত লোকেরা যদি মুসলমানদের বিরুদ্ধে সম্মুখসমরে অবতীর্ণ হয়, তবে তাদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করতে হবে।

আমীর সাহেব আরো বললেন, আমাদের প্রিয়নবী (সাঃ) বলেছেন, হযরত আমর ইবনুল হামক (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি নবী করীম (সাঃ)কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কাউকে জীবনের নিরাপত্তা দেয়ার পর তাকে হত্যা করবে, কিয়ামতের দিন তাকে বিশ্বাসঘাতকের ঝাণ্ডা দেয়া হবে।

আমীর সাহেব হামিদ জায়ীকে ডেকে বললেন, এসব ছামানা নিয়ে দিনের বেলা কিভাবে যেতে পারে, তার একটা সুব্যবস্থা করে দাও। হামিদ জায়ী বিদায়ী কাফেলাকে খানা খাওয়ালেন। তারপর ভ্যান গাড়ীতে করে গমের আঁটি ভর্তি করে তার ভেতর সবগুলো অস্ত্র লুকিয়ে রেখে আস্তে আস্তে পথ চলতে শুরু করলেন।

আবদুর রশিদ, আসিফ ও ইউসুফ কারাজলীর জন্য এলাকার যুবকরা যারপরনাই পেরেশানীতে দিন-রাত অতিবাহিত করছে। দিন-রাত পথপানে চেয়ে আছে আগমনের অপেক্ষায়। বিকেল দু'টোর মধ্যে আবদুর রশীদ তার সাথীদের নিয়ে বাড়ীর দহলিজে হাজির। মুহূর্তের মধ্যে সংবাদ ছাড়িয়ে পড়ল সবখানে। যেন কোন নকীব বার্তা নিয়ে চোখের পলকে আবাল-বৃদ্ধা-বণিতাদের কানে কানে পৌঁছে দিয়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই বাড়ির আঙ্গিনায় লোকজন এসে ভীড় জমাল।

এদিকে হামিদ জায়ী মালপত্রগুলো গোপন স্থানে নামিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছেন। বেলেন্তিনা ও নাঈমা খাবার এনে হামিদ জায়ীকে দিলে তিনি পেট ভরে খানা খেলেন। তারপর বিদায় নিয়ে মন্থরগতিতে গৃহাভিমুখে যাত্রা করলেন। আবদুর রশীদ সাথীদের নিয়ে খানা খেয়ে যোহরের নামায আদায় করে পনের-বিশ মিনিট বিশ্রাম নিলেন।

আঙ্গিনায় জনতার ঢল নামল। আবদুর রশিদ তাড়াতাড়ি উঠে অন্য দিনের মতো আপেল বাগানের মনোমুগ্ধকর পরিবেশে গিয়ে বসলেন। তারপর উপস্থিত জনতাকে লক্ষ্য করে এক আগুনঝরা বক্তৃতা দিলেন। তিনি বললেন–

হে আমার প্রিয় দেশবাসী! আমরা মুসলমান, দুনিয়াতে আমরা শ্রেষ্ঠ জাতি। আমরা ঈমান নিয়ে বাঁচতে চাই। দেশ ও জাতিকে কমিউনিজমের ছোবল ও নগ্ন আগ্রাসন থেকে বাঁচাতে চাই। হে আমার ভাইয়েরা! এখন আর ঘরে বসে অশ্রু ঝরানোর সময় নেই। আর শুধু দোয়া করেও মুক্তি পাওয়া যাবে না। শুধু দোয়া ও তাছবীহ-তাহলীল দ্বারাই যদি দ্বীন বিজিত হত, তবে মহানবী (সাঃ) দোয়া করেই তামাম জাহান জয় করে ফেলতেন। তিনি জিহাদের ময়দানে গিয়ে রক্ত ঝরাতেন না। প্রিয় সাহাবাদেরকে জিহাদে পাঠিয়ে শহীদ করাতেন না। কাজেই, জিহাদ ছাড়া মুক্তির কোন পথ আল্লাহ এবং তার নবী বাতলিয়ে যাননি। তিনি আরো বললেন, যার কাছে যা আছে, তা নিয়েই বলসেভিকদের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। আল্লাহ মদদ করবেন।

বর্তমানে প্রত্যেক মুসলমানের উপর জিহাদ ফরজে আইন। আমরা অন্য সব জীবের মতো অকাতরে জীবন বিলাতে চাই না। আমরা আল্লাহর পথে আল্লাহর দুমশন নিপাত করতে করতে শাহাদাতের অমৃত সুধা পান করে জান্নাতে ফিরে যেতে চাই। হে আমার বন্ধুরা! মহানবী (সাঃ) বলেছেন, শহীদ হত্যার কষ্ট শুধু এতটুকু অনুভব করে, যতটুকু তোমাদের কেউ পিঁপড়ার কামড়ের ব্যথা অনুভব করে থাকে। (তিরমিযী, নাসায়ী)

অন্য এক হাদীসে মহানবী (সাঃ) ইরশাদ করেন, যে মুসলমান জিহাদের কোন চিহ্ন ব্যতীত আল্লাহর সাথে মিলিত হবে, সে এমতাবস্থায় মিলিত হবে যে, তার মধ্যে এক প্রকার অসম্পূর্ণতা পরিলক্ষিত হবে। (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)

মহানবী (সাঃ) আরো বলেছেন, যে ব্যক্তির দু'পা আল্লাহর রাহে ধূলিমলিন হয়েছে, তাকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না। (বুখারী)

সুবহানাল্লাহ! জিহাদের কত ফজিলত। তাই আসুন, আমরা দলবদ্ধভাবে কুফরী শক্তির বিরুদ্ধে জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়ি।

উপস্থিত জনতা আবদুর রশীদের কথায় একাত্মতা প্রকাশ করলে আবদুর রশীদ জিহাদের উপর বাইয়াত গ্রহণ করেন।

আমীর সাহেব আবদুর রশীদ ও তার সহযোদ্ধাদের বিদায় দিয়ে

আমাদেরকে নিয়ে পরামর্শে বসলেন। ছায়েমা আগে ভাগে আমীর সাহেবের নিকট কিছু বলার অনুমতি চেয়ে বললেন, এসব এলাকায় শত্রুরা সামরিক অভিযান চালাতে পারে। মাত্র ক'দিন আগে তোরা অতর্কিত ভাবে আমাদের নৌকা ডুবিয়ে দিল। আমীর সাহেব ও জাফর ভাই আহত হয়েছেন। আল্লাহ যদি তাদেরকে রক্ষা না করতেন, তবে তো...। এসব এলাকায় যে মুজাহিদদের আনাগোনা রয়েছে, তা তাদের জানা আছে। তার উজ্জ্বল প্রমাণ নৌযানে আক্রমণ। কাজেই, যত শীঘ্র এখান থেকে চলে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

আমীর সাহেব ছায়েমার পরামর্শে একমত না হয়ে পারলেন না। তিনি চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন কিন্তু কোথায় যাবেন, কখন যাবেন, কিভাবে যাবেন- তা নিয়ে বিরাট প্রশ্ন দেখা দিল।

জাফর ভাই পরামর্শ দিলেন, হামিদ জায়ী বাড়ী ফিরলে তাকে জিজ্ঞেস করব, দু'এক কিলোমিটারের মধ্যে তার কোন আত্মীয় আছে কিনা। যদি থাকে, তবে আমরা সন্ধ্যার পরপরই চলে যাব। তিনি আরো বললেন, এখন দিনে আক্রমণের ভয় কম, রাতে আক্রমণ হতে পারে। তাই রাতে অন্যত্র সরে থাকাই যুক্তিযুক্ত মনে করি। জাফর ভাইয়ের কথায় আমিও একমত হলাম।

আমীর সাহেব বারবার ছায়েমার দিকে তাকাচ্ছেন, সে কি বলে শোনার জন্য। ছায়েমা নীরব; মাথা নীচু করে গভীরভাবে কি যেন ভাবছে। আমরাও ছায়েমার কথা শোনার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি। একটু পরে ছায়েমা মাথা উত্তোলন করে এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলল, আমীর সাহেব! আমরা বেঁচে থাকার জন্য দুনিয়াতে আসিনি। আমরা দ্বীনকে বিজয়ী করতে এসেছি। তাই কাফেরদের উপর আক্রমণ করার চিন্তা বাদ দিয়ে প্রাণভয়ে পালানোর চিন্তা করা ঠিক হবে না। এ পর্যন্ত আমরা আল্লাহর অনেক মদদ পেয়েছি। কাজেই আমার পরামর্শ হল, প্রোগ্রাম করে হামলার নকশা তৈরি করা হোক। দুশমনরা আশপাশের গ্রামসহ এসব এলাকায় আক্রমণ করতে পারে। গুপ্তচর এ গ্রামে যে নেই, এমনটা ভাবা ঠিক হবে না। আমাদেব চলাফেরা কেউ লক্ষ্য করেনি এমনও নয়। সংবাদ সেনানিবাসে পৌঁছেছে এটাই সত্য। কাজেই, আমরা হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে পারি না।

আমাদের অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ, মাইন, গ্রেনেড একেবারে কম নয়। তাই আমার পরামর্শ হল, নদীতটে মাইন পুঁতে রাখা হোক। এ গ্রামে ঢুকতে একটি মাত্র রাস্তা। এটা যদি ভালভাবে চেক দিতে পারি, তবে এখানেও ওরা চরম মার খাবে ইনশাআল্লাহ। এখানকার পথঘাট সবই আমাদের পরিচিত।

আমীর সাহেব ছায়েমার ব্যাপক পরিকল্পনা, আলিশান হিম্মত ও বিচক্ষণতার কাছে পরাজয়বরণ করতে বাধ্য হলেন। তিনি একজন উঁচু পর্যায়ের সেনা অফিসার হয়েও ছায়েমার কাছে পরাজিত।

আমীর সাহেব জাফর ভাইকে বুঝিয়ে বললেন, রাস্তায় লোক চলাচল বন্ধ হলেই খেয়াঘাটে মাইন পুঁতে রাখতে হবে। পানি থেকে দু'তিন হাত দূরে পরপর তিন-চারটি মাইন পুঁততে হবে। আর সাত-আটটি নৌকা এপার থেকে ওপারে নিয়ে রাখতে হবে। তারপর প্রত্যেক নৌকায় রিমোর্ট সিস্টেম মাইন রাখা হবে। ওরা এ রাস্তায় আসুক আর অন্য রাস্তায় আসুক, পারাপারের ঘাট মাত্র একটাই। আমি এতেই সফলতার গন্ধ পাই।

আমি বললাম, ভাই! রিমোট তো নেই। মাইন কিভাবে রিমোর্ট সিস্টেম করবেন?

তিনি কিছু বৈদ্যুতিক তার, বাল্ব ও ব্যাটারীসহ আরো দু'তিনটি সরঞ্জামাদির নাম উল্লেখ করে বললেন, এগুলো হলে রিমোর্ট তৈরি করা যাবে। আমি বাজার থেকে এসব সরঞ্জামাদি নিয়ে বাড়ী ফিরলাম।

হামিদ জায়ী বাড়ী ফিরে আমাদের সিদ্ধান্তের কথা শুনে খুশী হলেন। আমি সরঞ্জামাদি নিয়ে হাজির হলে আমীর সাহেব একটি ঘরে ঢুকলেন। সাথে আমি, ছায়েমা ও জাফর ভাই। তিনি রুম বন্ধ করে দিয়ে রিমোর্ট তৈরি করলেন। তিনি আমাদেরকেও শেখার তাকিদ দিলেন। আল্লাহর রহমতে আমরাও রিমোর্ট তৈরি করা শিখে নিলাম।

প্রথমে মাইনের সুঁইচ লক করে স্ক্রু-ড্রাইভারের সাহায্যে মাইনগুলো এক এক করে পার্টে পার্টে খুলে স্তরে স্তরে রেখে দিলেন। তারপর মাইনের ভেতরে বাল্বের কাচ ভেঙ্গে অবশিষ্ট অংশগুলো বসিয়ে ব্যাটারিতে বৈদ্যুতিক তারের সংযোগ দিলেন এবং অন্যান্য যন্ত্রাংশগুলো ফিট করে রিমোর্ট তৈরি করলেন। প্রায় সবগুলো মাইন রিমোর্ট সিস্টেম করে ফেললেন।

আছরের নামায আদায় করে জাফর ভাইকে নিয়ে আমি নদীর কূলে হাঁটতে লাগলাম। হঠাৎ একজন লোককে নদীর কূলে হাঁটতে দেখে জাফর ভাই চমকে ওঠলেন। তিনি কয়েক কদম এগিয়ে কাশবনে ঢুকলেন। আমি বুঝতে পেরেছি, লোকটি কোন গুপ্তচর হবে। আমি সন্দেহ দূর করার জন্য জাফর ভাইকে লোকটির ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম। জাফর ভাই উত্তর দিলেন, তিনি একজন সামরিক গোয়েন্দা। নাম এডভার ক্লাইভ।

এডভার ক্লাইভ উচ্চ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দুর্ধর্ষ লড়াকু। গুপ্তচরবৃত্তিতে তিনি কয়েকবারই লেনিন পদক পেয়েছেন। তার আনাগোনা দেখে জাফর ভাই বুঝতে পেরেছেন, ওরা নিঃসন্দেহে এই এলাকায় আক্রমণ করবে।

সন্ধ্যার বেশী বাকী নেই। আমরা হামিদ জায়ীর বাড়ী গিয়ে মাগরিবের নামায আদায় করলাম। জাফর ভাই এডভার ক্লাইভের আগমনের কথা বললেন। একথা শোনার পর আমীর সাহেবকে কেমন যেন একটু বিচলিত ও চিন্তিত দেখা গেল। একটু পর এক দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি বললেন, অবস্থা খুবই নাজুক বলে মনে হচ্ছে। তোমরা বেশী বেশী দোয়া করতে থাক। মনে হয়, ওরা আজ রাতেই ক্র্যাকডাউন লাগাবে।

ছায়েমা এগিয়ে এসে বলল, আমরা যদি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে গ্রামের বাইরে চলে যাই, তবে ক্র্যাকডাউনের ভেতরে পড়ব না। তাছাড়া বাহির থেকে ওদের উপর আক্রমণ করতে পারব। আর অন্যদিকে গ্রামটিও রক্ষা পাবে। গ্রামে যদি কোন অস্ত্র বা মুজাহিদ না পায়, তবে তত নির্যাতন করবে না। আমীর সাহেব তার পরামর্শ অনুপাতে সিদ্ধান্ত নিলেন।

আমীর সাহেব হামিদ জায়ীকে ডেকে জলদী খানাপিনার ব্যবস্থা করার জন্য নির্দেশ দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, অস্ত্রগুলো কোথায় রাখা যায়? হামিদ জায়ী বললেন, হুজুর! নদীর তটে বিশাল এলাকাজুড়ে রয়েছে কাশবন। মাসের পর মাস লুকিয়ে থাকলেও কেউ টের পাবে না। এই বলে হামিদ জায়ী খাওয়ার আয়োজনে চলে গেলেন। আমীর সাহেব অস্ত্র চেক করার নির্দেশ দিলেন। আমরা সবগুলো অস্ত্র খুলে চেক করে ঠিকঠাক করে নিলাম।

ঈশার নামাযের পর জাফর ভাই ও ছায়েমাকে নিয়ে অস্ত্রগুলো কাশবনে লুকিয়ে আসলাম। তারপর খানাপিনা সেরে বিশ্রাম নিচ্ছি। আমীর সাহেব পিছু পিছু হাঁটতে লাগলেন। আমীর সাহেব নদীর ওপারে গিয়ে পানি থেকে একটু দূরে এলোপাতাড়িভাবে কয়েকটি মাইন পুঁতে রাখলেন। বাকি মাইনগুলো ৫টি নৌকার তলদেশে খুব সুন্দরভাবে স্থাপন করলেন।

আমরা এসএলআর, এলএমজি, স্টেনগান ও ক্লাশিনকভ নিয়ে এবং প্রয়োজনীয় গোলাবারুদ আর গ্রেনেড নিয়ে রাস্তার দু'পাশে ওঁৎ পেতে বসে রইলাম। আমাদের পজিশনের স্থানটি ছিল অপেক্ষাকৃত নীচু। তিনদিক থেকে গুলী করে কিছুই করতে পারবে না। স্থানটি ছিল কিছুটা বাংকারের মত। আমাদের সকলের মুখেই 'হাসবুনাল্লাহু অনি'মাল অকীল, নি'মাল মাওলা অনি'মান নাছীর'।

রাত তিনটা। বিড়ালের মতো পা ফেলে এক ঝাঁক সৈন্য এদিকে এগিয়ে আসছে। এরা এতই সতর্ক যে, মাইন পুঁতে রাখার সন্দেহে আগে আগে তিনটা ঘোড়া হাঁকাচ্ছে। একটি ঘোড়া থেকে অন্যটির দূরত্ব বিশ-পঁচিশ মিটার। ঘোড়াগুলো আগে দেয়ার কারণ হচ্ছে, মাইন বিছানো থাকলে ঘোড়ার পায়ে পিষ্ট হয়ে যেন বিস্ফোরিত হয়। তাহলে সৈন্যরা অক্ষত থাকবে। তাদের বুদ্ধিমত্তা দেখে আমরা খুব বিচলিত হয়ে গেলাম।

প্রথম অশ্বটি প্রথম মাইনে পা ফেলার সাথে সাথে বিকট আওয়াজে বিস্ফোরিত হল। কেড়ে নিল প্রথম ঘোড়াটিকে। প্রলয়ংকরী আওয়াজে রজনীর নীরবতা ভেঙ্গে গেল। থমকে দাঁড়াল কাফেলা। মেজর অপর ঘোড়া দু'টিও সামনে হাঁকাল। পানির কাছাকাছি যাওয়ার সাথে সাথে এক সাথে দু'থেকে তিনটি মাইন বিস্ফোরিত হয়ে ঘোড়াগুলো ক্ষতবিক্ষত হয়ে এদিক-ওদিক ছিটকে পড়ল।

সামরিক গোয়েন্দা এডভার ক্লাইভ সৈন্যদের নিয়ে জরুরী পরামর্শ মিটিং ডাকলেন। এডভার ক্লাইভ সকলকে লক্ষ্য করে বললেন, আমার ধারণা অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হচ্ছে। ঘোড়াগুলো না আনা হলে এখানেই আমাদের জীবনের সমাপ্তি ঘটত। আমি যখন তথ্য সংগ্রহ করতে এসেছিলাম, তখন নদীর ওপারে আনমনে দু'জন ব্যক্তিকে হাঁটতে

দেখেছি। ওদের মধ্যে একজনকে আমাদের পলাতক মৌলবাদী জাফরের মত মনে হল। আমার দৃষ্টি এড়াতে পারবে এমন ক'জন আছে? মুজাহিদরা সম্ভবত ঐ গ্রামেই রয়েছে। ওরা আমাদের ক্র্যাকডাউনের কথা আঁচ করতে পেরেছে। তাই রাস্তায় মাইন বিছিয়ে নৌকাগুলো সারিবদ্ধভাবে সাজিয়ে রেখেছে, যেন আমরা লাফালাফি করে নৌকায় উঠি। তারপর যা হবার তা তো হবেই। যাক বুদ্ধির বলে বেঁচে গেছি। তারপর সে একটু উঁচু আওয়াজে বলল–

ওহে সৈনিকরা! লক্ষ্য করে কান পেতে আমার কথাগুলো শোন। আমরা এখন নদী পার হয়ে ডানে-বামে ছড়িয়ে যাব। এক হাজার ফৌজ পঞ্চাশ গজ দূরে দূরে অবস্থান নিলে পুরো গ্রামটাই আমাদের আয়ত্ত্বে এসে যাবে। সূর্য উদিত হওয়ার এক ঘন্টা পুর্বে আমরা মাইকে জানিয়ে দেব, গ্রামের নারী-পুরুষ, যুবক-যুবতী, ছেলে-মেয়ে, চাকর-বাকর সবাই যেন বাড়ি ছেড়ে মাঠে বেরিয়ে আসে। তারপর একদিক থেকে চেক করে যাব। মনে রাখবে, কোন স্থান আর কোন লোক যেন চেক থেকে বাকি না থাকে।

সকলেই এক বাক্যে তার কথা মেনে নিল। তারপর মিস্টার এডভার ক্লাইভ প্রতিটি নৌকায় পঞ্চাশজন করে সৈন্য উঠার নির্দেশ দিলেন। হিসাব করে প্রত্যেক নৌকায় পঞ্চাশজন করে সৈন্য আরোহন করে নৌকা ভাসাল। বাকী সৈন্যরা ওপারে যাওয়ার জন্য নদীতটে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। মধ্য নদীতে যাওয়ার সাথে সাথে আমীর সাহেব রিমোর্ট চাপ দিলে নৌকাসহ সব সৈন্য ক্ষতবিক্ষত হয়ে নদীগর্ভে তলিয়ে গেল। কেউ আর জীবিত রইল না। নদীতটে দাঁড়ানো সৈন্যরা প্রাণভয়ে ব্রাশফায়ার করতে করতে দিগ্বিদিক ছুটাছুটি করতে শুরু করল। আমরাও ব্রাশফায়ারের মাধ্যমে তাদের জবাব দিতে লাগলাম।

অন্ধকার রজনী। উভয়পক্ষের গোলাগুলীতে কে কোথায় আছে কে জানে? হতাহতের সংখ্যা নির্ণয় করা এ মুহূর্তে সম্ভব নয়। প্রায় দু'ঘন্টা কাল এলোপাতাড়িভাবে গোলাগুলী চলার পর পরিস্থিতি ক্রমশ শিথিল হয়ে আসতে লাগল। এখন আর কোন গুলীর শব্দ কানে আসছে না। অন্ধকারও অনেকটা কমে আসছে। আমি তুমুল গুলী বিনিময়ের সময় একটু নীচু স্থানে শুয়ে ছিলাম। কারণ, বেশ কিছুক্ষণ পূর্বেই আমার গুলী

শেষ হয়ে গেছে। আমি আমার সাথীদের খুব পেরেশান অবস্থায় খোঁজাখুঁজি করছিলাম। আমির সাহেব, জাফর ভাই, ছায়েমা ও হামিদ জায়ী প্রচণ্ড গোলাগুলীর সময় ক্রোলিং করে ফায়ার করতে করতে অন্ধকারে মিলিয়ে গিয়েছিলেন। তখন থেকেই তাদেরকে হারিয়েছি।

বেশ কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর হামিদ জায়ী ও ছায়েমাকে একটি স্থানে পেলাম। হামিদ জায়ী অচেতন অবস্থায় পড়ে আছেন। ছায়েমা তার পার্শ্বে বসে কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যবস্থা করছে। কাপড় ভিজিয়ে নদী থেকে পানি এনে মুখে দিচ্ছে। ছায়েমা আমাকে দেখে আস্তে আস্তে ডাক দিলে আমি তাদের সন্ধান পাই। কিছুক্ষণ সেবা-শুশ্রূষা করার পর হামিদ জায়ী চোখ মেলে চাইলেন। অনেক সান্ত্বনা ও অভয়বাণী শুনালাম হামিদ জায়ীকে। কোন গোলার আঘাতে সে জ্ঞান হারায়নি। একদিকে নতুন মানুষ অপরদিকে অনভিজ্ঞ, তাই ভয় পেয়ে প্রাণ পাখি উড়ে যেতে চাচ্ছিল। একমাত্র আল্লাহর রহমতে বেঁচে আছেন।

ছায়েমা কাঁদো কাঁদো স্বরে জিজ্ঞেস করল, খোবায়েব ভাইয়া! আমীর সাহেব ও জাফর ভাইয়ের খবর কি? আমি বললাম, এখনো তাদের কোন সাড়া পাচ্ছি না। বেশকিছু স্থানে খুঁজে এসেছি। ছায়েমা আমাকে হামিদ জায়ীর সেবায় রেখে আমীর সাহেবের খোঁজে বের হল। কিছুক্ষণ পর এক গগনবিদারী চীৎকার ভেসে এল। খোবায়েব ভাইয়া! ও খোবায়েব ভাইয়া! আমীর সাহেব শাহাদাতবরণ করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। এত অল্প সময়ে আমীর সাহেব শহীদ হবেন, তা ভাবতেও পারিনি। আমি হামিদ জায়ীকে বসিয়ে রেখে ওদিকে ছুটলাম।

সুবহানাল্লাহ! কি অলৌকিক ব্যাপার। আমি যতই নিকটে যাচ্ছি, ততই জান্নাতি সৌরভ আমাকে মাতোয়ারা করে তুলছে। এই সৌরভ যেন জান্নাতের দুয়ার খুলে বেরিয়ে আসছে। এমন মনোমুগ্ধকর ও পাগলকরা সুবাস দুনিয়ার কোন নাসিকা গ্রহণ করেনি।

আমি পাগলপারা হয়ে আরো নিকটবর্তী হলে দেখতে পেলাম, আমীর সাহেবের দেহ ব্রাশফায়ারে ঝাঝরা হয়ে গেছে। জমিন রক্তে রঞ্জিত। এখনো উষ্ণ শোণিতধারা প্রবাহিত হচ্ছে। চেহারাটা যেন নূরানী

আভায় ঝলমল করছে। চেয়ে দেখি খানিকটা দূরে জাফর ভাইও একই অবস্থায় পড়ে আছেন। আহ! কি সুন্দর নূরানী চেহারা আর হৃদয়কাড়া সুঘ্রাণ। আর কোনদিন তো শহীদের লাশ অবলোকন করার সুযোগ হয়নি। আজ কেঁদে কেঁধে দু'জনেই তা দেখছি।

আমার কান্না ছায়েমা কোনদিন বরদাশত করতে পারেনি। তাই সে অশ্রুসিক্ত নয়ন দু'টো মুছে নিয়ে বেদনাগুলো বুকে চেপে রেখে আমাকে বলল, খোবায়েব ভাই! তুমি কাঁদছ কেন? তারাই তো চির কামিয়াব। দুঃখ করা কি আমাদের শোভা পায়? আহ! কতইনা সৌভাগ্য ওদের। আমাদেরকে পাপ-পংকিলময় ধূলির ধরায় ফেলে রেখে তারা জান্নাতে স্থান করে নিয়েছেন। ওহে জান্নাতের বুলবুলি! এখন তো তোমরা মনের আনন্দে বেহেশতের ফলমূল ভক্ষণ করছ আর পান করছে নির্ঝরণীর দুধ, মধু আর শরবত। স্নিগ্ধ সমীরণে শরীর জুড়াচ্ছ। আহ! তোমরা তো আজ জান্নাতের হুর-গেলমানদের নিয়ে আনন্দ করছ। আহ! কতই না আনন্দ! বলতে বলতে ছায়েমা মহানবী (সাঃ)-এর একটি বাণী শুনাল–

আবদুল্লাহ ইবনে আমার ইবনুল আস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) বলেন, আল্লাহর রাহে নিহত হওয়া ঋণ ব্যতীত সমস্ত পাপের কাফফারা। (বুখারী, মুসলিম)

ছায়েমা আরো বলল, হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, নবীকারীম (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, কাফের ও তার হত্যাকারী কখনো জাহান্নামে একত্রিত হবে না। (মুসলিম শরীফ)

তিনি আরো বলেছেন, মহান রাব্বুল আলামীন পবিত্র কালামে ঘোষণা করেছেন, "কাজেই আল্লাহর কাছে যারা পার্থিক জীবনকে আখেরাতের পরিবর্তে বিক্রি করে দেয়, তাদের জিহাদ করাই কর্তব্য। বস্তুত, যারা আল্লাহর রাহে জিহাদ করে এবং অতপর মৃত্যুবরণ করে কিংবা বিজয় অর্জন করে, আমি তাদেরকে মহাপুণ্য দান করব।" (সূরা নিসা ঃ আয়াত ৭৪)

ছায়েমা এসব হাদীস ও আয়াত শুনিয়ে বলল, ভাইজান! যা হবার হয়ে গেছে। এখন অযথা বিলাপ করে সময় নষ্ট করা ঠিক হবে না। তাদের দাফন করে স্থান ত্যাগ করাই উত্তম। আমি ছায়েমার কথামতো হামিদ জায়ীকে বললাম, ভাই! যত তাড়াতাড়ি পারেন কোদাল নিয়ে

আসুন। কোনমতে লাশ দু'টি কবরে রেখে শহীদের মর্যাদা রক্ষা করি। হামিদ জায়ী দু'টি কোদাল নিয়ে এলেন। আমরা খুব তাড়াহুড়া করে কাশবনে দু'টি কবর খনন করে লাশ দু'টি সমাধিস্থ করলাম। জানাযা ও দাফন কার্য সমাধা করার পর ছায়েমা বলল, খোবায়েব ভাই! মহান রাব্বুল আলামীন শহীদদের কত উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন। তাদেরকে গোসল দেয়ার প্রয়োজন হয় না। রক্তমাখা কাপড়গুলো খুলতে হয় না। আল্লাহ পাক চান, তার রাস্তায় নিহত বান্দাকে হাশরের ময়দানে ক্ষতবিক্ষত ও রক্তাক্ত অবস্থায় দেখতে। সুবহানাল্লাহ!

আমরা দাফন কার্য সমাধান করে প্রচুর গোলা-বারুদ, অস্ত্র ও প্রয়োজনীয় ছামানা নিয়ে হামিদ জায়ীর বাড়ী ফিরলাম। আমি হামিদ জায়ীকে গনীমতের ছামানার জিম্মাদারী দিয়ে বললাম, কেউ যদি আপনার কাছে জিহাদের সরঞ্জাম চায়, তবে যাচাই করে দেবেন।

তারপর খানাপিনা শেষ করে দু'জন সৈনিকের পোশাক পরে প্রয়োজনীয় অস্ত্র নিয়ে উক্ত গ্রাম ত্যাগ করলাম। হামিদ জায়ী বিদায়লগ্নে চোখের পানি ছেড়ে দোয়া দিয়ে বিদায় দিলেন। আমরাও তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বেরিয়ে এলাম।

[চব্বিশ]

সকাল দশটা। আমরা ক্লাশিনকভ, গ্রেনেড, মাইন, গোলাবারুদ, শুক্‌নো খাবার ও পানীয় নিয়ে গ্রামের পর গ্রাম অতিক্রম করছি। গোলা-বারুদগুলো বেশ ভারী। বহন করা যে এত কষ্টকর হবে, তা আগে অনুমান করতে পারিনি। তবু একান্ত প্রয়োজনের খাতিরে না নিয়েও উপায় নেই। ছায়েমার দিকে তাকিয়ে দেখলাম, মেয়েটা কুঁজো হয়ে পিছু পিছু হাঁটছে। আমার খুব মায়া হল। তাই তার থেকে কিছু জিনিসপত্র আমার জিম্মায় নিয়ে নিলাম।

এদিকে রাতের গোলাগুলীর আওয়াজে এলাকার জনগণ বাড়ীর বাইরে বেরুচ্ছে না। এক অজানা বিপদের আশংকায় সকলেই আতংকিত। আমাদেরকে দেখামাত্র ভয়ে পালাচ্ছে। কেউ আর কাছে আসছে না। রাস্তার সন্ধান জানার জন্যও কোন লোক পাচ্ছি না। কাউকে হাতের ইশারায় ডাকলে দৌড়ে পালায়। আমরা একটু পরপরই বিশ্রাম নিচ্ছি। মানুষ ভাবছে, আমরা বলসেভিক সৈন্য। বলসেভিক বা লাল

ফৌজের জুলুম-নির্যাতন তো ওরা প্রত্যক্ষ করেছে। এ কারণেই এদেরকে যমের মত ভয় পায়।

ছায়েমা বুদ্ধি করে আমাকে বলল, ভাইজান! এভাবে তো আর যাওয়া সম্ভব নয়। প্রাণপাখি উড়ে যাবার পথ খুঁজছে। আপনি যুবকদেরকে দেখামাত্র অস্ত্র উঁচিয়ে এদিকে আহ্বান করুন। তারা ভয়ে দাঁড়াবে। তারপর ওদেরকে সাহায্যকারী হিসেবে সঙ্গে নেয়া যাবে। কিছুদূর গিয়ে এদেরকে ছেড়ে আবার অন্যদেরকে ব্যবহার করব। ছায়েমার কথায় আমি তাই করলাম। চলতে চলতে একটু দূরে তিনজন যুবককে দেখে হাতের ইশরায় ডাকলাম। ওরা পালানোর চেষ্টা করলে আমি অস্ত্র তাক করে একটু দৌড়িয়ে এগিয়ে গেলাম। ওরা থেমে গেল। তারপর ডেকে এনে বললাম, ভাই! তোমাদের ভয় নেই। আমরা তোমাদের কোন ক্ষতি করব না। তোমরা আমাদেরকে একটু সাহায্য কর। এক যুবক বলল, কি ধরনের সাহায্য করতে পারি স্যার! আমি বললাম, আমাদের ছামানাগুলো বহন করে কিছু পথ এগিয়ে দাও। যুবক বলল, স্যার! এটা কোন ব্যাপার হল? দু-চার মাইল রাস্তা অনায়াসে এগিয়ে দেয়া যাবে। তবে আপনারা কোথায় যাবেন স্যার, একটু শুনতে পারি? বললাম, আমরা জামবুল যাব। যুবক বলল, আহ! জামবুল তো অনেক দূর। আলমাআতা না হয়ে জামবুল যেতে পারবেন না। আপনারা যে পথ ধরেছেন, এ পথ তো কুহেকাফ বনভূমির রাস্তা। শুনেছি, কয়েকশ' বর্গমাইল বিস্তৃত এ বনভূমি। এ বনে রয়েছে বাঘ, ভালুক, গরিয়াল, জেব্রা, বানর ও আরো কত নাম না-জানা হিংস্র প্রাণী। সেখানে নেই কোন লোকালয়, নেই কোন পথ-ঘাট। সেখানে যাওয়া তো নিরাপদ নয়।

যুবকের কথায় প্রথমে আমার একটু ভয় লাগল। কিন্তু ছায়েমা আমাকে অভয় দিয়ে বলল, এতে আমাদের কোন ভয় নেই। আমরা অস্ত্রধারী সৈনিক। যে কোন প্রাণীর সাথে যে কোন সময় মোকাবেলা করতে পারব। জনবসতি থেকে বনজঙ্গলে আশ্রয় নেয়া আমাদের জন্য অধিক নিরাপদ।

ছায়েমার কথাই সঠিক। আমরা ভাগাভাগী করে পথ চলছি। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হচ্ছে। তাই নামাযের জন্য একটি স্থান বেছে নিলাম।

দু'জন দু'বারে যোহরের নামায আদায় করলাম। আমাদের নামায দেখে যুবকরা কানাঘুঁষা করতে লাগল। তারা খুবই বিস্মিত হল। এরা কেমন বলসেভিক? এরা দেখছি নামাযও পড়ে!

আমরা নামায আদায় করে যুবকদেরকে নিয়ে নাস্তা করে একটু বিশ্রাম নিলাম। তারপর আবার হাঁটতে শুরু করলাম। আরো কিছু পথ অগ্রসর হলে কুহেকাফের বনভূমি আঁখি নামক দুর্বিনের রেঞ্জে এসে গেল। আমরা আর একটু অগ্রসর হয়ে যুবকদেরকে কিছু টাকা পুরস্কার দিয়ে ছেড়ে দিলাম। ওরা আমাদের ব্যবহারে খুবই খুশি হল এবং উৎফুল্লচিত্তে বিদায় নিল। আমরা হাঁটতে হাঁটতে গভীর অরণ্যে হারিয়ে গেলাম। আহ! কি অন্ধকার এ অরণ্য! বড় বড় বৃক্ষ ছাড়াও কাঁটাগুল্মে ভরা। খালি পায়ে হাঁটা কার সাধ্য?

আছরের শেষলগ্নেই মনে হচ্ছিল রাত হয়ে গেছে। বহুদূর পথ এগিয়ে আসার কারণে পা ফুলে গেছে। হাঁটতে আর ইচ্ছে করছে না। ছায়েমা কাতর স্বরে বলল, ভাইজান! সামনে আর না গিয়ে চলুন বিশ্রামের একটু স্থান বেছে নেই; আর পারছি না যে! আমি ছায়েমার কথা রক্ষা করতে গিয়ে বিশ্রামের স্থান খুঁজে বেড়াচ্ছি। একটু দূরে পত্রবেষ্টিত একটি ঝুপড়ি নজরে পড়লে সেখানে গেলাম। মনে হল কোন শিকারী বা কাঠুরিয়া বিশ্রামের জন্য ঝপড়িখানা নির্মাণ করেছে।

আমরা জায়গাটা একটু ঝাড়ু দিয়ে পাতা বিছিয়ে বিছানার জরুরত মিটালাম। তারপর ছামানাগুলো পাশে রেখে তায়াম্মুম করে নামায পড়ে বিশ্রাম নিলাম। আহ! জীবনের এ অধ্যায়টি কতই না আনন্দদায়ক ও মধুময়, তা কে বুঝবে! একদিকে ভয় অন্যদিকে আল্লাহর পুরস্কারের লোভ। সব মিলিয়ে আনন্দটাই বেশি উপভোগ করছি। আমাদের রাত যাপনের দৃশ্য যদি অপরিচিত কেউ দেখত, তবে বদগুমান করে বলত, এ যেন এক নবদম্পতির বাসরগৃহ।

আমার ছোট দাদু আমাকে ঘুম পাড়াতেন কুহেকাফের সিংহের ভয় দেখিয়ে। কুহেকাফ অরণ্যের বাঘ ও সিংহ নাকি দুনিয়া বিখ্যাত। শিশুকালের দাদুর কথা মনে পড়ে শরীর শিউরে উঠল। গায়ের লোমগুলে সজারুর কাঁটার মত দাঁড়িয়ে গেল। রক্তের স্পন্দন ক্রমেই বেড়ে গেল। শরীর থর থর করে কাঁপছে। ছায়েমা তা বুঝতে পেরে

চুপি চুপি জিজ্ঞেস করল, ভাইজান! ভয় পাচ্ছেন বলে মনে হয়? আমি তার কথার উত্তর দিতে রাজি ছিলাম না। বারবার পীড়াপীড়িতে না বলে পারলাম না। আমার কথা শুনে ছায়েমা তেলে-বেগুনে রেগে গেল। সে বলল, ওসব কিংবদন্তি বা রূপকথায় তুমি ভয় পাচ্ছ? তুমি আবার নিজেকে মুজাহিদ হিসেবে দাবী কর? ছিঃ ছিঃ ওসব ভাবতেও লজ্জা হয়। আমরা আল্লাহর রাস্তার সৈনিক, আল্লাহ আমাদেরকে সাহায্য করবেন। তাছাড়া আমাদের কাছে রয়েছে শক্তিশালী মারণাস্ত্র। আমাদের উপর আক্রমণ করে কোন প্রাণী নিরাপদে ফিরে যাবে তা কি করে হয়? এসব কথা বলে ছায়েমা আমাকে রীতিমত ধিক্কার দিতে লাগল। ছায়েমার কথা শুনে আমার অবস্থার অনেকটা উন্নতি হল বটে, তবু মনের শংকা দূর হচ্ছে না।

রাত আনুমানিক এগারটা। কারো চোখে ঘুম নেই। আমাদের ঝুঁপড়ির সামান্য একটু দূরে কিসের একটা আওয়াজ শুনতে পেলাম। শব্দ শুনে উঠে বসলাম এবং হাতে অস্ত্র তুলে নিলাম। হঠাৎ মাটি কাঁপিয়ে সিংহের হুংকার আসল। এ ধরনের আওয়াজ কোনদিন শুনিনি। ছায়েমা এক চীৎকারে আমাকে জড়িয়ে ধরে বলল, ভাইজান! আর বুঝি রক্ষা নেই। এই তো এদিকেই এগিয়ে আসছে! আমাদের বুঝি আর রক্ষা নেই!

ছায়েমার বাহাদুরী আলাপ শেষ হতে না হতেই যে কাণ্ড আরম্ভ হল, তাতে কান্নার পরিবর্তে হাসি পেল। ছায়েমা আমার অবস্থা দেখে বলে ওঠল, তুমি হাসছ! আল্লাহর নাম জপ কর! লা ইলাহা ইল্লা আনতা ছুবহানাকা ইন্নি কুনতু মিনাজ জোয়ালিমীন। আমি ছায়েমার সাথে দোয়ায়ে ইউনুছ পড়তে লাগলাম।

সিংহটি হুংকার দিতে দিতে আমাদের ঝুঁপড়ির নিকট এসে গেল। আমি ফায়ার করার জন্য ক্লাসিনকভ তাক করলাম। ছায়েমা আমার হাত ধরে বলল, ভাইয়া! আর একটু সবুর কর। দেখি ওটা কি করে। যদি এদিকে চড়াও হয়, তবে গুলী ছুঁড়ব। সে আরো বলল, এর আগেও তো সেদিন, তিন-চারটা বাঘ তর্জন-গর্জন করে আমার নৌকার দিকে এসেছিল। তারপর আমাকে খাওয়ার পরিবর্তে পাহারা দিয়ে চলে গেছে। আল্লাহ আমাদের নুছরতের জন্য একে পাঠাতে পারেন। ছায়েমার কথায় আমার একীন হল। তাই অস্ত্র রেখে দিলাম।

সিংহ তার হুংকার বন্ধ করে আমাদের ঝুঁপড়ির চারদিকে ঘুর ঘুর করতে লাগল। আমি সুনিশ্চিত বুঝতে পারলাম, সিংহটি আমাদের উপর আক্রমণ করবে না। অন্যথায় প্রথমবারই তার কার্য সমাধা করে উদর পূর্ণ করে চলে যেত। ঝুঁপড়ির চারদিকে কয়েকবার চক্কর দিয়ে সিংহটি দরজায় এসে বসে গেল। সিংহটিকে খুবই শান্তশিষ্ট মনে হল। ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে দেখি, ইয়া বড় বিশাল আকৃতির জান্োয়ার, চোখ দু'টি টকটকে লাল। লম্বা লম্বা কেশর ঘাড় ও মাথা ভরা। দেখে ভয় পাবে না এমন কে আছে।

ছায়েমাও দৃশ্যটি দেখল। কিছুক্ষণ পর আস্তে আস্তে আমাদের ভয় অনেকটা কমে এল। সেও ভদ্র লোকের মত দরজায় শুয়ে লেজ নাড়ছে। রাত প্রায় বারটা পেরিয়ে গেছে। কারো চোখে ঘুম নেই। এক পর্যায়ে আমাকে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে বাইরে যেতে হয়। ছায়েমা একা একা ঝুঁপড়িতে বসে থাকতে ভয় পাচ্ছে। তাই আমার সাথে সেও বেরিয়ে আসতে চায়। ঝুঁপড়ি থেকে বের হওয়ার পথ তো আগলিয়ে শুয়ে আছে বনের রাজা। আমরা ওর পাশ দিয়ে বেরিয়ে এলাম বাইরে। ছায়েমাকে এক স্থানে দাঁড় করিয়ে আমি খানিকটা দূরে গিয়ে জরুরত সারতে লাগলাম। বনের রাজা শোয়া থেকে ওঠে বাহাদুরের মত আমাদের চারপাশে টহল দিতে লাগল।

আমি এস্তেঞ্জা সেরে ঝুঁপড়িতে ফিরে এলাম। সিংহটি আবার দরজায় এসে শুয়ে লেজ নাড়াচ্ছে। ছায়েমা বলল, ভাইজান! এ যে আল্লার এক খাছ নুছরত। হয়ত অন্য কোন হিংস্র প্রাণী আমাদের উপর আক্রমণ করার আশংকায় আল্লাহ বনের রাজাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন আমাদের পাহারা দেয়ার জন্য। আমি বললাম, তা ঠিক। আমরা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রশংসা করতে লাগলাম।

ছায়েমা ভাবাবেগে বলে উঠল, আমার মন চায় ওকে একটু আদর করে আসি। যা কথা তাই কাজ। সে শোয়া থেকে ওঠে দরজায় গেল। তারপর ভয়ে ভয়ে আস্তে আস্তে বনরাজার মাথায় হাত বুলাতে লাগল। সেও যেন ছায়েমার আদর পেতে লালায়িত ছিল বহুদিন থেকে। ওদের ভাব বিনিময় দেখে আমার মনে হল, এ যেন ছায়েমার পোষা বিড়াল; মাথা নিচু করে তার আদর-সোহাগ উপভোগ করছে। এক পর্যায়ে

ছায়েমা ব্যাগ থেকে রুটি বের করে ছিঁড়ে ছিঁড়ে তার মুখে দিতে লাগল। বনরাজা ছায়েমার হাত থেকে রুটির টুকরোগুলো মুখে নিয়ে চিবুতে লাগল। সুবহানাল্লাহ! এ কি চমকপ্রদ দৃশ্য! এভাবে ছায়েমা বেশক'টি রুটি খাইয়ে আমার কাছে এসে বলল, খোবায়েব ভাইয়া! দেখলে তো আল্লাহর মহিমা। লোকালয় থেকে গভীর অরণ্যে আশ্রয় নেয়াই উত্তম। মানুষ মানুষের ক্ষতি করে। আর বন্য পশুরা নিরীহ মজলুম মানুষের উপকার করে।

কথা বলতে বলতে আমরা একসময় ঘুমিয়ে পড়লাম। বন মোরগের ডাকে শেষ রাতে সুখনিদ্রা ভেঙ্গে গেল। মোরগের ডাকে মনে হচ্ছিল, আমরা যেন কোন পল্লীতে অবস্থান করছি। ঘুম থেকে জেগে তাকিয়ে দেখি, দরজায় এখনো বনের রাজা শুয়ে আছে। এর আসল চেহারা রাতে তেমন দেখতে পারিনি। এখন তো দেখলাম, বিশাল দেহবিশিষ্ট সিংহরাজ। আমাদেরকে দেখে সে সরে গিয়ে রাস্তা ছেড়ে দিল। আমরা এস্তেঞ্জা সেরে তায়াম্মুম করে নামায পড়লাম। তারপর সামান্য কিছু আহার করে পরামর্শে বসলাম। ছায়েমা এবারও কিছু রুটি নিয়ে সিংহের সামনে দিল। সিংহ তা খেতে লাগল।

ছায়েমা তার মতামত ব্যক্ত করতে গিয়ে বলল, ভাইজান! আমার তো সংসারে কাঁদবার মতো আর খোঁজবার মতো কেউ নেই। আপনার তো মা আছেন। দুনিয়ার কেউ যদি নাও কাঁদে, তবুও মা না কেঁদে পারেন না। তিনি তো দিনমান আপনার ও বড় হুজুরের খবরের জন্য পথপানে তাকিয়ে আছেন। চলুন, আগে অভাগিনীর খোঁজ নেই। সেখানে সপ্তাহখানেক কাটিয়ে সান্ত্বনা ও প্রবোধ দিয়ে তুর্কমেনিস্তানে আনোয়ার পাশার নিকট চলে যাব।

ছায়েমার পরামর্শ আমার খুব মনঃপূত হল। তাই এখন জামবুলের উদ্দেশ্যে রওনা হব। কোন্‌দিকে যাব রাস্তা জানা নেই। এতটুকু অনুমান করা যায়, আলমাআতা এখান থেকে সোজা দক্ষিণে হবে। আর জামবুল সেখান থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে অবস্থিত। এ হিসাব দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে গেলেই হয়ত সুরাহা হবে। কিন্তু কুহেকাফ বন তো বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে। দু'এক সপ্তাহে অতিক্রম করা যাবে কিনা সন্দেহ।

আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা রেখে আমরা ঝুঁপড়ি ত্যাগ করলাম।

গতকাল থেকে আমার শারীরিক অবস্থা অনেক খারাপ যাচ্ছে। অতিরিক্ত বোঝা বহন করার কারণে চলতে খুবই কষ্ট হচ্ছে। আমি ছায়েমাকে বললাম, এতো ছামানা নিয়ে কষ্ট করার দরকার নেই। কিছু কমিয়ে হাল্কা করে নেই। ছায়েমা তাতে রাজি হল না। বলল, যা আমরা নিয়েছি, তা একান্ত জরুরী। কষ্ট করে হলেও এগুলো সাথে রাখতে হবে। পরে কাজে লাগবে। ছায়েমার কথামত সবগুলো ছামানা নিয়েই চলতে শুরু করলাম।

অরণ্যপাল বারবার চারদিকে ঘুরে ঘুরে লেজ নাড়াচ্ছে। আমি তার হাবভাব বুঝতে পারছি না। ছায়েমা সিংহটির সাথে পোষা বিড়ালের ন্যায় ব্যবহার করছে। সে গ্রেনেড, মাইন ও গোলা-বারুদগুলো দু'ভাগে ভাগ করে সিংহের পিঠে চেপে দিয়ে বলল, এবার আমাদের সাথে চল। তার কাণ্ড দেখে আমি না হেসে পারলাম না। ছায়েমা ধমক দিয়ে বলল, অল্প হাস, বেশী বেশী ক্রন্দন কর। সাথে সাথে আমার হাসি মিলিয়ে গেল। আমি এস্তেগফার পড়তে আরম্ভ করলাম। ছায়েমা সিংহের পিছু পিছু চলতে লাগল। আমিও তাকে অনুসরণ করলাম। ছায়েমা আল্লাহর শোকর আদায় করে আমাকে বলল, খোবায়ের ভাই! এ সিংহ আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের রাহবার ও সাহায্যকারী। এ আল্লাহর হুকুমে চলছে। আমাদের চেয়ে সে অরণ্য পথ ভাল চেনে। তাই তার পিছু পিছু যাওয়াই আমাদের কামিয়াবী।

আমরা চুপচাপ পথ চলছি। যখনই বিশ্রামের জন্য কোন স্থানে বসি, তখন সিংহও বসে বিশ্রাম করে। আমরা অভিমান করে অন্য পথে চললে সে এসে বাধা দেয়। এমনভাবে সারাদিন চলছি। কিন্তু বনের কোন কূল-কিনারা পাচ্ছি না।

ছায়েমা আমাকে বলল, ভাইজান! সিংহের খাবারের জন্য শিকার করা দরকার। আমি বললাম, আরে, এত পথ আসলাম, এর মধ্যে কোন প্রাণী তো দেখতে পেলাম না, শিকার করব কোত্থেকে? ছায়েমা বলল, তুমি যে এত বোকা তা তো জানতাম না। সিংহের গন্ধ পেয়ে কি অন্য জানোয়ার কাছে আসবে? আল্লাহপাক প্রাণীদের জীবন রক্ষার জন্য অনেকগুলো কলাকৌশল এবং ইন্দ্রিয়শক্তি দান করেছেন। এর মধ্যে ঘ্রাণশক্তি একটি। ওরা বহু দূর থেকে ঘ্রাণ পেয়ে আক্রমণকারী জানোয়ার থেকে দূরে থাকে।

ছায়েমার যুক্তিপূর্ণ কথায় হার না মেনে উপায় নেই। আমি বললাম, তাহলে কিভাবে শিকার করে সিংহের খোরাক যোগাড় করা যায়, তার উপায় তালাশ কর। ছায়েমা আমাকে বসিয়ে রেখে ক্লাশিনকভ নিয়ে বেরিয়ে গেল। প্রায় বিশ মিনিট পর একটা ফায়ার শুনতে পেলাম। ছায়েমা কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে সাদা দন্তগুলো বের করে বলল, খোবায়েব ভাইয়া! আল্লাহর রহমতে সিংহের খাবারের ব্যবস্থা হয়েছে। একটা নীল গাভী শিকার করে এসেছি। তারপর আমরা ওদিকে যেতে লাগলাম। সিংহটিও আমাদের পিছু পিছু হাঁটতে লাগল। মৃত গাভীর নিকট গেলে সিংহটি খুশীতে নীল গাভীটি ছিঁড়ে-ফেঁড়ে উদর পূর্ণ করতে লাগল। আমরা দু'জনে তা দেখছি আর আল্লাহর শোকর আদায় করছি।

এভাবে বিশ্রাম নিতে নিতে তিনদিন তিনরাতে কুহেকাফ বনভূমি পেরিয়ে লোকালয়ের সন্ধান পেলাম। লোকালয়ের সন্ধান পাওয়ার পর সিংহ লেজ নেড়ে বিদায় জানিয়ে চলে গেল।

এদিকে আমাদের খাদ্য ও পানীয় অনেক আগেই ফুরিয়ে গেছে। কিছুক্ষণ হাঁটতেই পিপাসায় জীবন বের হয়ে যাওয়ার উপক্রম হল। তাই বৃক্ষের কচি পাতা চিবিয়ে রস পান করে গলা ভিজাতে লাগলাম। লোকালয় পেয়ে আমাদের আনন্দের সীমা রইল না। এবার খাবার ও পানীয়ের ব্যবস্থা করা যাবে।

আমি ছায়েমাকে অরণ্যের এক কন্টকাকীর্ণ ঝোঁপের ভেতর ছামানাসহ বসিয়ে রেখে খাবারের সন্ধানে পল্লীর দিকে চললাম। তাছাড়া রাস্তার সন্ধান, লোকজনের মন-মানসিকতা ও পল্লীর অবস্থান জানাও জরুরী ছিল। আমি পোশাক পাল্টিয়ে আস্তে আস্তে পল্লীর পথ বেয়ে চলছি। কিছুদূর অগ্রসর হলে একজন মধ্যবয়সী লোক আমাকে দেখে প্রশ্ন করল, বাবা! তোমাকে তো এ এলাকার লোক বলে মনে হয় না। তোমার চেহারায় ঈমানী আলোর আভা প্রস্ফুটিত হচ্ছে। তুমি কোত্থেকে এসেছ এবং কোথায় যাবে?

লোকটির কথায় আমি তাকে মুসলমান ও শরীফ খান্দানের বলে মনে করলাম। তাই তাকে সত্য কথাই বললাম। আমার কথা শুনে লোকটি আমাকে তার বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। তিনি আমাকে ক্ষুধার্ত বুঝতে পেরে ঘর থেকে খাবার নিয়ে এলেন মেহমানখানায়। বললেন,

বাবা! খাবারগুলো খেয়ে নাও। কিন্তু ছায়েমাকে রেখে খানা মুখে দেয়া কি করে সম্ভব? তাই নীরবে বসে ভাবছি। লোকটি আমার অবস্থা দেখে বলল, বাবা! খাচ্ছ না যে? আমি বললাম, আমার সাথে আরো একজন ক্ষুধার্ত ব্যক্তি রয়েছে। তাকে ছাড়া খানা মুখে দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

তিনি বললেন,যাও, তাকেও নিয়ে আস। আমি বললাম, হুজুর! তার সঙ্গে এমন কিছু জিনিস রয়েছে, যা নিয়ে লোকালয়ে আসা ঠিক হবে না। আমার কথায় ভদ্রলোকটি খাবার-পানীয় নিয়ে আমার সাথে বনে গেলেন। সেখানে গিয়ে দেখি, অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ একদিকে রেখে ক্লাশিনকভটি জড়িয়ে ধরে ছায়েমা ঘুমিয়ে আছে।

ছায়েমাকে দেখে লোকটি মনে করেছে, সে একজন সেনাবাহিনীর জওয়ান। আমি আস্তে করে ছায়েমাকে ঘুম থেকে জাগালাম। ছায়েমা উঠে বসে সালাম দিল। আমি সালামের উত্তর দিয়ে তাকে নিয়ে একত্রে খানা খেলাম। লোকটি ছায়েমাকে নিয়ে ভাবছেন, আহ! কি সুন্দর চেহারা! এমন সন্তান জন্ম দেয় এমন জননী ক'জন আছে। এমন ছেলের পিতা হতে কার না সাধ জাগে।

আমরা খানা খেয়ে লোকটির পরিচয় জানতে চাইলাম। তিনি বললেন, বাবা! আমার নাম আদেল রাঈ। আমি একজন প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক ছিলাম। মৌলবাদী হওয়ার কারণে আমাকে চাকুরী থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। এখন বেকার। বাড়ীতেই সময় কাটাই।

আদেল রাঈ আমাদের অস্ত্রশস্ত্র দেখে বুঝতে পেরেছেন আমরা দ্বীনের মুজাহিদ। পত্র-পত্রিকায় বিভিন্ন আক্রমণের সংবাদ পেয়ে ভাবছেন, আমরা হয়ত ঐসব গ্রুপেরই সদস্য। তাই সন্ধ্যার পর আমাদেরকে সসম্মানে তার বাড়ীতে নিয়ে গেলেন।

আদেল রাঈ একজন দরদী ও দ্বীনদার ব্যক্তি। বাড়ীতে নিয়ে আমাদেরকে মেহমানখানায় না রেখে অন্দর মহলের একটি কক্ষে স্থান দিলেন। তারপর নিজ হাতে মেহমানদারী করে খানা খাওয়ালেন। কয়েকদিনের উপবাসী হয়ে খানা সামনে আসতেই আল্লাহর শোকর আদায় করলাম। উভয়ে খুব তৃপ্তি সহকারে আহার করলাম। আমরা আহারাদি সেরে বিছানায় শুয়ে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে

আলাপ-আলোচনা করছিলাম। এমন সময় আদেল রাঙ্গঈ আমাদের কক্ষে প্রবেশ করে বললেন, বাবা! তোমাদের তো সম্ভ্রান্ত খান্দানের ছেলে বলে মনে হয়। কিন্তু এ অবস্থায় কোত্থেকে এলে, যাবেই বা কোথায়, পিতামাতা আছে কি নেই, এসব কিছুই জানা হল না। এ ব্যাপারে বলবে কি? আমি আদি-অন্ত এক এক করে সব ঘটনা খুলে বললাম। আমাদের করুণ ইতিহাস শুনে তিনি কেঁদে ফেললেন। আহ! শব্দ অনিচ্ছা সত্ত্বেও বেরিয়ে আসল তার জবান থেকে। গণ্ডদ্বয় ভেসে যাচ্ছে অশ্রুতে।

আমাদের নির্যাতন, নিপীড়ন আর জুলুমের কাহিনী ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অপারেশনের কাহিনী ও খোদায়ী মদদের ঘটনাবলী আদেল রাঙ্গঈকে শোনালাম। তিনি বিস্ফারিত নয়নে নির্বাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। আমার কথা শুনে বললেন, বাবা! তোমার কথা শুনে ভৌগোলিক সীমারেখা পেরিয়ে কোন্ স্বপ্নালোকে চলে গেছি, তা বলতে পারব না। আদেল রাঙ্গঈ আরো বললেন, এত অল্প বয়সে জিহাদের মত এত কঠিন কাজ কি করে বেছে নিলে? ছায়েমা তার উত্তর দিতে গিয়ে বলল, মহান রাব্বুল আলামীন জিহাদ করার জন্য হুকুম দিয়েছেন। তাই আমরা জিহাদের মতো কঠিন আমলকে বরণ করতে বাধ্য হয়েছি।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহপাক ইরশাদ করেন, "তোমাদের উপর কিতাল (যুদ্ধ) ফরয করা হয়েছে; অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়। তোমাদের কাছে হয়ত কোন একটা বিষয় অপছন্দনীয়; অথচ তোমাদের জন্য তা কল্যাণকর। আর হয়ত কোন একটি বিষয়; তোমাদের কাছে পছন্দনীয়; অথচ তোমাদের জন্য তা অকল্যাণকর। বস্তুত আল্লাহ যা জানেন, তোমরা তা জান না।" (সূরা বাকারা ঃ আয়াত ২১৬)

উক্ত আয়াতে আল্লাহ পাক লড়াই করাকে নামায, রোযা, হজ্ব ও যাকাতের মতোই ফরয করে দিয়েছেন। নামায-রোযা না করলে যেমন ফরয তরকের গুনাহ হবে, তেমনি জিহাদ না করলেও ফরয তরকের গুনাহ হবে।

তাছাড়া উক্ত আয়াতে কারিমা দ্বারা এটাও প্রমাণিত হয়, আমরা যদি ওয়াজ করা, তালীম দেয়া, তাবলীগ করা, ইমামতি করা ও পীরগিরী

করাকেই একমাত্র দ্বীন মনে করে তুষ্ট হই, তবে এটা হবে নিছক গোমরাহী। আর এটা হবে দ্বীনের জন্য, সমাজের জন্য, এমনকি নিজের জন্যও অকল্যাণকর।

যদিও জিহাদ করতে কষ্ট হয়, ভাল লাগে না, মারামরি করতে হয়, রক্তারক্তি করতে হয়, সন্তানকে এতীম, স্ত্রীকে বিধবা ও মায়ের বুক খালি করতে হয়, তবু এর মধ্যেই রয়েছে অফুরন্ত কল্যাণ। কেউ যদি জিহাদকে সন্ত্রাস বলে বা নিষ্প্রয়োজন মনে করে, তবে তার ঈমান থাকবে না। একটা সুন্নাতকে যদি কেউ তিরষ্কার করে, তবে তার ঈমান থাকে না। আর ফরযকে যদি অনর্থক মনে করে বা অপছন্দ করে, তবে সে বেঈমান হবে না কেন? জিহাদ না থাকলে কোন এবাদতই সঠিকভাবে আদায় হবে না। জিহাদ হল দ্বীনের প্রতিরক্ষা বা ডিফেন্স।

জিহাদ ছাড়া সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব। সমাজে যখন কুফর-শিরক মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে, তখন জুলুম-নির্যাতন, মদ-জুয়া, চুরি-ডাকাতি, রাহাজানি, খুন, ধর্ষণ, মিথ্যা ইত্যাকার অপকর্মে গোটা সমাজ কলুষিত হয়ে যায়। গুনাহর বন্যা বইতে থাকে। আল্লাহর রহমত উঠে যায়। তখন কুফরি ফেৎনা দূর না করা পর্যন্ত শান্তি আসতে পারে না। যেমন শরীরের কোন অংশে যদি সেপটিক (নালী ঘা) হয়, তখন সব ডাক্তারই কিছু ভাল অংশসহ কেটে ফেলার নির্দেশ দেন। যদি তা না করা হয়, তবে গোটা শরীর আক্রান্ত হয়ে রোগী অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

কৃষক জমিতে যখন বীজ বপন করে, তখন বীজের সাথে সাথে আগাছা জন্মায়। সেসব আগাছা যদি পরিষ্কার না করা হয়, তবে ফসল নষ্ট হয়, উৎপাদন বা ফলন ব্যহত হয়। তাই কিছুদিন পর পর নিড়ানী দিয়ে আগাছা পরিষ্কার করতে হয়। ঠিক তেমনিভাবে কিছুদিন পরপর কাফের, মুশরিক ও নাস্তিক নামক আগাছা কেটে না ফেললে সমাজে শান্তি ও স্থিতিশীলতা ফিরে আসে না। গোটা সমাজে নেমে আসে বিপর্যয়। তাই জিহাদ অপরিহার্য।

ছায়েমা আরো বলল, মানুষ মনের আনন্দে বাগান করে। সে বাগানে এমন কিছু গাছ থাকে, যাতে ফুল-ফল কিছুই হয় না। তবুও মানুষ তাকে বাগানে রোপণ করে বা আশ্রয় দেয়। এসব পরগাছার

ডালপালা ও মাথা কিছুদিন পরপর সুন্দর করে ছেটে সাইজ করে রাখা হয়। এতে বাগানের সৌন্দর্য অনেক গুণে বৃদ্ধি পায়। আর কেটে সাইজ না করলে ডালপালা এলোমেলোভাবে এদিক-ওদিক ছড়িয়ে পড়ে। এতে বাগানের সৌন্দর্য বিনষ্ট হয়। ঠিক তেমনি কাফের মুশরেকরা দুনিয়া নামক বাগানের আগাছা-পরগাছা। এদেরকে কেটে সাইজ করে রাখা প্রত্যেক মুমিনের জন্য ফরয। এতে পাড়া-মহল্লা ও দেশ সুন্দর হবে। কাফেরদের রক্ত ঝরানোর ধারা চালু না থাকার কারণে মুসলমানদের জান-মাল, মান-ইজ্জত, তাহজীব-তামাদ্দুনের কোন নিরাপত্তা নেই। মা-বোনদের ইজ্জত লুণ্ঠিত হচ্ছে। পথে-ঘাটে, হাটে-বাজারে অকাতরে মুসলমান জবাই হচ্ছে। কোন আলেম, উলামা ও পীর-মাশায়েখগণ নিরাপদে নেই।

ছায়েমা এ সমস্ত উপমা দিয়ে শুনিয়ে দিল আল্লাহর সতর্ক বাণী, "তোমাদের কি হল তোমরা আল্লাহ রাহে লড়াই করছ না, দুর্বল সেই পুরুষ, নারী ও শিশুদের পক্ষে যারা বলে, হে আমাদের রব! আমাদেরকে এই জনপদ থেকে নিষ্কৃতি দান কর, এখানকার অধিবাসীরা যে অত্যাচারী, জালেম। আর তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য পক্ষাবলম্বনকারী নির্ধারণ করে দাও এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য সাহায্যকারী নির্ধারণ করে দাও।" (সূরা নিসা ঃ আয়াত ৭৫)

আজ দুনিয়ার মুসলিম জনপদ মুসলমানদের রক্তে রঞ্জিত। ঐ সমস্ত মজলুম মানুষের বুকফাটা চীৎকার আর ক্রন্দনরোলে আকাশ-বাতাস ভারী হয়ে উঠছে। স্বামীহারাদের আর্তনাদের জবাব দিতে, এতীমের অধিকার ছিনিয়ে আনতে, সন্তানহারা জননীর চোখের পানি মুছে দিতে, বঞ্চিতদের অধিকার আদায় করতে প্রতিটি মুসলমানের উপর জিহাদ ফরয। তাই আল্লাহর এ বিধান জিন্দা করতে আজ আমরা আমরণ জিহাদ চালিয়ে যাওয়ার বজ্র শপথ নিয়েছি।

আদেল রাঙ্গী ছায়েমার তেজোদ্দীপ্ত ভাষণ শুনে ঠিক থাকতে পারেননি। তাঁর শিরায় শিরায়, ধমনীতে ধমনীতে বিদ্যুদ্বেগে শোণিতধারা প্রবাহিত হতে লাগল। এমনকি প্রতিটি লোমকূপে শিহরণ জাগল। আদেল রাঙ্গী আরো জানার জন্য, আরো বুঝার জন্য ছায়েমাকে

প্রশ্ন করল, গত দু'দিন আগে পত্রিকায় দেখেছি, দেশের বড় বড় আলেমগণ তুর্কী বীর আনোয়ার পাশার বিরুদ্ধে ফতোয়া দিয়েছেন। তাহলে তারা কি এসব আয়াত পড়েননি?

ছায়েমা আদেল রাঈর প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বলল, হ্যাঁ, ঐ সমস্ত আলেম এসব আয়াত পড়েছেন। কিন্তু জিহাদ এমন কঠিন কাজ, যেখানে জান-মাল উভয়টি ব্যয় হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এ কারণে ঐ সমস্ত আলেম নিজেরা জিহাদ করেন না, আবার যারা জিহাদ করেন, তাদেরকে বাধা প্রদান করছেন। প্রকৃতপক্ষে এরা মুসলমানই নন। কোন মুসলমান জিহাদের বিরোধিতা করতে পারেন না। এরা হল মুনাফিক। এসব লোকের জানাযার নামায পড়াও দূরস্ত নয়।

আল্লাহতায়ালা স্পষ্ট ভাষায় নবী করীম (সাঃ)-কে ধমক দিয়ে বলেন, "তাদের মধ্যে থেকে কারো মৃত্যু হলে তার জানাযা পড়বেন না এবং তার কবরে দাঁড়াবেন না। তারা তো আল্লাহর প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছে এবং রাসূলের প্রতি। বস্তুত তারা নাফরমান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে। (সূরা তওবা ঃ আয়াত ৮৪)

উক্ত আয়াতের কারীমা দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয়, যারা জিহাদ করে না বা অন্যকে বাধা দেয়, তারা মুসলমান নয়। এরা মুনাফিক, নাফরমান। এদের নামাযে জানাযা পড়া এবং এদের কবর জিয়ারত করা, এদের আত্মার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করাও জায়েয নয়।

ছায়েমা আরো বলল, হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, মহানবী (সাঃ) ইরশাদ করেন, "যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মারা গেল যে, সে কখনো জিহাদে অংশগ্রহণ করেনি আর তার অন্তরে কোনদিন জিহাদ করার সাধও জাগেনি, সে এক প্রকার মুনাফেকির উপর মারা গেল।" (মুসলিম)

উক্ত হাদীস শ্রবণ করে আদেল রাঈ কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, হায় হায়! আমার কি অবস্থা হবে? আমি তো জিহাদ করিনি। আর কি অবস্থা হবে ঐ আলেমদের, যারা জিহাদ করছে না। অথচ অন্যদেরকেও বাধা দেয়। আয় আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা কর। আমি এখন থেকে জিহাদ করব বলে প্রতিজ্ঞা করলাম।

তিনি আরো বললেন, বাবা! এখন থেকে তোমাদের আর কোন

চিন্তা নেই। তোমারা যতদিন ইচ্ছা এখানেই থাকবে। আর আমাদেরকে জিহাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে, জিহাদের বাণী শুনিয়ে জিহাদে পাঠিয়ে দেবে। এখন থেকে যুবকদেরকে জিহাদ বুঝাবে, তাদেরকেও জিহাদের জন্য তৈরি করবে।

আদেল সাহেবের প্রতিক্রিয়া দেখে আমি বললাম, জনাব! শুধু আবেগের দ্বারা জিহাদ হয় না। জিহাদ করতে হলে জান-মাল, চিন্তা-চেতনা, মেধা খরচ করতে হয়। তাছাড়া আরো কিছু গুণ অর্জন করতে হবে। যেমন আল্লাহ পাক পবিত্র কালামে মুজাহিদদের গুণাবলীর বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে, "তারা তওবাকারী, এবাদতকারী, শোকরগোজার, দুনিয়ার সাথে সম্পর্কচ্ছেদকারী, রুকু ও সিজদা আদায়কারী, সৎ কাজে আদেশ দানকারী ও মন্দ কাজে নিবৃতকারী এবং আল্লাহর দেয়া সীমাসমূহের হেফাজতকারী। বস্তুত সুসংবাদ দাও ঈমানদানদেরকে।" (সূরা তওবা ঃ আয়াত ১১২)

জিহাদ করতে হলে প্রত্যেক মুজাহিদদের এসব গুণাবলী অর্জন করতে হবে। তাছাড়া ভীরুতা ও কাপুরুষতা দূর করে বীরত্ব ও বাহাদুরী অর্জন করতে হবে। জান-মাল, সন্তান-সন্তুতির মায়া ত্যাগ করে দ্বীনের মহব্বত দিলে পয়দা করতে হবে। তাছাড়া কান্নাকাটির মাধ্যমে আল্লাহর নিকট থেকে চেয়ে নিতে হবে। তারপর আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা রেখে জিহাদের রাস্তায় কদম রাখতে পালে আল্লাহ মদদ ও নুছরত দান করবেন এবং বিজয়ের মালা পরিধান করাবেন। এতে কোন সন্দেহ নেই।

আমার কথা শুনে আদেল রাঙ্গী ঘাবড়ে গিয়ে বললেন, তাহলে তো জিহাদ করতে হলে আলেম হতে হবে। আমরা তো তা পারব না। আদেল রাঙ্গীয়ের সন্দেহ দূর করতে গিয়ে ছায়েমা বলল, প্রয়োজনীয় এলেম হাছেল করা তো প্রতিটি মুসলিম নর-নারীর উপর ফরয। তবে বড় আলেম ছাড়া জিহাদ করতে পারবে না, এমনটি নয়। যুদ্ধের কলাকৌশল যে যত বেশী শিখতে পারবে, সে তেমন বড় কমান্ডার হতে পারবে। হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রাঃ) তত বড় আলেম ছিলেন না। পবিত্র কুরআনের ছোট ছোট মাত্র ৪টি সূরা তার মুখস্ত ছিল। কিন্তু দুনিয়ার ইতিহাসে তিনি ছিলেন নামকরা যোদ্ধা ও রণকৌশলী।

জীবনে যাকে কখনো পরাজয়ের গ্লানি ভোগ করতে হয়নি।

আদেল রাঈর সাথে কথোপকথনে কয়েক ঘন্টা কেটে গেল। এখনো নামায পড়া হয়নি। তাছাড়া বিশ্রাম করতে হবে। আমাদের মনোভাব বুঝে তিনি অযুর পানি দিলেন। অযু করে নামায পড়ে দেখি খানা হাজির। আমরা খানা খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।

ভোরে নিদ্রা ভঙ্গ হলে ফজরের নামায আদায় করে দু'জনে তিলাওয়াতের প্রতিযোগিতায় লেগে গেলাম। আমাদের তিলাওয়াতযুদ্ধ দেখে আদেল সাহেব অবাক-বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলেন। এভাবে এশরাক পর্যন্ত তেলাওয়াত চলল। তারপর এশরাকের নামায পড়ে নাস্তা খেয়ে একটু হাঁটাহাঁটি করার ইচ্ছে করলাম। আদেল সাহেব এতে রাজি হলেন এবং বললেন, রাস্তায় কেউ তোমাদের কোন প্রশ্ন করলে বলবে, তোমরা আদেল সাহেবের মেহমান, বাড়ী পিলিউডে। পিলিউড একটি থানা শহর। এখান থেকে আট মাইল উত্তরে। পিলিউডের আনার ফল খুব প্রসিদ্ধ। এখান থেকে বিভিন্ন স্থানে এই ফল রফতানি হয়।

ছায়েমা আদেল সাহেবকে প্রশ্ন করে জানতে চাইল, সেখানে তার কোন আত্মীয় আছে কিনা। আদেল সাহেব বললেন, সেখানে আমার শ্বশুর বাড়ী। তোমাদের বয়সের আমার দু'তিনজন শ্যালক আছে, ওরা মাঝে মধ্যে বেড়াতে আসে। ছায়েমা বলল, তাহলে কি আপনি আমাদের দুলা ভাই। এই বলে সে হেসে ফেলল। এতদিন পর ছায়েমার মুখে হাসি দেখে সত্যিই খুব ভাল লাগল। আদেল সাহেব তো যেন মনে করে বললেন, এখন বেড়াতে না গিয়ে বিকেলে যাও। আমিও যাব। আমরা তাই করলাম। গল্প-গুজব আর তিলাওয়াতের মধ্যদিয়ে সময় অতিবাহিত করলাম।

পড়ন্ত বেলা। আছরের নামায পরে নাস্তিকদের পোশাক পরিধান করে আদেল সাহেবের সাথে চলছি বাজারের পথ ধরে। রাস্তায় হাত ধরাধরি করে হাঁটছে অগণিত যুবক-যুবতী। কেউ কাঁধে হাত রেখে চলছে। মাঝে-মধ্যে একে অপরকে ধরে আলিঙ্গন করছে, চুমু খাচ্ছে। আরো কত বেহায়াপনা নজরে পড়ল।

আমি আদেল সাহেবকে জিজ্ঞেস করলাম, ওরা কি স্বামী-স্ত্রী? আদেল সাহেব বললেন, আরে না, ওরা একে অপরের বন্ধু। ছায়েমা

বলল, না ওরা কুকুর-কুকুরী। এমন পশুর স্বভাব মানুষের হতে পারে না। আমি বললাম, আমরা এসব দৃশ্য দেখতে আসিনি। চলুন, বাড়ী ফিরে যাই। তারপর বাড়ী ফিরে মাগরিবের নামায পড়ে তিলাওয়াতে বসলাম। এর মধ্যে এশার সময় হলে নামায পড়ে আল্লাহর নিকট মুনাজাত করলাম—

হে আল্লাহ! আমাদের পাপরাশি ক্ষমা কর। আমরা তোমার দয়ার ভিখারী। অতীতেও দয়া করেছ, ভবিষ্যতেও করবে বলে আশা রাখি। বিজয় তো তোমারই কুদরতী হাতে। তাই বিজয়ের প্রার্থনা করি। তোমার যমিনে তোমারই খেলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য, দ্বীনকে গালেব করার জন্য যুদ্ধ করি। শাহাদাতের আশায় পাগল হয়ে ঘুরছি। দ্বীনকে বিজয়ী করার পর শাহাদাতের অমৃত সুধা পান করার তওফীক দাও। ছায়েমার চোখে অশ্রুর বান। আমীন! আমীন! শব্দে গৃহের নীরবতা ভঙ্গ হল।

মোনাজাত শেষ করে দেখি, আদেল সাহেব খানা নিয়ে এসেছেন। আমরা খানা খেয়ে পরামর্শে বসলাম। আদেল সাহেবও আমাদের পরামর্শে শামিল হলেন। ছায়েমা বলল, ভাইজান! এখানে শুধু শুধু বেড়ান আর ভাল লাগছে না। চলুন, জামবুলে চলে যাই। আমি বললাম, তা অবশ্যই। কিন্তু যাব কিভাবে? রাস্তা তো নিরাপদ নয়। কত হাটবাজার, শহর-বন্দর পার হতে হবে। এসব হাতিয়ার নিয়ে যাওয়া কি সম্ভব। তাছাড়া চারদিকে বলসেভিকদের অত্যাচার।

আমাদের সমস্যা দেখে আদেল সাহেব বললেন, আরে বাবা! ওসব চিন্তা করতে হবে না। কয়েকটি প্রদেশ আমি সফর করেছি। রাস্তাঘাট, অলিগলি সব আমার জানা। কোথায় কিভাবে কোন্ যানবাহনে যেতে হবে, সবই আমি জানি। আমি তোমাদেরকে নিরাপদে পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করব ইনশাআল্লাহ।

কিন্তু অস্ত্রগুলো নেব কিভাবে? ছায়েমা আদেল সাহেবকে জিজ্ঞেস করল। আদেল সাহেব বললেন, তার ব্যবস্থাও আমি করব। দূরগামী টাঙ্গাওয়ালারা ঘোড়ার খাবারের জন্য ঘাস, পানি, খৈল ও ভূষি বস্তা ভরে সাথে নিয়ে যায়। তোমাদের ছামানাগুলো ওসব বস্তায় ভরে নেয়া যাবে। আমি নিজেই তোমাদেরকে নিয়ে ওয়েন্টিপল শহরে পৌঁছে দেব। ওখান থেকে ট্রেনে বা টাঙ্গায় চড়ে জামবুল যেতে

পারবে। তবে টাঙ্গায় যাওয়াটাই বেশী নিরাপদ। টাঙ্গায় কোন চেক হয় না। আর অন্যসব যানবাহনে চেক হয়। আদেল সাহেবের পরামর্শ আমাদের জন্য রহমতই মনে হল।

আদেল সাহেব আমাদের রেখে তার পড়শি কামাল ডারের বাড়ী গেলেন। কামাল ডার একজন টাঙ্গা চালক। এলাকায় তার খুব সুনাম। এত সুনাম অর্জন করার কারণ, তার অশ্ব দু'টি টাঙ্গা নিয়ে বাতাসের আগে চলে। তাই দূরদূরান্ত থেকে টাঙ্গা ভাড়া করার জন্য লোকজন তার কাছে আসে। আদেল সাহেব কামাল ডারের নিকট গিয়ে বিস্তারিত আলাপ করে যাওয়ার রাস্তা ও সময় নির্ধারণ করে আসলেন।

আদেল সাহেব যখন টাঙ্গার জন্য কামাল ডারের বাড়ী গেলেন, তখন অন্দর মহল থেকে কে যেন বললেন, বাবা! তোমরা তো দ্বীনের মুজাহিদ ও আল্লাহর পথের মুসাফির। তোমাদের কোন খেদমত করতে পারলাম না। আশা করি ক্ষমাসুন্দর নজরে দেখবে। কথাগুলো বলছিলেন আদেল সাহেবের পর্দানশীল পত্নী মিসেস মালিকা। আবার ভিন্নকণ্ঠে মধুর সুরে কে যেন বলছে, মুসাফির ভাইয়া! তোমাদের অনেক কষ্ট হচ্ছে। তাই বুঝি পালানোর এত সব আয়োজন। আমি মাথা তুলে তাকিয়ে দেখি মেঘের আড়ালে চাঁদ হাসছে। অর্থাৎ মিসেস মালিকার একমাত্র সুন্দরী কন্যা জামিলা। জামিলা উড়নীতে মুখ ঢেকে কথা বলছে। জামিলার বয়স চৌদ্দ কি পনের হবে।

আমি তাদের কথার উত্তর দিতে গিয়ে বললাম, আপনাদের এখানে আমরা খুব বেশি আনন্দ উপভোগ করেছি। জামিলা তার কান্না থামিয়ে বলল, জীবনে কোন দিন কি আবার এ গরীবালয়ে পদার্পন ঘটবে? মনে থাকবে কি বোনটির কথা? আমি বললাম, তোমার মুসাফির ভাইয়া কোনদিন কাউকে ভুলতে পারে না। আমার কথা শুনে ঠোঁটে মুচকি হাসির রেখা টেনে নিজ হাতের আংটিটা খুলে আমার দিকে নিক্ষেপ করে বলল, এটা আঙ্গুলে পরিধান করেন তো, দেখি কেমন মানায়। আমি লজ্জায় নতশীরে একমাত্র তার মনোরঞ্জনের জন্য আংটিটা পরিধান করলাম। জামিলা হেসে বলল, কত সুন্দর মানিয়েছে!

ছায়েমা আমার পাশে বসা ছিল। সেও হেসে বলল, দেখি দেখি কেমন মানিয়েছে? আমি হাতটা বাড়িয়ে দেয়ার সাথে সাথে বাজ পাখির

মত ছো মেরে আংটিটা নিয়ে নিজের আঙ্গুলে লাগিয়ে বলল, এবার দেখেন তো কার হাতে বেশী মানিয়েছে? ছায়েমার দৃশ্য দেখে জামিলা হেসে উঠল।

ছায়েমা বলল, মহানবী (সাঃ) জীবনে কোনদিন স্বর্ণের আংটি পরেননি। স্বর্ণ ব্যবহার করা পুরুষদের জন্য হারাম করা হয়েছে। স্বর্ণ একমাত্র মহিলারাই পরতে পারে! এখন থেকে এ আংটি আমার।

ছায়েমার কথা শুনে জামিলার মাথায় যেন বজ্রপাত হল। সে বলে উঠল, তার মানে আপনি কি নারী? কয়েকদিন আমাদের এখানে রইলেন তারপরও তো আমরা এতটুকু ধরতে পারিনি যে, আপনি একজন নারী। জামিলার কথা শুনে ছায়েমা খুব লজ্জা পেল। হায়! মাছলা বলতে গিয়ে আমার পরিচয় আমি নিজেই ফাঁস করে দিলাম।

আদেল রাঈ ওদিক থেকে ফিরে এসে জানালেন, আজ কিছুতেই যাওয়া সম্ভব হবে না। আগামীকাল ফজরের সাথে সাথে ওখান থেকে টাঙ্গা ছেড়ে যাবে। আজ রাতে ঘোড়াটিকে ভালভাবে খাওয়াবে আর টাঙ্গাটি তেল দিয়ে গতিশীল করে নেবে। আদেল সাহেবের কথা শুনে বেগম আদেল ও জামিলা খুব খুশি হল। আরো একদিন মেহমানদেরকে পেয়ে গেলেন।

নিরুপায় হয়ে আমাদেরকে থাকতেই হল। এবার জামিলা ছায়েমার সাথে অনেক ভাব জমিয়েছে। দিনমান রুমের অভ্যন্তরে বসে দু'জনে শুধু জিহাদের আলাপ করছে। আদেল রাঈ তা দেখে জামিলাকে ডেকে বললেন, মা! আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহকে ভয় কর! জামিলা পিতার মনোভাব বুঝতে পেরে বলল, আব্বা! সে যে এক তরুণী! তার কাছ থেকে যুদ্ধের কিছু কলাকৌশল শিখছি। আদেল রাঈ বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলেন, সত্যিই কি সে একজন মেয়ে! তার কথাবার্তা আচার-আচরণে আমার অনেক সন্দেহ ছিল। তা এখন দূর হল। বাপ-বেটির কথোপকথন মা মালিকাও শুনে আশ্চর্য হলেন। সুবহানাল্লাহ! সুবহানাল্লাহ! একজন মহিলা হয়ে আল্লাহর দ্বীনের জন্য কতইনা কুরবানী পেশ করছে!

রাতে ছায়েমা বেগম আদেল ও জামিলাকে কয়েকটি অস্ত্র চালনা শিক্ষা দিয়ে তাদের হাতে একটি থ্রি-নট-থ্রি ও তিনটি গ্রেনেড হস্তান্তর

করল এবং প্রয়োজনীয় মাছলা-মাছায়েল ও দিক-নির্দেশনা দিল। এসব কাজ সমাধা করে খানাপিনা সেরে আমরা ঘুমিয়ে পড়লাম। খুব ভোরে ওঠে ফজর নামায পড়ার সাথে সাথে আদেল সাহেব নাস্তা এনে বললেন, নাস্তা খেয়ে তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নাও। টাঙ্গা কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে যাবে। আমরা নাস্তা শেষ করতে না করতেই খট্ খট্ শব্দে টাঙ্গাওয়ালা এসে আঙ্গিনায় হাজির। আদেল সাহেব টাঙ্গার মালিক কামাল ডারকে নিয়ে ঘাস ও ভূষির বস্তায় সবগুলো অস্ত্র লুকিয়ে রাখলেন।

[পঁচিশ]

আমরা মালিকা ও জামিলাকে বিদায়ী ছালাম জানিয়ে ও দোয়া কামনা করে টাঙ্গায় উঠলাম। মালিকা বেগম আমার হাতে কিছু টাকা গুঁজে দিয়ে বললেন, এগুলো রাখ, প্রয়োজনে খরচ করো। আমরা তোমাদের কিছুই তো করতে পারলাম না। জামিলা পাশে দাঁড়িয়ে অশ্রুসজল নয়নে বলল, মুসাফির ভাইয়া! আবার আসবেন কিন্তু।

কামাল ডার তার গদীতে উঠে মৃদু চাবুকাঘাত করতেই ঘোড়া দ্রুত এগিয়ে চলল। এখান থেকে ওয়েন্টিপল পৌঁছতে আশি মাইল পথ পাড়ি দিতে হবে টাঙ্গায়। মাঝে-মধ্যে বিশ্রাম ও ঘোড়ার ঘাস-পানি খাওয়াতে সময় লাগবে। সব মিলিয়ে তিনদিনের আগে সেখানে পৌঁছা কিছুতেই সম্ভব নয়।

আমরা টাঙ্গায় বসে আল্লাহর সৃষ্টির সৌন্দর্য দেখতে লাগলাম। কখনো আল্লাহর জিকির, কখনো গল্প-গুজব, কখনো মাছলা-মাছায়েল আলোচনা করছি। মাঝে-মধ্যে বিশ্রাম ও নামায পড়া ছাড়া আর কোন বিরতি নেই। এভাবে প্রায় পঁচিশ-ছাব্বিশ মাইল পথ অতিক্রম করতেই সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। এখন পথচলা আর সম্ভব হবে না। তাই রাত যাপনের জন্য একটা স্থান বেছে নিতে হবে। কামাল ডার বললেন, এ পর্যন্ত কোন সরাইখানা পেলাম না। কাজেই সামনের বড় বৃক্ষের নীচেই রাত যাপন করব। আমরা বৃক্ষের নীচে গিয়ে বসলাম। কামাল ডার টাঙ্গা থেকে অশ্ব দু'টি খুলে নিয়ে কাঁচা ঘাসে ছেড়ে দিলেন। তারপর সবাই নামায আদায় করে বিশ্রাম নিচ্ছি। কামাল ডার আমাদেরকে বসিয়ে রেখে চলে গেলেন পানির সন্ধানে।

ছায়েমা একটি ব্যাগ থেকে শুকনো রুটি আর ভুনা গোশত বের

করে সবাইকে খেতে দিল। আমি আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, ছায়েমা! এগুলো কোথায় পেলে? সে উত্তর দিল, আমরা রওনা হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে জামিলা এসে এগুলো ব্যাগে ভরে দিয়েছিল।

আমরা খানা খেয়ে শুয়ে পড়লাম। একেকজন তিন ঘন্টা পালা করে পাহারা দিয়ে রাত অতিবাহিত করলাম। ভোরে উঠে নামায আদায় করে কিছু নাস্তা খেয়ে আবার উয়েন্টিপলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম।

প্রথম দিনের মত গল্প-গুজব আর জিকিরের মধ্যদিয়ে পথ চলছি। এক পর্যায়ে আদেল রাঈ আমাকে উদ্দেশ করে বললেন, খোবায়েব! গত রাতে আমি একটি দুঃস্বপ্ন দেখেছি। আল্লাহ ভাল জানেন এটা কিসের সংকেত। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কি স্বপ্ন দেখে এত চিন্তিত হলেন, তা কি বলা যায়? আদেল সাহেব বললেন, কয়েক বছর আগে আমার শ্বশুর হজ্বব্রত পালনের জন্য পবিত্র মক্কা গিয়েছিলেন। ফেরার পথে আমার জন্য উপঢৌকন হিসেবে একটি ইয়ামেনী চাদর এনেছিলেন। চাদরটি অনেক মূল্যবান। স্বপ্নে দেখি, আমার চাদরখানা আর মাথার টুপি চোরে নিয়ে গেছে। আল্লাহ জানেন এর কি ব্যাখ্যা।

ছায়েমা অল্প ক্ষণ চিন্তা করে নিয়ে বলল, খোবায়েব ভাইয়া! এ যে এক খারাপ স্বপ্ন! আমি ছায়েমাকে ধমক দিয়ে বললাম, আরে স্বপ্ন তো স্বপ্নই। এর জন্য মন খারাপ করা বা চিন্তিত হওয়ার কি আছে! ছায়েমা মুখ ভার করে বলল, তুমি তো আমার কথার পাত্তাই দিলে না। আসলে এটা দুঃস্বপ্নই বটে। স্বপ্ন শুধু স্বপ্নই নয়, স্বপ্ন নবুওতের অংশও।

ছায়েমার কথায় আমি চুপসে গেলাম এবং জিজ্ঞেস করলাম, তাহলে তুমি কী মনে কর? ছায়েমা বলল, পবিত্র কালামে আল্লাহতায়ালা নারীকে পুরুষের লেবাস বলেছেন। আর চাদর লেবাসেরই অন্তর্ভুক্ত। আমার মনে হয়, আদেল সাহেবের পর্দানশীল পত্নী ও তার একমাত্র কন্যা জালিমাকে বলসেভিকরা ধরে নিয়ে গেছে। মৌলবাদী হওয়ার অভিযোগে ওরা তাকে চাকুরী থেকে অব্যাহতি দিয়েছিল। কাজেই, ওদের শ্যানদৃষ্টি এদিকে অনেক আগে থেকেই। আমার তাবির যদি সত্য হয়, তবে এদেরকে উদ্ধার করা আমাদের উপর ফরয এবং ঈমানী দায়িত্ব।

ছায়েমার পরামর্শ আমার নিকট খুব মূল্যবান মনে হল। ছায়েমা কথাগুলো বলছিল খুবই চুপে চুপে, যেন আদেল সাহেব তা শুনতে না পান। আমি আদেল সাহেবকে বললাম, জনাব! সামনে যেতে মন চাচ্ছে না, চলুন, আমরা ফিরে চলে যাই। চার-পাঁচদিন পর আবার আসব। আদেল সাহেব আমার কথায় সম্মতি দিলেন। তার মনটা ভাল নয়। স্বপ্নটা তাকে ভাবিয়ে তুলেছে। তিনি বললেন, আরে বেটা! আগেই তো বলেছিলাম আরো ক'দিন থাকবে। এখন এতদূর পাড়ি দিয়ে এসে ফিরতে হচ্ছে। ঠিক আছে চল। বলেই কামাল ডারকে নির্দেশ দিলেন, টাঙ্গা বাড়ীর দিকে হাঁকাও। কামাল ডার তাই করলেন। তবে কামালের মুখ ভারাক্রান্ত। ছায়েমা তা লক্ষ্য করে কামাল ডারকে বলল, আরে ভাই! তোমার চিন্তা কিসের, তোমাকে পুষিয়ে দেয়া হবে। কামাল ডার হেসে ফেললেন।

রাত এগারটার দিকে আমরা আদেল সাহেবের আঙ্গিনায় এসে হাজির হলাম। আদেল সাহেব বাড়ীর ভেতর ঢুকে দেখেন, সবগুলো দরজা খোলা। লোকজন নেই। তিনি জামিলাকে ডাক দিলেন। কিন্তু কোন সাড়া পাওয়া গেল না। আদেল সাহেবের ডাকাডাকি শুনে পাশের বাড়ী থেকে একজন মহিলা বেরিয়ে এসে বলল, ভাইজান! গতকাল বিকেলে সাত-আটজন পুলিশ এসে আপনার বাড়ী ঘেরাও করে। আপনাকে না পেয়ে ভাবী ও জামিলাকে ধরে নিয়ে গেছে। আপনার নামে নাকি মৌলবাদী মামলা রয়েছে। পুলিশের সাথে গ্রামের কয়েকজন যুবকও ছিল।

মহিলার কথা শুনে আদেল সাহেব কেঁদে ফেললেন। আমরা আদেল সাহেবকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, জনাব! আপনি এত বিচলিত হবেন না। আপনি শান্ত হোন, ধৈর্যধারণ করুন। ছায়েমা বলল, জনাব! আমরা আটাশ মাইল পথ পাড়ি দিয়ে পুনরায় ফিরে এসেছি তাদের উদ্ধার করতে। আপনি আল্লাহর কাছে দোয়া করুন। মজলুমের দোয়া আল্লাহ কবুল করেন।

আমি টাঙ্গাওয়ালাকে তার ভাড়া পুষিয়ে দিয়ে বিদায় করলাম। টাঙ্গাওয়ালা খুশিতে বাগ বাগ হয়ে চলে গেলেন। আমরা পরামর্শে বসে গেলাম। ছায়েমা প্রথমেই বলল, এখানে অবস্থান নেয়া ঠিক হবে না। যে

কোন সময় এ বাড়ীতে পুলিশী হামলা হতে পারে। তাই এখান থেকে অন্যত্র গিয়ে পরামর্শ করা যাবে।

ছায়েমার কথায় আমরা বাড়ীতে না বসে জঙ্গলে চলে গেলাম। সেখানে গিয়ে নামায পড়ে পরামর্শে বসলাম। ছায়েমা বলল, পরামর্শে দীর্ঘ সময় নষ্ট না করে দ্রুত প্রতিশোধের জন্য ব্যবস্থা নিতে হবে। আজ রাতেই নরাধম হায়েনাদের উপর হামলা চালাতে হবে। বন্দীদের মুক্ত না করা পর্যন্ত ঘরে ফেরা যাবে না।

ছায়েমা আদেল সাহেবকে থানার রাস্তা জিজ্ঞেস করলে আদেল সাহেব উত্তর দিলেন, বাবা! রাস্তা তো চিনি, তবে একটি থানার উপর আক্রমণ করা দু'তিনজনের দ্বারা কি করে সম্ভব? ছায়েমা উত্তরে বলল- মহান রাব্বুল আলামীন পবিত্র কালামে বলেছেন, "তোমরা বের হয়ে পড় স্বল্প বা প্রচুর সরঞ্জামের সাথে এবং জিহাদ কর আল্লাহর পথে নিজেদের মাল ও জান নিয়ে। এটি তোমাদের জন্য অতি উত্তম, যদি তোমরা বুঝতে পার।" (সূরা তওবা ঃ আয়াত ৪১)

উক্ত আয়াতে কারিমা দ্বারা এটাই প্রতীয়মান হয় যে, লোকসংখ্যা বেশী হোক চাই কম হোক, অস্ত্রশস্ত্র ভারী হোক কিংবা হাল্কা হোক, দুর্বল হোক চাই সবল হোক; সর্বাবস্থায়ই জিহাদের জন্য বের হতে হবে। বের হওয়াটাই অতি উত্তম। আমরা পবিত্র আয়াতকে পুঁজি করে আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা রেখে যদি আক্রমণ করতে পারি, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ সাহায্য করবেন ও কামিয়াবী দান করবেন।

ছায়েমার পরামর্শ অনুযায়ী আমরা দু'টি এসএলআর, তিনশ' গুলী, একটি লাঞ্চার, একটি রকেট ও চারটি গ্রেনেড নিয়ে হামলার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। আদেল সাহেব আগে আগে পথ দেখিয়ে চলছেন। সকলের অন্তরেই প্রতিশোধের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে। অপরদিকে বন্দী মুক্তির তীব্র আকাঙ্খায় মনে খুশীর ফোয়ারা বইছে। মুহূর্তের মধ্যে পাঁচ মাইল পথ কি করে চলে আসলাম, তা টেরও পেলাম না।

আমি সবাইকে থানার অদূরে বসিয়ে রেখে তথ্য সংগ্রহের জন্য বেরিয়ে পড়লাম এবং অল্প সময়ের মধ্যেই ফিরে এলাম। ছায়েমা অধীর আগ্রহে রিপোর্ট জানতে চাইলে আমি বললাম, এখানে আক্রমণ করা কোন ব্যাপার নয়। মাত্র একজন প্রহরী থ্রি-নট-থ্রি

নিয়ে পাহারা দিচ্ছে। বাকিরা নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে।

ছায়েমা হামলার পদ্ধতি জানতে চাইলে বললাম, আমরা একটু দূর থেকে ক্রলিং করে থানার উত্তর পাশে দেয়ালের পিছনে পজিশন নেব। তারপর কৌশলে পাহাদারকে বন্দী করে বাকি কাজ সমাধা করব।

পূর্ব পরিকল্পনা মতো আমরা দেয়ালের পেছনে গিয়ে অবস্থান নিলাম। ছায়েমা ও আদেল সাহেব আমার পাশে। বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর দেখি, পাহারাদার টয়লেটে প্রবেশ করছে। আমি ওদেরকে প্রতিরক্ষার জন্য রেখে একাই গিয়ে টয়লেটের পাশে গিয়ে ফায়ার পজিশনে দাঁড়িয়ে রইলাম।

পাহারাদার দরজা খোলার সাথে সাথে বেরেলটি তার বুক বরাবর উঠিয়ে বললাম, খামুশ, আমি মুজাহিদ, অস্ত্র সমর্পণ কর। আমার 'খামুশ' শব্দ প্রতিধ্বনিত হতে থাকল। কাঁপতে কাঁপতে পাহারাদারের হাত থেকে অস্ত্র খসে পড়ল। আমি অস্ত্রটি আমার জিম্মায় এনে পাহারাদারকে বন্দী করলাম। তারপর চুপি চুপি জিজ্ঞেস করলাম, মুসলিম মহিলা দু'জনকে কোথায় রাখা হয়েছে? পাহারাদার উত্তর দিল, ওরা তো দু'জন নয়, প্রায় আট-দশজন। ওদেরকে ঐ ঘরে তালাবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। আমি বললাম, ঐ ঘরে কি কোন পুলিশ আছে? সে বলল, না রাত এগার-বারটা পর্যন্ত অফিসাররা ঐ ঘরেই ছিল। তারপর যার যার রুমে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। চাবির কথা জানতে চাইলে চাবি তার প্যান্টের পকেটে আছে বলে জানাল।

পাহারাদারের প্যান্টের পকেট থেকে চাবি বের করে তালা খুলে আমি ঘরে প্রবেশ করলাম। এখনো প্রদীপ মিট মিট করে জ্বলছে। চেয়ে দেখি, যুবতীরা বিবস্ত্র অবস্থায় কাতরাচ্ছে। কয়েকটি খালি মদের পাত্র বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে আছে। এরকম দৃশ্য অবলোকন করে আমি চোখের পানি সামলাতে পারলাম না।

আমার দরজা খোলার শব্দ পেয়ে মহিলারা আরো বেশি ভয় পেয়ে গেল। ওরা মনে করেছে, পাষণ্ডরা হয়ত আবার পাশবিক অত্যাচার করার জন্য ঘরে ঢুকেছে। আমি ওদেরকে উদ্দেশ করে বললাম, হে আমার মা ও বোনেরা! এখন থেকে তোমরা মুক্ত। জলদি এ নরক থেকে বেরিয়ে পড়।

আমার কণ্ঠ শুনে জামিলা আমাকে চিনে ফেলল। সে আমাকে জড়িয়ে ধরে বলল, মুসাফির ভাইয়া! তুমি না দু'দিন আগে চলে গেলে? তোমার বোনকে মুক্ত করতে আবার কোত্থেকে এলে? আমি হাতের ইশারায় চুপ থাকতে নির্দেশ দিলাম। অন্যান্য মহিলারা মুক্ত হয়ে নিজ নিজ গৃহাভিমুখে ছুটে চলল। আমি মালিকা বেগম ও জামিলাকে আদেল সাহেবের নিকট পৌঁছিয়ে দিয়ে বললাম, আপনি ওদেরকে নিয়ে বাড়ী চলে যান। যদি সম্ভব হয়, গনীমতের জন্য একটু পথ এগিয়ে আসবেন।

আমাদের আদেল সাহেবকে বিদায় করে দিয়ে আমি ছায়েমাকে নিয়ে প্রচণ্ড হামলা চালালাম। ছায়েমা প্রথমেই অফিসার ব্যারাকে রকেট নিক্ষেপ করল। পরপর দু'টি রকেট আঘাত হানায় চারতলা ভবন মাটির সাথে মিশে গেল। তারপর অস্ত্রাগারের পাঁচজন পুলিশ আত্মসমর্পণ করে। আমরা তাদেরকে ব্রাশফায়ারে হত্যা করে বেশকিছু প্রয়োজনীয় অস্ত্র ও গোলাবারুদ কব্জায় এনে বাকি অস্ত্রগুলো গ্রেডেন নিক্ষেপ করে ধ্বংস করে দিলাম।

এরপর গনীমতের মালগুলো স্থানান্তর করতে লাগলাম। হঠাৎ দু'তিনজন মানুষের ছায়ামূর্তি চোখে ভেসে উঠতেই ছায়েমাকে নিয়ে আমি ফায়ার পজিশনে জমিনে শুয়ে পড়লাম। আমি ফায়ার করার হুকুম দিলে ছায়েমা কানে কানে বলল, ভাইজান! বেয়াদবী মাফ করবেন। দুশমনের গতিবিধি লক্ষ্য করে এবং দুশমন শনাক্ত করে ফায়ার করতে হয়। আমরা একটু পরে ফায়ার করি।

ছায়েমার বিচক্ষণতার কাছে আমি কখনো হার না মেনে পরিনি। এক পর্যায়ে ছায়েমা নিজেই বলে উঠল, জামিলা! তোমরা কাকে খুঁজছে? এখনো বাড়ীতে যাওনি! ছায়েমার ডাকে আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম। ওরা তিনজন দৌড়ে আসল। আদেল সাহেব বললেন, তোমাদেরকে এভাবে রেখে আমরা চলে যাব, এটা কি করে হয়? জামিলা বলল, মুসাফির ভাইয়া! তোমরা যে আমাদেরকে শত্রুর কবল থেকে উদ্ধার করেছ! তোমাদেরকে একা রেখে আমরা যাব না। তোমরা যেদিকে যাও আমাদেরকে নিয়ে চল। বেগম আদিল একই কথা বললেন। আমরা বললাম, আমাদের সাথে পথে পথে ঘুরে বেড়ান আপনাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

ছায়েমা আমাকে ডেকে বলল, খোবায়েব ভাইয়া! রাত কিন্তু বেশি নেই। এখনই যদি মাল-ছামানা নিয়ে নিরাপদে যেতে না পারি, তবে মহাবিপদের সম্মুখীন হতে হবে। আমি বললাম, তা অবশ্য ঠিক। চল অন্যত্র চলে যাই। সবাই ভাগাভাগি করে মাল-ছামানাগুলো বহন করে কয়েক কিলোমিটার দূরে চলে আসলাম ও একটি গভীর অরণ্যে আশ্রয় নিলাম। ছুবেহ ছাদেক হয়ে গেছে। একটু পরেই উদিত হবে ভোরের সূর্য। আমরা নামায পড়ে পরামর্শ করলাম, কি করা যায়।

ছায়েমা আদেল সাহেবকে বলল, জনাব! আজকের ঘটনায় কমিউনিস্টদের খবর হয়ে যাবে। আগামীকাল থেকেই চলবে গোয়েন্দাদের তৎপরতা। আপনাকে ও গ্রেফতারকৃত মহিলাদেরকে যদি আবার বাড়ীতে পায়, তবে ওরা বুঝকে এ হামলা বন্দীদের পরিবারের লোকেরাই মুজাহিদদের যোগসাজসে করেছে। তাই এখান থেকে বাড়ী ছেড়ে অন্য কোথায় থাকতে হবে। ছায়েমার কথা শুনে সকলেই বলে উঠল, তা সত্য, বিলকুল সত্য।

আমি আদেল সাহেবকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনার শ্বশুর বাড়ী কোথায়, কতটুকু দূরে এবং যাওয়ার রাস্তা কি? আদেল সাহেব বললেন, এখান থেকে আট কিলোমিটার দূরে, পিলিউডে। তিন কিলোমিটার হেঁটে গিয়ে ট্যাক্সিতে যেতে হয়। আমি বললাম, আপনি কালবিলম্ব না করে এদেরকে নিয়ে এখনই চলে যান। আপাতত কিছুদিন সেখানে অবস্থান করুন। পরিস্থিতি শান্ত হলে আবার ফিরে আসবেন। আমি তাদেরকে কিছু টাকা দিয়ে পাঠিয়ে দিলাম। জামিলা বিদায়লগ্নে ছায়েমাকে জড়িয়ে ধরে খুব কান্নাকাটি করতে লাগল, সাথে আদেল পত্নীও। আমরা তাদের সান্ত্বনা ও প্রবোধ দিয়ে বিদায় জানালাম।

আমরা দু'জনে অস্ত্রশস্ত্রগুলো আরো গহীন বনে লুকিয়ে রেখে কয়েকটি গ্রেনেড নিয়ে অন্যত্র চলে গেলাম। ছায়েমা বলল, ভাইজান! ক্ষুধায় তো জীবন যায়, খাবারও তো কিছুই নেই। আমি বললাম, ধৈর্যধারণ ছাড়া আপাতত অন্য কোন পথ নেই। তবে সামান্য সময় ঘুমিয়ে নেই, পরে বাজারে গিয়ে খাবার নিয়ে আসব। আমরা শুয়ে পড়লাম।

বেলা দু'টোয় আমাদের ঘুম ভাঙ্গে। ঘুম থেকে জেগে ছায়েমাকে বললাম, চল একটু ঘুরে আসি। ছায়েমা বলল, কোথায় যাবে? আমি

বললাম, কামাল ডারের বাড়ী। ছায়েমা রাজি হল। দু'জন বন থেকে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কামাল ডারের বাড়ী এসে হাজির হলাম। কামাল ডার আমাদেরকে পেয়ে মহাখুশী। তিনি আমাদের আপ্যায়নে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

ছায়েমা কামাল ডারকে বলল, ভাই! আমাদের জন্য আপনি পেরেশান হবেন না, বরং ঘরে উপস্থিত যা আছে তাই নিয়ে আসুন। কামাল ডার ছায়েমার কথামত কিছু রুটি আর ছাগ দুধের দই নিয়ে আসলেন। আমরা পেটপুরে খেয়ে নিলাম। তারপর নিজ গাছের টকটকে লাল কতগুলো আপেল এনে বললেন, মুসাফির ভাইয়েরা! এগুলো তোমাদের জন্য। আমরা কয়েকটা আপেল খেলাম। সত্যিই এত মিষ্টি আপেল আগে কখনো খেয়েছি বলে মনে পড়ে না।

অতপর কামাল ডারকে দু'শ' টাকা দিয়ে বললাম, আপনি বাজার থেকে খেজুর, কিসমিস, গুড়, চিড়া ও রুটি নিয়ে আসবেন। পাঁচ-সাত দিন যেন আর বাজার করতে না হয়। আর এও বললাম যে, আগামীকাল সূর্য ওঠার আগেই টাঙ্গা নিয়ে বনের ভেতর চলে আসবেন। ফজরের সাথে সাথেই আমরা ওয়েন্টিপলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করব। আমরা আরো কিছু আপেল নিয়ে বনে ফিরে এলাম।

ছায়েমা বলল, ভাইজান! সন্ধ্যা হওয়ার তো আর বাকি নেই। আদেল সাহেবও চলে আসার সময় হয়ে গেছে। কাজেই গহীন অরণ্যে না গিয়ে পূর্বের স্থানেই বসে অপেক্ষা করা দরকার। কারণ, আদেল সাহেব এসে সেখানেই খুঁজছেন। আমি তাই করলাম।

আমরা আদেল সাহেবের অপেক্ষায় বসে আছি। তিনি এখনো ফিরে আসেননি। ছায়েমা পেরেশান হয়ে বলল, আমার মনে হয় তিনি গ্রেফতার হয়ে গেছেন। তা না হলে এতক্ষণ তো দেরী করার কথা নয়। ছায়েমারও সন্দেহ হল। আমি বললাম, ছায়েমা! এখন কি করা যায় পরামর্শ দাও। সে বলল, ভাইজান! চলুন একটু এগিয়ে দেখি। তারপর দু'টি অস্ত্র, তিনশ' রাউন্ড গুলী ও দু'টি গ্রেনেডসহ আমরা গ্রামে ঢুকে পড়লাম। আদেল সাহেবের বাড়ীর কাছাকাছি গেলে লোকজনের হট্টগোল শুনতে পেলাম। ছায়েমা বলল, এ শোরগোল কিসের? নিশ্চয়ই একটা কিছু হয়েছে। আমরা চুপি চুপি

৫

আরো একটু অগ্রসর হতেই আদেল সাহেবের কান্না শুনতে পেলাম।

আদেল সাহেব কাতর সুরে বলছেন, তোমরা আমার পরিবারের সদস্যগণকে হত্যা করেছ। আমাকেও জীবনে মেরে ফেল না। আমি তোমাদের কাছে প্রাণ ভিক্ষা চাই। দুর্বৃত্তরা ধমকের সাথে বলছে, হে নরাধম! গ্রামবাসীরা সবাই কমিউনিজম গ্রহণ করেছে। একমাত্র তুই শুধু রূহানী রয়ে গেছিস। কাজেই তোকে আমরা ক্ষমা করব না। তুই হয়ত লেনিনের আদর্শ গ্রহণ করবি না, তাই মৃত্যুর জন্য তৈরি হ। চেয়ে দেখি, হাত-পা বেঁধে আদেল সাহেবকে ওরা মাটিতে ফেলে রেখেছে।

এ করুণ দৃশ্য দেখে আমি আর তর সইতে পারলাম না। হাতের অস্ত্রটি উঁচিয়ে নিশানা ঠিক করলাম। ছায়েমা বেরেল ঘুরিয়ে বলল, আরে, বোকার মত কাজ করছ। এতে দুশমনের সাথে তো তিনিও বন্দী অথবা নিহত হতে পারেন। আমি চমকে উঠে বললাম, তাহলে কী করব?

ছায়েমা বলল, আপনি এখানে ওঁৎ পেতে বসে থাকুন। আমি কয়েক বাড়ী পার হয়ে সংরক্ষিত খড়কুটা বা গম গাছের স্তূপে আগুন লাগিয়ে দেই। তখন বাড়ীতে আগুন লেগেছে মনে করে লোকজন আগুন নেভানোর জন্য দৌড়ে যাবে। এ ফাঁকে আমরা বন্দীকে মুক্ত করে নেব। ওদিকে সবাই যখন আগুন নেভানোর কাজে একত্রিত হবে, তখন ব্রাশফায়ারে ও গ্রেনেড মেরে পাপিষ্ঠদের হত্যা করব।

ছায়েমার বুদ্ধি দেখে আমি বললাম, তোমাকে আল্লাহ যথেষ্ট জ্ঞান দান করেছেন। সুবহানাল্লাহ! সত্যি তুমি একজন সুদক্ষ রণকৌশলী। এই বলে ভাবাবেগে আমি তার কপারে চুমু দিয়ে বসলাম। ছায়েমা মাথা সরিয়ে নিয়ে বলল, ছিঃ এমন করো না। তারপর ছায়েমা কয়েক বাড়ী দূরে গিয়ে আগুন লাগিয়ে দিয়ে এক জায়গায় পজিশন নিয়ে শুয়ে পড়ল। প্রজ্বলিত আগুন দেখে হৈ চৈ করে পাষণ্ডরা সেদিকে দৌড়ে গেল। এদিকে আমি আদেল সাহেবকে বন্ধনমুক্ত করে সরিয়ে নিয়ে এলাম।

ছায়েমা সুযোগ বুঝে ভীড়ের ভেতর গ্রেনেড নিক্ষেপ করে দশ-বারজন পাপিষ্ঠকে জাহান্নামে পাঠাল। তারপর গুলী করল আরো কয়েক রাউন্ড। সাথে সাথে ছত্রভঙ্গ হয়ে কিছু মারা গেল, কিছু প্রাণে বেঁচে গেল। আমরাও দেরি না করে অরণ্যের ভেতর ঢুকে পড়লাম।

রাত প্রায় বারটা পেরিয়ে গেছে। আমরা কিছু আপেল খেয়ে শুয়ে পড়লাম। ভোরে উঠে নামায পড়ার সাথে সাথেই দেখি কামাল ডার টাঙ্গা নিয়ে হাজির। আমরা তাড়াহুড়া করে ছামানা গুছিয়ে টাঙ্গায় চড়ে বসলাম। আমাদের সাথে আদেল রাঈকেও নিয়ে নিলাম। কামাল ডার অশ্বকে মৃদু আঘাত করতেই টাঙ্গা ওয়েন্টিপলের দিকে ধাবিত হল।

আমরা ত্রিশ মাইল পথ অতিক্রম করে সন্ধ্যার দিকে ব্রাহীম নামক স্থানে পৌঁছলাম। বহুদিন পর ব্রাহীমের এক মসজিদে গিয়ে নামায পড়ব। তাই কামাল ডারকে টাঙ্গা থামাতে বললাম। কামাল ডার একটি প্রাইমারী স্কুল সংলগ্ন সরাইখানার সম্মুখে টাঙ্গা থামালেন। আমরা অযু করে মসজিদের দিকে যাচ্ছি। এমন সময় সাদা দাড়িওয়ালা এক বৃদ্ধকে দেখলাম। লোকটাকে একজন আলেম বলে মনে হল। আমাদেরকে দেখে বললেন, ওহে রাহী! ওহে রাহী! আমরা থেকে গেলাম। লোকটি বলল, বাবা! তোমরা কোথায় যাচ্ছ? আমি বললাম, মসজিদে নামায পড়তে যাচ্ছি। লোকটি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, বাবা! এটা নামাযের আযান নয়, এটা মুসলিম হত্যার আযান। আমি প্রশ্ন করলাম, এ আবার কেমন কথা? বুড়ো উত্তর দিলেন, কমিউনিস্টরা নামাযের সময় হলে আযান দেয়। অপরিচিত মুসলমানরা এ শহরে আসলে না বুঝে নামাযের জন্য মসজিদে যায়। তখন বলসেভিকরা মুসল্লীদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করে।

বুড়োর কথা শুনে আমরা সরাইখানাতে চুপে চুপে নামায পড়ে নিলাম। তারপর হাঁটতে হাঁটতে মসজিদের দিকে এগিয়ে গেলাম। হায়! আযান শুনে নতুন তিনজন মুসল্লী নামাযের জন্য মসজিদে গিয়ে প্রাণ হারালেন। তাজা খুনে মসজিদটি যেন গোসল করেছে। আহ! কি করুণ দৃশ্য! আমরা ঘোরাফেরা অনিরাপদ মনে করে সরাইখানায় ফিরে এলাম।

রাতে সরাইখানায় থাকার ব্যবস্থা করছি। বুড়ো আবার এসে জিজ্ঞেস করল, বাবা! তোমরা কোথায় যাবে? আমি বললাম, ওয়েন্টিপল। তিনি বললেন, ওয়েন্টিপল তো অনেক দূরের পথ। তোমরা মহাসড়কে না গিয়ে সামনে একটি মোড় পাবে। সে মোড় থেকে ডানে যে রাস্তা গেছে, সে রাস্তায় যাবে। ডানের রাস্তাটি যদিও তেমন ভাল নয়,

তবু অনেকটা নিরাপদ। কামাল ডার বললেন, হ্যাঁ, আমিও তাই ভাবছি। বুড়ো চলে গেলে আমরা আহারাদি সেরে ঘুমিয়ে পড়লাম। কামার ডার ঘোড়ার পরিচর্যা করতে গিয়ে একটু বিলম্বে ঘুমালেন। আবার শেষ রাতে উঠে অশ্বটিকে বুট, ভূষি ও পানি পান করিয়ে টাঙ্গা ঠিকঠাক করে নিলেন। আমরা নামায সেরে সামান্য নাস্তা করে সূর্য উদিত হওয়ার পূর্বেই ওয়েন্টিপলের দিকে রওনা হলাম।

আমরা মৃদু-মন্দ অনিল হিল্লোলে পথ চলছি। আল্লাহ সৃষ্টিকে কইতনা সুন্দর সাজে সাজিয়েছেন। মাঝে-মধ্যে অনেক পোড়া বাড়ী, উজাড় গৃহ, বিরান বস্তি নজরে পড়ল। এসব ধ্বংসলীলার ইতিহাস শুনালেন কামাল ডার। এসব জনপদের বিরান হওয়ার একমাত্র কারণ, এর অধিবাসীরা ছিল মুসলমান। কমিউনিজম গ্রহণ না করার কারণে অনেককে শহীদ করা হয়েছে। কাউকে বন্দী করেছে, আবার কেউ দেশত্যাগ করে অন্যত্র হিজরত করেছে।

এসব ধ্বংসলীলা দেখতে দেখতে পাঁচদিনে ওয়েন্টিপলে এসে পৌছলাম। ওয়েন্টিপল শহরটি যদিও তেমন বড় নয়, তবু রয়েছে উঁচু উঁচু দালান-কোঠা, এমারত। শহরটি দেখতে খুবই সুন্দর। শহরে ঢোকার আগেই রয়েছে শহর রক্ষা প্রাচীর এবং বিশাল ফটক। ফটকের দু'পাশে রয়েছে লেনিনের নবনির্মিত দু'টি ভাস্কর্য। একটি মূর্তির পায়ের কাছে রয়েছে আরবীতে আল্লাহ অংকিত একটি ফুবটল। দেখলে মনে হয় ফুটবলটি কেউ পদাঘাতে উড়িয়ে দিতে চাচ্ছে। অপর পায়ের নীচে রয়েছে পৃথিবীর মানচিত্র আঁকা একটি গ্লোব। এর উপর দাঁড়িয়ে আছে এমন সব দৃশ্য, যা দেখে কোন মুসলমানের পক্ষে ধৈর্য ধরে সম্ভব নয়।

ছায়েমা এ দৃশ্য দেখে কছম খেয়ে বলল, খোবায়েব! তুমি জামবুল যেতে পার, আমি কিন্তু এটা ধ্বংস না করে ওয়েন্টিপল ত্যাগ করতে পারব না। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তা কি করে সম্ভব ছায়েমা?

ছায়েমা তেজোদ্দীপ্ত কণ্ঠে বলল, আল্লাহ অতীতেও সাহায্য করেছেন, বর্তমানেও করছেন, ভবিষ্যতেও করবেন। আমরা যদি সত্যিই আল্লাহর উপর ভরসা করে কাজ করি, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহর মদদ ও সাহায্য পাব। খোবায়েব ভাই! আপনি মোটেও চিন্তা করবেন না, আল্লাহপাক আমার মাধ্যমে শয়তানের ভাস্কর্য ধ্বংস করাবেন। ছায়েমার

কথা শুনে আমার অন্তরে এক প্রকার ঝড় আরম্ভ হল। কামিয়াবীর জন্য বারবার আল্লাহর দরবারে দোয়া করতে লাগলাম।

কামাল ডার শহরতলীর এক সরাইখানার সামনে টাঙ্গা থামাল। আমরা সবাই টাঙ্গা থেকে নেমে সরাইখানার ম্যানেজারের সাথে যোগাযোগ করে জানতে চাইলাম, রাত যাপন করার মতো কোন জায়গা আছে কিনা। ম্যানেজার সম্মতি দিলেন। কামাল ডার সবগুলো ছানামা সরাইখানার এক কোণে এনে স্বযত্নে রেখে দিলেন। তারপর অযু-এস্তেঞ্জা সেরে সুন্দর করে বিছানা পেতে বিশ্রাম নিচ্ছি। এমন সময় সরাইখানার মালিক এসে জানতে চাইল, আমরা কতজন থাকব এবং কতক্ষণ থাকব। আমি উত্তর দিলাম, আমরা চারজন, শুধু রাত যাপন করে ভোরে চলে যাব। কিছুক্ষণ পর ম্যানেজার এসে খাবার তালিকা ও সিট ভাড়া পরিশোধ করতে বললেন। আমি সাথে সাথে হিসাব করে সবগুলো টাকা দিয়ে দিলাম। ম্যানেজার আমাদের জন্য একটি বড় রুম খুলে চাবি বুঝিয়ে দিলেন।

আমরা আমাদের কক্ষে গিয়ে নামায আদায় করে খানা খেয়ে পরামর্শে বসলাম। কামাল ডার বললেন, আমার তো রাস্তা শেষ হয়ে গেছে। সকালে বাকি পথ যাওয়ার জন্য অন্য একটি টাঙ্গা ঠিক করে দেব। আপনারা সে টাঙ্গায় যাবেন।

ছায়েমা বলল, জনাব! আপনি অনেক কষ্ট করেছেন। আশা করি আমাদের জন্য আরো একটু কষ্ট করবেন। পারিশ্রমিক যা পাবেন, আমরা তার চেয়ে বেশী দেয়ার চেষ্টা করব। তবু আপনাকেই আমাদেরকে নিয়ে যেতে হবে। অন্য টাঙ্গায় যাওয়া নিরাপদ নয়। কামাল ডার রাজি হলেন।

তারপর শয়তানের ভাস্কর্য ধ্বংস করার পরামর্শ চাইলে ছায়েমা বলল, ভাইজান! ওয়েন্টিপল একটি ব্যস্ততম শহর। সারা রাতই গাড়ীঘোড়া ও লোকজনের চলাচল থাকে। জায়গায় জায়গায় পুলিশ প্রহরা রয়েছে। তাছাড়া আমরা আসার সময় ফটকের অদূরে একটি পুলিশ ফাঁড়িও দেখেছি। তাতে আট-দশজন পুলিশ অবশ্যই রয়েছে।

আমরা রকেটলাঞ্চার বহন করে সেখানে যেতে পারব না। কাজেই যদি দু'টি মাইন দু'দিকে স্থাপন করতে পারি, তবে অতি সহজে কাজ

সমাধান করতে পারব। আর মাইন দু'টি রিমোট সিস্টেম করতে হবে।

ছায়েমার পরামর্শ খুবই সুন্দর ও যুক্তিযুক্ত। কিন্তু এত ঝুঁকি নিয়ে কিভাবে মাইন ফিট করব, সেটাই চিন্তা করছি। ছায়েমা বিষয়টা বুঝতে পেরে বলল, রাত তিনটার দিকে সুইপার রাস্তা ঝাড়ু দেয়ার জন্য বেরিয়ে আসবে। আমরা ঝাড়ু দারের বেশে মাইন ফিট করে চলে আসব। তারপর নিরাপদ স্থানে এসে রিমোর্ট টিপব। ছায়েমার কথা শুনে ধন্যবাদ দিয়ে সবাই শুয়ে পড়লাম।

গভীর রাত। সবাই ঘুমের ঘোরে অচেতন। আমি ছায়েমাকে নিয়ে চুপি চুপি দু'টি মাইনকে রিমোর্ট সিস্টেম করে নিলাম। ছায়েমা অতি গোপনে পুরো সরাইনখানা ঘুরে ২টি ঝাড়ু যোগাড় করল এবং পাপোষের পরিবর্তে যে খালি বস্তা ব্যবহার করা হয়, তার দু'টি বস্তা নিয়ে এল। রাত প্রায় তিনটার কাছাকাছি। ছায়েমা আমাকে নিয়ে বেরিয়ে এল। ছায়েমার চেহারায় আনন্দের জোয়ার। আজ তাকেই সিপাহসালারের দায়িত্ব দিয়েছি। আমি তার অধীন।

বস্তা দু'টি দু'জনে কাঁধে নিয়ে চলছি। হাতে আমাদের ঝাড়ু। রাস্তার কিছু কাগজ ও আবর্জনা বস্তায় ভরে নিলাম। মাঝে-মধ্যে একটু একটু ঝাড়ু দেই, আবার দ্রুত পথ চলি। এভাবে ফটকের কাছাকাছি চলে গেলাম। শহর এখনো নীরব হয়নি, মাঝে মাঝে চাল বোঝাই ট্রাকগুলো মাটি কাঁপিয়ে চলে যাচ্ছে। পুলিশও পাহারা দিচ্ছে। ফটকের কাছে গিয়ে দু'জন দু'দিক দিয়ে খুব সুন্দরভাবে ঝাড়ু দিয়ে চলছি। মাঝে মাঝে আবর্জনাগুলো স্তূপাকারে রেখে দিচ্ছি।

ফটকের সামান্য একটু দূরে পুলিশ ফাঁড়ির প্রায় নিকটে চারজন পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে। এক পর্যায়ে পুলিশ আমাদেরকে ডেকে বলল, বাবুজী আমাদের অফিসের আশপাশটা একটু ভাল করে ঝাড়ু দিও। আমরা পুলিশের কথামত দেবদারু বৃক্ষের পাতাগুলো ঝাড়ু দিয়ে বস্তায় ভরে নিলাম। ছায়েমা আড়াই সাহেবের নিকট গিয়ে হাত পেতে বলল, বাবু! আমাদের বখশিশ? আড়াই সাহেব বিশ টাকার একটি নোট ছায়েমার হাতে তুলে দিল। ছায়েমা করজোড়ে দু'টি হাত উত্তোলন করে বলল, বাবু নমস্কার, নমস্কার।

সরাইখানায় এসে পৌঁছতে রাত শেষ হয়ে গেছে। আমরা

অন্যদেরকে জাগিয়ে নামায পড়লাম ও নাস্তা করলাম। তারপর টাঙ্গায় চড়ে বসলাম। টাঙ্গা কয়েক কদম অগ্রসর হতেই রিমোর্টে চাপ দিলাম। সাথে সাথে লেনিনের মূর্তিটি চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে ছিটকে পড়ল। শহরবাসী বিকট আওয়াজে জেগে ছুটোছুটি আরম্ভ করল। কামাল ডার টাঙ্গা খুব দ্রুতগতিতে হাঁকিয়ে বেলা দু'টোর দিকে বুকাইলী এসে পৌঁছল। বুকাইলী হতে আলমাআতার দূরত্ব ৫ মাইল। এখন আমাদের নামায, খানা ও বিশ্রামের খুবই প্রয়োজন। কারণ, ওয়েন্টিপল থেকে বুকাইলী প্রায় সাতাশ মাইল। এতটুকু পথ অতিক্রম করতে আমরা কোথাও বিশ্রাম নেইনি। কাজেই, এখন বিশ্রাম না নিয়ে উপায় নেই। অশ্ব দু'টি হাঁফাচ্ছে।

কামাল ডার বললেন, এখানে বিশ্রাম নিতে হবে। কোথায় টাঙ্গা দাঁড় করাব তা ঠিক করুন। হঠাৎ মনে পড়ল আমার এক বন্ধুর কথা। নাম তার তুরাব হারুনী। বাল্য জীবনের বন্ধু। ছায়েমাকে তুরাব হারুনীর কথা বললে সেও সেখানে গিয়ে বিশ্রাম নিতে রাজি হল। তুরাব হারুনীর বাড়ী বুকাইলীতে তা জানি বটে, কিন্তু বাড়ী কোন্‌টি তা তো জানি না।

টাঙ্গা থেকে নেমে আমরা একটু পায়চারী করছি। এমন সময় মধ্য বয়সী এক লোক এসে জিজ্ঞেস করল, এটা কি সওদাগরী কাফেলা? আমি বললাম, না জনাব! আমরা সওদাগর নই। আমি আমার বাল্য বন্ধু তুরাব রুহানীর নিকট এসেছি। কিন্তু তার বাড়ী যে চিনি না। লোকটি বলল, বাবা! আমার সাথে এস। আমরা তার পেছনে চলছি। কয়েক কদম সামনে গিয়ে হাতের ইশারায় বললেন, ওটাই তুরাব হারুনীর বাসভবন।

আমরা দরজায় দাঁড়িয়ে কড়া নাড়া দিতেই তুরাব হারুনী নিজেই দরজা খুলে অবাক হয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরল এবং বলল, খোবায়েব যে! কেমন আছ ভাই? এখনো বেঁচে আছ তাহলে? এতদিন পর তোমার বন্ধুর কথা মনে পড়ল? আমি কি এখনো তোমার হৃদয় রাজ্যে বেঁচে আছি? তারপর আমাদেরকে মেহমানখানায় নিয়ে গেলেন। নামাযের ব্যবস্থা করে দিলেন। আমরা অযু করে নামায আদায় করতে করতে খানা এসে হাজির হল। আমরা খানা খেয়ে বিশ্রাম নিচ্ছি।

আমি কামাল ডারকে ডেকে বললাম, ভাই! আপনি আমাদের জন্য

অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছেন। আল্লাহই এর বিনিময় দেবেন। এই বলে তিন হাজার টাকা বের করে তার হাতে দিয়ে বললাম, এই নিন আপনার মজুরি। এত টাকা দেখে তিনি খুব খুশী হলেন। একসাথে এত টাকা কোনদিন দেখেননি। তাই আল্লাহর শোকর আদায় করলেন।

আমি আদেল রাঈকে বললাম, জনাব! আপনিও তো আমাদের জন্য কম করেননি। তার বিনিময় তো দেয়া সম্ভব নয়। এতটুকু বলার সাথে সাথে আদেল রাঈ অবোধ বালকের মত কেঁদে ফেললেন। আমি ও ছায়েমা তাকে সান্ত্বনা দিলাম। তিনি কান্না থামিয়ে বললেন, বাবা! তোমরা যে উপকার করেছ, তা চিরদিন মনে থাকবে। আমার গোটা পরিবারকে তোমরা জালিমের হাত থেকে উদ্ধার করেছ। তা না হলে তো হায়েনারা আমাদের সবাইকে মেরে ফেলত। তোমাদের উছিলায় আমরা বেঁচে আছি। দোয়া করি, তোমাদের মিশন আল্লাহ কবুল করুন।

ছায়েমা বিনয়ের সাথে বলল, জনাব! আপনি এই টাঙ্গায় চড়েই দেশে ফিরে যান। বাকি পথ আমরা একাই যেতে পারব। এখন আর অসুবিধা হবে না বলে আশা রাখি। আর আপনি বাড়ী না গিয়ে সোজা জামিলাদের ওখানে চলে যান। অবস্থা স্বাভাবিক হলে বাড়ী ফিরবেন। এই বলে আমরা উভয়কে বিদায় দিলাম। তারা চোখের পানি ফেলতে ফেলতে বাড়ীর পানে রওনা দিলেন।

[ছাব্বিশ]

আমি তুরাব হারুনীর কাছ থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনেক বিষয় জানলাম। সে আমাকে অনেক সুখ-দুঃখ, উত্থান-পতন ও ঘাত-প্রতিঘাতের কাহিনী এক এক করে শোনাল।

হারুনী বিয়ে করেছে মাত্র এক মাস আগে। বাসর গৃহের সাজ-সৌরভ এখনো শেষ হয়নি। শ্বশুরালয়ের পরিচয় দিতে গিয়ে বলল, সে মালাকানের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের একমাত্র আদরের দুলালী ও রূপসী কন্যা ফাহিমা আক্তার তৃষ্ণাকে বিয়ে করেছে। তৃষ্ণা একজন আবেদা ও সুন্দরী মেয়ে। দু'বছর আগে পিতৃহারা হয়েছে। মা ও বড় ভাই এখনো জীবিত আছেন। তৃষ্ণাকে পেয়ে হারুনী খুবই সুখী।

হারুনীর কথা শুনে ছায়েমা হঠাৎ বিচলিত হয়ে পড়ল। তার মুখে ভাষা নেই, কেমন যেন আনমনা হয়ে গেছে। আমি তার অবস্থা দেখে

জিজ্ঞেস করলাম, তোমার সুন্দর চেহারায় কে যেন এক পোচ কালি মেখে দিয়েছে? মনে হয় এখনই বর্ষণ আরম্ভ হবে। এসব বলে সঠিক কারণ জানতে চাইলাম।

ছায়েমা আমার কান ধরে টেনে নিয়ে গেল তার ঠোঁটের কাছে। তারপর চুপি চুপি বলল, ভাইজান! তৃষ্ণা আমার চাচাত বোন। সে আমার একমাত্র বান্ধবী। ছোটকালের খেলার সাথী, যাকে নিয়ে আমাকে প্রতিদিন মা-বাবার বকুনী খেতে হয়েছে। দু'জনে মিলে জীবনের কতইনা কল্পনার জাল বুনেছি তার কোন শেষ নেই। এতো সেই তৃষ্ণা, যাকে ছাড়া আমি এক মুহূর্তকাল থাকতে পারিনি।

ছায়েমার অন্তরে আজ স্মৃতি বিজড়িত কত কথাই না মনে পড়ছে। এ কথাগুলো ছায়েমা চুপি চুপি আমার কানে কানে বলল। বলতে দেখে হারুনী জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নতুন বন্ধু তোমার কানে কানে আমার বদনাম করছেন না তো?

তুরাব হারুনী ছায়েমাকে মেয়ে হিসেবে আবিষ্কার করতে পারেনি। সে মনে করেছে আমি নতুন বন্ধু জুটিয়েছি। তাছাড়া হারুনীর অন্তরেও একটা ভাব দোল খাচ্ছিল, এত সুন্দর চেহারা মনে হয় তার কোনদিন দর্শন করার সুযোগ হয়নি। সুদক্ষ কারিগর যেন তার নাসিকাটি নির্মাণ করেছে। ভ্রূযুগল যেন অর্ডার দিয়ে তৈরী করা হয়েছে। চোখ দু'টি মনে হয় বন্যহরিণী থেকে চুরি করে এনেছে। রাঙ্গা ঠোঁটের হাসি যেন মন কেড়ে নেয়। যে কোন প্রেমিকের মন হরণ করার মত সব কৌশলই তার কাছে বিদ্যমান।

এদিকে ছায়েমা পাগলপারা হয়ে উঠেছে তার বান্ধবী ফাহিমা আক্তার তৃষ্ণার সাথে একান্ত নিবিড়ে সাক্ষাত করতে। কথাটা বারবার আমার কানে কানে বলছিল। তুরাব হারুনী ছায়েমার ফিসফিস আলাপে সন্দেহ করে আমাকে জিজ্ঞেস করল, খোবায়েব! তোমার বন্ধু বারবার তোমাকে কি বলছে, তা শোনা যাবে কি?

আমি মুচকি হেসে বললাম, ভাই! সে যা আবদার করছে, তা রক্ষা করা তোমার পক্ষে কি সম্ভব হবে? হারুনী বলল, হ্যাঁ, সম্মানিত মেহমানের আবদার পূরণ করতে যথাসম্ভব চেষ্টা করব। তাছাড়া তোমার আবদার আমি কি করে প্রত্যাখ্যান করব বল।

হারুনীর স্বীকারোক্তিতে আমি বললাম, আমার বন্ধু তোমার বেগমের সাথে একান্তে সাক্ষাৎ করতে চায়। আমার কথা শুনে হারুনী থ খেয়ে যায়। কি বলবে ভাবনায় পড়ে গেল। হঠাৎ মাথা উত্তোলন করে গম্ভীর সুরে বলল, আচ্ছা ভেতরে চলুন। অমনি ছায়েমা প্রফুল্লচিত্তে দাঁড়িয়ে গেল। তারপর তুরাব হারুনীর পিছু পিছু পর্দার বাধ্যবাধকতা ডিঙ্গিয়ে অন্দর মহলে চলে গেল। হারুনী অন্দর মহলে গিয়ে উচ্চস্বরে হাঁক দেয়, তৃষ্ণা! ফাহিমা আক্তার তৃষ্ণা গৃহের অভ্যন্তরে থেকে আওয়াজ দেয়, তোমার খুব তৃষ্ণা পেয়েছে বুঝি? হারুনী বলল, শোন, এক মেহমান তোমার সাথে সাক্ষাত করতে চায়। মেহমান আবার কে আসল? ফাহিমা জানতে চাইলে হারুনী বলল, সে আমার বন্ধুর বন্ধু, আমারও বন্ধু। তৃষ্ণা উত্তর দেয়, তাকে বসতে বল, আমি আসছি।

হারুনী ছায়েমাকে একটি কামরায় বসিয়ে রেখে বাইরে চলে আসল। ছায়েমা একাকী বসে আছে। একটু পরে ফাহিমা মোটা উড়নীতে সম্পূর্ণ শরীর আবৃত করে ছায়েমার রুমে প্রবেশ করে ছালাম দিল। ছায়েমা ছালামের উত্তর দিয়ে জিজ্ঞেস করল, তৃষ্ণা কেমন আছ বোন? তৃষ্ণা উত্তর দিল, আলহামদুলিল্লাহ ভাল আছি। ছায়েমা দাম্পত্য জীবনের খুঁটিনাটি বিষয়ের উপর প্রশ্ন করল। তৃষ্ণা লজ্জায় সব উত্তর দিতে পারছে না। ছায়েমা বলল, আরে বোন; তুমি আমাকে এত পর ভাবছ কেন? মেহমানের সাথে এত অভিমান করতে নেই। এই বলে তৃষ্ণাকে কাছে ডাকল আয় বোন, আমার কাছে আয়। এতদূর থেকে আলাপ জমবে না। ফাহিমা মহাবিপদে পড়ে গেল। নিরুপায় হয়ে সামনের চেয়ারে এসে বসল।

মেহমানের কথাগুলো কেমন যেন চিরচেনা মনে হচ্ছে তৃষ্ণার কাছে। এমন মধুর কণ্ঠ আরো যেন শুনেছে বহুবার। কিন্তু লোকটা যে পুরুষ! চোখ তুলে তাকাতেও লজ্জা পাচ্ছে তৃষ্ণা। ছায়েমা বলল, নির্জন গৃহে রুদ্ধদ্বারে আমরা মাত্র দু'জন, তারপরও এত পর্দা কিসের? ঘোমটা খোল, তোমার সুন্দর চেহারাটা দেখে আমার তৃষ্ণা নিবারণ করি। আমি অনেক দূরের মুসাফির, অনেক দূর থেকে এসেছি, আমার সাথে অভিমান করো না। ঘোমটা খুলে কথা বল। ছায়েমার কথাগুলো তুরাব হারুনী বাইরে দাঁড়িয়ে শুনছিল আর রাগে অগ্নিশর্মা হচ্ছিল।

ফাহিমা আক্তার তৃষ্ণা উড়নীর ফাঁকে যুবকের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেল পরনে জিনসের প্যান্ট, গায়ে সুর্মা রঙের শার্ট। তার উপর মোটা জ্যাকেট, মাথায় লেনিন নামক ফেরাউনী ক্যাপ। এত সুদর্শন পুরুষ কোনদিন দেখেনি বলেই তার মনে হল। কিন্তু তার চেহারাটা শতভাগ বাল্য বন্ধনী ছায়েমা মালাকানীর মত দেখাচ্ছে। ছায়েমার কথা মনে হওয়ায় তৃষ্ণা চোখের পানি ধরে রাখতে পারল না। ছায়েমাকে বলসেভিকরা অপহরণ করে নিয়ে গেছে এবং গোটা পরিবারকে শহীদ করে দিয়েছে, তা সে জানত।

তৃষ্ণার নীরব ভূমিকায় ছায়েমা আবার বলল, বোন! তুমি অমন করছ কেন? ঘোমটাখানা সরাও। এই বলে হঠাৎ উড়নীটা একটানে খুলে ফেলল ছায়েমা। তারপর বলল, আরে আমি তোর বান্ধবী ছায়েমা। এই বলে, জ্যাকেট ও ক্যাপটা খুলে টেবিলে রাখল। এবার তৃষ্ণার ভ্রম দূর হল, সত্যিই এ যে ছায়েমা!

তৃষ্ণা চীৎকার দিয়ে ছায়েমাকে জড়িয়ে ধরল এবং বলল, অভাগিনী! তুই এখনো বেঁচে আছিস? তোর অপহরণের কথা অনেক আগেই শুনেছি। শুনেছি চাচা-চাচীর মর্মান্তিক শাহাদাতের কথা। অনেক কেঁদেছি তোদের জন্য, এখনো তোদের কথা মনে হলে অশ্রুতে বুক ভেসে যায়।

তুরাব হারুনী অন্তরাল থেকে এ দৃশ্য অবলোকন করছিল এবং উভয়ের কথোপকথন শুনছিল। হারুনীর কোমল হৃদয়ে এ মর্মান্তিক ঘটনায় আঘাত লাগল। সেও অশ্রু সংবরণ করতে পারল না।

তুরাব হারুনী দু'বান্ধবীর মিলন দৃশ্য দেখে দৌড়ে মেহমানখানায় এসে চোখের পানি মুছতে মুছতে আমাদের অজানা কাহিনী শুনতে চাইল। আমি এক এক করে সমস্ত ঘটনা খুলে বললাম। আর সে আমার পাশে বসে একাগ্রচিত্তে শুনতে লাগল।

আমার আলোচনা শেষ করে আলমাআতার পরিস্থিতি, মুসলমানদের অবস্থা, ওলামাদের অবস্থান নিয়ে হারুনীর জবান থেকে শোনলাম। ছায়েমাও তার বান্ধবীর সাথে আলাপ-আলোচনা ও সাক্ষাতপর্ব সেরে আমাদের কক্ষে এসে পেছনের কেদারায় বসল।

তুরাব হারুনী অনুরোধ করে বলল, খোবায়েব! দুনিয়াতে আল্লাহ

ছাড়া তোদের আর কোন সাহায্যকারী নেই। নেই কোন আশ্রয়স্থল। আমি আশা করব, এ গরীবালয়ে তোরা স্থায়ীভাবে থাকবি। এখন থেকে তোরা আমার পরিবারের সদস্য। মনে কর এটা তোদেরই বাড়ী। এখানে তোদেরকে কেউ কিছু বলতে সাহস করবে না। আশা করি, আমার কথার ব্যতিক্রম করবি না।

এমন বিপদসংকুল মুহূর্তে আশ্রয় পাওয়া কম কথা নয়। হারুনীর কথাগুলো আমার অন্তরে পাথরাঙ্কিত নকশার ন্যায় অংকিত হয়ে আছে। আমি তুরাব হারুনীর আবদার কিছুটা রক্ষা করার বিবেচনা করছিলাম। এমন সময় ফাহিমা আক্তার তৃষ্ণাও ঘরে প্রবেশ করে ছায়েমার পাশে দাঁড়াল। ছায়েমা তাকে জোর করে ধরে তার পাশে বসতে দিল। এবার তৃষ্ণাও তার স্বামীর কথা উপর জোর দিয়ে বলল, মুসাফির ভাই! অন্য কোন চিন্তা না করে আমাদের এখানে স্থায়ীভাবে থাকার কথা দিন।

ছায়েমা আমার দিকে তাকিয়ে বলল, খোবায়েব ভাইয়া! মেহমান হয়ে আর কতদিন কাটাব? আমাদের তো আরো অনেক কাজ রয়ে গেছে। এগুলো তো এখানে বসে সারতে পারব না। তৃষ্ণা ছায়েমার কথায় খানিকটা বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞেস করল, কি কাজ এতো জরুরী হয়ে পড়েছে ছায়েমা?

ছায়েমা উত্তর দিল, কিতালের কাজ।

কিতালের কাজ মানে? প্রশ্ন করল তৃষ্ণা।

কিতাল অর্থ মারামারি, কাটাকাটি, বুঝলে?

মারামারি, কাটাকাটি ভাল মানুষের কাজ নাকি। এগুলো তো সন্ত্রাসীরা করে থাকে।

ছায়েমা উত্তর দেয়, মারামারি আর খুনাখুনি না করে কেউ জান্নাতে যেতে পারবে না। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে ফরয এক বিধান। দেখনি আল্লাহপাক পবিত্র কালামে ইরশাদ করেছেন-

"তোমরা কি মনে করছ, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, অথচ আল্লাহ এখনো দেখেননি তোমাদের মধ্যে কারা জিহাদ করেছে এবং কারা ধৈর্যশীল? (সূরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ১৪২)

যারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে তাদের কত বড় মর্যাদা। মুসলমান যদি তা বুঝত ও অনুধাবন করত, তবে কি আলালের ঘরের

দুলাল সেজে কাপুরুষের মত ঘরে বসে থাকত! কেন, আল্লাহ কি তা জানিয়ে দেননি–

"গৃহে উপবিষ্ট মুসলমান যাদের কোন সঙ্গত ওজর নেই এবং ঐসব মুসলমান যারা জান ও মাল দ্বারা জিহাদ করে, আল্লাহ তাদের মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছেন গৃহে-উপবিষ্টদের তুলনায় এবং প্রত্যেকের সাথেই আল্লাহ কল্যাণের ওয়াদা করেছেন। আল্লাহ জিহাদকারীদেরকে উপবিষ্টদের উপর মহান প্রতিদানে শ্রেষ্ঠ করেছেন।" (সূরা নিসা ঃ আয়াত ৯৫)

ছায়েমার কথা শুনে তৃষ্ণার যেন পিপাসা লেগে গেল। ছাতি কাঁপছে দুরু দুরু! মুখে ভাষা নেই। অবাক হয়ে চেয়ে আছে ছায়েমার দিকে। কিছুক্ষণ পর তৃষ্ণা আবার প্রশ্ন করল, মেয়ে মানুষের আবার জিহাদ কিসের? ছায়েমা মৃদু হেসে স্কন্ধে একটু ঝাঁকি দিয়ে বলল, আরে গর্দভ! জিহাদ শুধু পুরুষের উপরই ফরয হয়নি, মেয়েদের উপরও ফরয।

ইসলামের ইতিহাস খুলে দেখ। মুসলিম বীরাঙ্গনা সাহাবারাও যুদ্ধের ময়দানে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। মহিলারাও স্বয়ং হুজুর (সাঃ)-এর সাথে যুদ্ধে শরীক হয়েছেন। এ সমস্ত মহিলাদেরকে হুজুর ধমক দেননি এবং যুদ্ধের ময়দান থেকে তাড়িয়ে দেননি। যেমন মুসলমানদের জননী হযরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ), (নবীপত্নী) হযরত সুফিয়া (রাঃ), হযরত উম্মে জিয়াদ (রাঃ), হযরত খাওলা (রাঃ), হযরত উম্মে আম্মারা (রাঃ), হযরত বিবি খানছা (রাঃ), হযরত ছুমাইয়া (রাঃ), হযরত উম্মে হাকিম (রাঃ) জিহাদ করেছেন এবং অনেকে শাহাদাতও বরণ করেছেন। এমনি অনেক মহিলা ছাহাবা যুদ্ধ করেছেন। গৌরবময় ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন।

ছায়েমার কথা শুনে তৃষ্ণার মনে জিহাদের পিপাসা জাগ্রত হল এবং বলল, তাহলে আমাদেরকেও তোমাদের সাথে নিয়ে নাও ছায়েমা। ছায়েমা উত্তর দিল, আমরা অনেক দূরের যাত্রী। তোমরা আমাদের সাথে যেতে পারবে না। তবে যুদ্ধের জন্য তোমাদেরকে সামান্য তৈরি করে যেতে পারব, যদি একটু সময় পাই।

তুরাব হারুনী বলল, ভাই খোবায়েব! দশ-পনের দিন আমাদের

এখানে থাক। তারপর তোমার মিশন নিয়ে সামনে এগিয়ে যাবে এবং যেদিকেই যাওয়া কেন, নিজ বাড়ীর মত আবার ফিরে আসবে কিন্তু...।

আমি বললাম, আজ বহুদিন যাবত আম্মুর সাথে কোন সাক্ষাৎ নেই। তিনি বেঁচে আছেন কিনা, তাও জানি না। যদি বেঁচে থাকেন, তবে তো আমার চিন্তায় তার দানাপানি আর ঘুম হারাম হয়ে গেছে। আম্মুর কথা মনে উদয় হলে আমি স্থির থাকতে পারি না। একথা বলতে বলতে আমার চোখের পানি এসে গেল। তুরাব হারুনী তা দেখে বলল, আচ্ছা তাহলে তো তাড়াতাড়ি তার খোঁজ নেয়া দরকার। আজ রাত অন্তত থাক, কাল না হয় তোমাদের যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেব ইনশাআল্লাহ।

ফাহিমা আক্তার তৃষ্ণা এসে বলল, খোবায়েব ভাই! আপনি একা গিয়ে আপনার আম্মার খোঁজ নিন। তাকে আমাদের বাসায় নিয়ে আসবেন। আমি যথাসম্ভব তার খেদমত করব। আর ছায়েমা আপাকে আমার এখানে রেখে যান। অযথা দু'জন গিয়ে লাভ কি?

তৃষ্ণার কথায় আমি ছায়েমাকে রেখে যাওয়াটাই ভাল মনে করলাম। কারণ, আলমাআতার পরিস্থিতি খুবই উত্তপ্ত। জামবুলের অবস্থাও একই রকম। তাছাড়া অস্ত্র নিয়ে যাওয়া বা তার হেফাজত করা খুব কঠিন হবে। অস্ত্রগুলো যদি খোয়া যায়, তবে কয়েক লাখ টাকার ক্ষতি হবে। তাছাড়া জিহাদের তো ক্ষতির সীমা থাকবে না। তাই অস্ত্রসহ ছায়েমাকে এখানে রেখে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

ছায়েমাকে সবদিক বুঝিয়ে বললাম। সে সবকিছু বুঝেও বলল, তোমাকে পাঠিয়ে দিয়ে একা থাকতে আমার অনেক কষ্ট হয়। একবার ছাড়া পেলে তো আর ফিরে আসতে চাও না। কাজেই তুমি যেখানে যাও, আমিও যাব। সুখ-দুঃখ ভাগাভাগি করে নেব। কিন্তু অনেক বুঝানোর পর ছায়েমা থাকতে রাজী হল।

এবার আমার যাওয়ার ব্যাপারে পরামর্শ করলাম। তুরাব হারুনী বলল, এ নিয়ে এত মাথা ঘামাচ্ছ কেন? আমার চাচাত ভাই আবদুর রহিম হারুনীর ৪টি টাঙ্গা আছে। ৩টি ভাড়া দেয় আর একটি নিজে চালায়। তার টাঙ্গার মত এতো ভাল টাঙ্গা আর মিলবে না। আগামীকাল খুব ভোরে তুমি যাত্রা করবে। আবদুর রহিমকে রাস্তার ম্যাপ দিয়ে দেব। দেখবে, অল্প সময়ের মধ্যে তোমাকে নিরাপদে

গন্তব্যে পৌঁছিয়ে দেবে। আমি রাতেই আবদুর রহিম হারুনীর সাথে কথা বলে ব্যবস্থা করে রাখব।

কিছুক্ষণ পর তৃষ্ণা এসে বলল, ভাইজান! রাত তো বেশ হয়েছে, খানাপিনা করে নিন। এই বলে সে আমাকে ও ছায়েমাকে অন্দর মহলে নিয়ে গেল। আমরা খানা খেয়ে নামায পড়া শেষ করতেই তুরাব হারুনী টাঙ্গার ব্যবস্থা করে বলল, খুব ভোরে টাঙ্গা আসবে, রাতে সব প্রস্তুতি নিয়ে রাখতে হবে।

ছায়েমা বলল, ভাইজান! বড় কোন হাতিয়ার নেয়া ঠিক হবে না। তিনটি ম্যাগজিন, গুলীসহ একটি স্টেনগান, তিনটি গ্রেনেড আর একটি খঞ্জর সাথে নিলেই চলবে। এগুলো চাদরের নীচে রেখে চলতে পারবেন, তেমন কোন অসুবিধা হবে না। আমি বললাম, তাতেই চলবে।

তারপর তৃষ্ণা ও হারুনীর কাছে হেফাজতের জন্য বাকি অস্ত্রগুলো বুঝিয়ে দিলাম। আর ছায়েমার প্রতি নজর রাখার জন্য জরুরী কিছু নছিহত করে শুয়ে পড়লাম। ছায়েমার চোখে ঘুম নেই, শুধু এপাশ-ওপাশ করছে। তার অস্থির ভাব দেখে জিজ্ঞেস করলাম, ছায়েমা! তোমার কি ঘুম আসছে না? ছায়েমা বলল, ভাইজান! আপনি আম্মাকে দেখে তিন-চার মাসের খরচ দিয়ে কোন আপজনকে জিম্মাদারী দিয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে আসবেন। এরপর আমরা একসাথে তুর্কমেনিস্তান গিয়ে আনোয়ার পাশা সাথে মিলিত হয়ে জিহাদ করব। আমিও তার কথায় সায় দিয়ে বললাম, তুমি ধৈর্যধারণ কর, আমাদের আশা পূরণ হবে ইনশাআল্লাহ।

তিমিরাচ্ছন্ন নিশীথিনীর অবসান ঘটিয়ে ছুবেহ ছাদেকের আবির্ভাব হল। অল্পক্ষণ পরই রক্তিম আভা ছড়িয়ে পূর্বকাশে কিরণমালা উদিত হবে। ঘুমন্ত প্রকৃতি আঁখি মেলে নীরবতা ভঙ্গ করছে। পাখ-পাখালীরা কলকাকলিতে হৃদয় উজাড় করে নিচ্ছে। পুষ্প কাননে ফুলরাও ঘোমটা খুলে নিজ নিজ সৌন্দর্য্য প্রকাশ করছে। দিকে দিকে ফুলের সৌরভ ছড়িয়ে দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে ভোরের স্নিগ্ধ সমীরণ। শিশির যেন সারারাত লতাপাতাকে গোসল করিয়ে সজীবতা বৃদ্ধি করেছে।

এরই মাঝে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। ছায়েমাকে ডেকে অযু করে নামায আদায় করে তিলাওয়াত করছি। তৃষ্ণা কিছু হালুয়া-রুটি নিয়ে

এল। আমার পাশে রেখে মধুর সুরে বলল, খোবায়েব ভাই! হয়ত টাঙ্গা এখনই-এসে যাবে, জলদি খেয়ে নিন। আমি বিলম্ব না করে ছায়েমাকে নিয়ে খেতে লাগলাম। ছায়েমা অন্য দিনের মত নয়। আমি তার গম্ভীরতা বুঝতে পেরেও বল্‌লাম, ছায়েমা! বিদায়লগ্নে তোমাকে এমন দেখতে চাইনি। সে চোখ মুছে বলল, ভাইজান! এ খাওয়াই কি আপনার সাথে আখেরী খাওয়া কিনা? এ বিদায় কি শেষ বিদায় কিনা? এটাই কি শেষ দেখা কিনা, তা কে জানে। তুমি কিন্তু আমাকে ভুল না। আমি তাকে অনেক সান্ত্বনা ও অভয় দিলাম। এরই মধ্যে টাঙ্গা এসে গেল।

আমি মহান রাব্বুল আলামীনের উপর ভরসা রেখে সকলের নিকট থেকে বিদায় ও দোয়া নিয়ে টাঙ্গায় উঠলাম। টাঙ্গা ছাড়ার পূর্বমুহূর্তে তৃষ্ণা কিছু খাবার ও বেশকিছু টাকা নিয়ে এল। তা জোর করে আমার হাতে দিয়ে বলল, ভাইজান! দেরি করবেন না কিন্তু। এখন শুধু ছামেয়া একা কাঁদবে না, তার সাথে আরো অনেকেই কাঁদবে। তুরাব হারুনীও বারবার একই কথা বলছে। আমি আখেরী ছালাম জানিয়ে বিদায় নিলাম। আবদুর রহিম হারুনী টাঙ্গা ছুটাল নিরুদ্দেশের উদ্দেশ্যে। অল্পক্ষণের মধ্যেই তারা চোখের আড়ালে হারিয়ে গেল।

আবদুর রহিম বন-বাদার, মাঠ-ঘাট, উঁচু-নীচু অঞ্চল পেরিয়ে চলছে। টাঙ্গার ঝাঁকুনীতে আমি কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি, তা টেরও পাইনি। বিকেল তিনটায় আলমাআতা পেরিয়ে গ্রামের পথ ধরে টাঙ্গা ছুটছে। আবদুর রহিম এক স্কুলের সামনে টাঙ্গা থামিয়ে আমাকে জাগিয়ে বললেন, ভাই! চলুন নামায পড়ে নেই। আমি ঘুম থেকে জেগে অযু করে নামায পড়ে নিলাম। আবদুর রহিম ঘোড়াকে কিছু ঘাস-পানি খাওয়াল। আমরাও কিছু খানা খেয়ে নিলাম।

প্রায় ঘন্টাখানেক বিশ্রাম নিয়ে আমি জামবুলের পথ ধরে এগিয়ে যাচ্ছি। রাস্তাটি কাঁচা। পাকা রাস্তা নিরাপদ নয় বিধায় ও-পথে যেতে চাচ্ছেন না টাঙ্গাওয়ালা। বেলাও শেষ। গর্তে পড়ে গিয়ে ডান পাশের লাল ঘোড়াটির পায়ে আঘাত পেয়েছে। আল্লাহর রহমতে অল্পের জন্য পা ভাঙ্গেনি।

টাঙ্গার গতি ক্রমশ শ্লথ হয়ে আসছে। খুব কষ্টে বাকী দু'মাইল রাস্তা অতিক্রম করে জামবুল এসে হাজির হলাম। এখান থেকে আমার

বাড়ী আর মাত্র তিন মাইল পথ। একদিকে ঘোর অন্ধকার, অপরদিকে ঘোটক পা তুলে দাঁড়িয়ে থাকে। এ অবস্থায় অশ্বটিকে কষ্ট দেয়া সমীচীন মনে হল না। আমি আবদুর রহিম হারুনীকে বললাম, ভাই! সামনে আমার এক বন্ধুর বাসা আছে। চল, এখানে রাত যাপন করি। ভোরে বাড়ি চলে যাব। আবদুর রহিম এতে খুব খুশি হল।

আমরা রাস্তার পার্শ্বে টাঙ্গা রেখে অশ্ব দু'টি নিয়ে বন্ধুর গৃহাভিমুখে চলছি। রাস্তা থেকে সরুপথ বেয়ে পঞ্চাশ-ষাট গজ গেলেই বন্ধুর বাড়ী। আমরা বাড়ির আঙ্গিনায় গিয়ে দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছি। কিন্তু কোন সাড়া-শব্দ নেই। অগত্যা বাহির দরজার নিকট গিয়ে ডাকতে লাগলাম, বাবর ভাই! ও বাবর ভাই...।

কিন্তু ঘর থেকে কোন আওয়াজ আসছে না। আমি আরেকটু জোরে দরজায় ধাক্কা দিয়ে 'বাবর বাবর' বলে ডাক দিলে এক বৃদ্ধার কণ্ঠস্বর ভেসে আসল- বাবা! তোমরা কারা? এত রাতে কোত্থেকে এলে? আমি উত্তর দিলাম, আম্মা! আমি বাবরের বন্ধু খোবায়েব। বৃদ্ধা বলল, তুমি খোবায়েব? তুমি এখনো বেঁচে আছ বাবা। আয় বাবা, আমার কাছে আয়।

আমি কয়েক কদম এগিয়ে বৃদ্ধার কাছে এসে দাঁড়ালাম। তিনি আমার মাথায় হাত বুলিয়ে কাঁদতে লাগলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আম্মা! বাবর ভাইয়া কোথায়? বৃদ্ধা আঁচলে মুখ ঢেকে রোদন করে বললেন, বাবা খোবায়েব! তোমার বন্ধু বাবরকে গতকাল সকালে নাস্তা খাওয়ার সময় বলসেভিক পাষণ্ডরা ধরে নিয়ে গেছে। ওর সাথে আরো কয়েকজনকে নিয়ে গেছে। গ্রামের মাতব্বররা অনেক চেষ্টা করেছে, কিন্তু রাখতে পারেনি।

বৃদ্ধার কথা শুনে আমার চোখেও পানি এসে গেল। অশ্রু মুছতে মুছতে জিজ্ঞেস করলাম, ওদেরকে কোথায় নিয়ে গেছে আম্মা? বললেন, শুনেছি তোমাদের গ্রামে নিয়ে গেছে। বললাম, আমাদের গ্রামে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তোমাদের গ্রামে! সেখানে তোমাদের বাড়িতেই ওরা অস্থায়ী ক্যাম্প স্থাপন করেছে। সেখানে নাকি রুহানীদের চারণভূমি। তাদের উপদ্রব বন্ধ করতেই তাদের এ আয়োজন।

আমি বললাম, বাড়ীতে তো আমার বৃদ্ধা আম্মা ছিলেন! তাহলে কি

হায়েনারা তাকেও শহীদ করে দিয়েছে? আপনি কোন খবর জানেন কি?

মহিলা বললেন, তোমার আম্মা ও অন্যান্য ছাত্র-শিক্ষক, ওলামায়ে কেরামকে যে শহীদ করেছে, এই সংবাদ অনেক আগেই পেয়েছি। তোমার কথাও শুনেছি।

আম্মার চিন্তায় আমি অস্থির হয়ে গেলাম। বেশ কিছুক্ষণ অস্থির চিত্তে মাথায় হাত দিয়ে বসে রইলাম। কি বলব, কি করব কিছুই স্থির করতে পারছি না।

চোখগুলো আমার রক্তবর্ণ হয়ে গেছে। শরীর কাঁপছে, প্রতিশোধের আগুন শিরায় শিরায় জ্বলছে। না এখন আর বিশ্রাম নেই, বিরাম নেই, ক্লান্তি নেই। প্রতিশোধ এখনই নিতে হবে। আমি আর বাঁচতে চাই না। কুফর, শিরক, অন্যায়-অত্যাচার, জুলুম ও নির্যাতনের অবসান না ঘটিয়ে নিস্তার নেই। আমি মনে মনে প্রতিশোধের সংকল্প করে ফেললাম।

তারপর আবদুর রহিমকে বললাম, ভাই, এই নিন আপনার পাওনা। আপনি আগামীকাল ভোরে দেশে ফিরে যান। আমি এক্ষুণি যাচ্ছি। আগামীকাল হয়ত কোন একটা সংবাদ শুনবেন। প্রতিশোধ আমাকে নিতেই হবে। এটাই হয়ত আপনার সঙ্গে আমার আখেরি মোলাকাত। ছায়েমা, তৃষ্ণা ও তুরাবীকে আমার ছালাম জানাবেন। আবদুর রহিম বললেন, এটা কিসের টাকা? হারুনী আমাকে সকালেই ভাড়া দিয়ে দিয়েছে। বলালাম, এ টাকা তোমার পকেটেই রাখ, কাজে আসবে।

আমার অস্থিরতা দেখে আবদুর রহিম বললেন, খোবায়েব! তুমি একাকী যেও না। আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাও, হয়ত কোন উপকারেও আসতে পারি। আবদুর রহিমের আগ্রহ দেখে আমিও রাজি হয়ে গেলাম।

আমার সম্মতি পেয়ে আবদুর রহিম লম্বা রশিতে ঘোড়া কাঁচা ঘাসে বেঁধে রেখে এসেছেন। রাত একটার বেশি বেজে গেছে। এখনি যাওয়া দরকার। এখনো তিন মাইল রাস্তা সামনে রয়ে গেছে। এই পথ পাড়ি দিয়ে তথ্য সংগ্রহ করে হামলা করতে সময় খরচ হবে। তাই বিলম্ব না করে যাওয়াটাই শ্রেয়।

বন্ধুর মাকে সালাম দিয়ে দোয়া চেয়ে বললাম, আম্মা! আপনি শান্ত হোন। আপনার বুকের ধন আপনার কোলে ফিরিয়ে না আনা পর্যন্ত

আমার অভিযান দুর্বার গতিতে চলবে। আপনি একটু অপেক্ষা করুন। রাত পোহায়ে সূর্য উদিত হওয়ার আগেই আপনার বাবরকে আপনার কাছে পাবেন। এই বলে আমি বিদায় নিয়ে রওনা হলাম।

রাত আনুমানিক দেড়টায় গিয়ে আমরা আমার বাড়িতে পৌছলাম। প্রথমে বাড়ির ভেতরে প্রবেশ না করে উত্তরের বাঁশ বাগানের ভেতরে আশ্রয় নিলাম। বাগানে বসে বিশ্রাম নিচ্ছি আর ভাবছি, কিভাবে কি করা যায়। তারপর দু'রাকাত নামায পড়ে আল্লাহর দরবারে সাহায্য চেয়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য বের হলাম।

আমি শিকারী বিড়ালের মতো আস্তে আস্তে পা ফেলে উত্তরের ঘরে পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। বেড়ার ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে দেখি, তেলের অভাবে একটি প্রদীপ নিভু নিভু করছে। প্রদীপের ক্ষীণ আলোকে বেশকিছু লোককে এলোপাতাড়িভাবে শুয়ে থাকতে দেখলাম। তাৎক্ষণিকভাবে কাউকে চিনতে পারলাম না। তবে এরা যে বন্দী এতে কোন সন্দেহ নেই। এমনিভাবে অপর দু'ঘরের পাশে দাঁড়িয়ে দেখলাম, এক ঘর খালি আর অপর ঘরে লোকজন রয়েছে। একটি ঘরে তালা ঝুলান। বুঝলাম, বন্দীদেরকে ঘরে ঢুকিয়ে বাইরে তালা লাগিয়ে দেয়া হয়েছে।

অনেক চেষ্টা করেও তালা খুলতে পারিনি। পরিশেষে বুদ্ধি আঁটলাম, উত্তর-পূর্ব কোণের বেড়ার টিনটি যদি খুলতে পারি, তবে অনায়াসে ঘরে ঢোকা যাবে। তাই আল্লাহ্ আল্লাহ্ করে খঞ্জরের সাহায্যে টিন খুলে ঘরে প্রবেশ করলাম। ঘরে প্রবেশ করে বেশ ক'জন যুবক ও নারীকে অর্ধনগ্ন ও বিবস্ত্র হয়ে পড়ে থাকতে দেখলাম। আমি আস্তে আস্তে তাদের হাত-পায়ের বন্ধনগুলো খঞ্জর দিয়ে কেটে খুলে দিলাম।

আমি ক্ষীণস্বরে বললাম, তোমরা পালাও, জলদি পালাও। যার যার বাড়ি চলে যাও। তারা আমার কথামত ছুটে পালাল। এ ঘরে আমার আম্মা জীবনের পঞ্চাশ-ষাট বছর কাটিয়েছেন। অন্য ঘরের তুলনায় এ ঘরেই আসবাবপত্র ও তৈজসপত্র ছিল বেশী। এখন কিছুই নেই, নেই ঘরের শোভা আমার আম্মা। শুধু কয়েকটি মদের পাত্র ও কিছু চানাচুর ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আছে। মদের উৎকট দুর্গন্ধে আমার নাড়ী-ভূড়ি বের হওয়ার উপক্রম হল। আমি দ্রুত ঘর ত্যাগ করে বাইরে বেরিয়ে আসি।

আমি বন্দীদের মুক্ত করে বলেছিলাম, তোমরা বাঁশ বাগানে চলে যাও। সেখানে একটু অপক্ষা কর, আমি আসছি। বন্দীরা সবাই বাঁশ বাগানে অপেক্ষা করছে। আমি দক্ষিণের মেহমানখানায় গিয়ে স্টেনগানের বেরেলটি বেড়ার ফাঁক দিয়ে ভেতরে ঢুকিয়ে দু'টি ফায়ার করি। এ ফায়ারে দু'জন নিহত হল। অন্যরা পাগলপারা হয়ে ঘরের ভেতরেই মেষপালের মতো দৌড়াদৌড়ি করতে লাগল। তাদের কানফাটা আর্তনাদ পুরো এলাকাবাসীর ঘুম হারাম করে দিল। এদিকে ওরা গুলী ছোঁড়ার আগেই আমি ব্রাশফায়ার আরম্ভ করে দিলাম। কিছুক্ষণ পর সমস্ত কান্নাকাটি মিলিয়ে গেল। এবার বুঝতে পারলাম, ওরা কেউ আর বেঁচে নেই।

তারপর পুরো বাড়ী ঘুরেফিরে দেখলাম। হায়! আম্মার কোন খোঁজ পেলাম না। অবশেষে একটা বুকফাটা আর্তনাদ বেরিয়ে আসল আমার হৃদয়ের গভীর থেকে।

আমি আম্মু আম্মু বলে ডাকলাম। কেউ সাড়া দিল না। ভাবাবেগে বলছিলাম, ও আমার আম্মু! তোমার হারাধন তোমার কোলে ফিরে এসেছে। তুমি তোমার কলিজার টুকরো, নয়নের মণি, আদরের দুলাল তোমায় খুঁজছে, তোমায় ডাকছে। ও আম্মু! তোমার খোবায়েব ফিরে এসেছে। তোমার খোবায়েবকে রেখে কোথায় পালালে?

আহ! আজ তো কেউ আমার ডাকে সাড়া দিচ্ছে না। কেউ তো দরজা খুলে ভেতরে আসতে বলছে না। কেউ তো আমার চোখের অশ্রু আঁচলে মুছে দিচ্ছে না। তাহলে কি আম্মুকে কুকুরের বাচ্চারা বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে? নাকি শহীদ করে দিয়েছে? আমি পাগলের মতো আবোল-তাবোল বকছি।

এমন সময় আবদুর রহিম এসে বলল, খোবায়েব ভাই! রাত আর বেশি নেই। বাঁশ বাগানে সবাই আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। জলদি আসুন। ওদেরকে কিছু বলে বিদায় দিন।

আবদুর রহিমের ডাক শুনে মনে হল, কে যেন আমার স্বপ্ন ভেঙ্গে দিয়েছে। আমি তাড়াতাড়ি আবদুর রহিমের সাথে বাঁশ বাগানে চলে যাই। সেখানে গিয়ে দেখি সবাই কাঁদছে। আমি আমার কান্না থামিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, ওহে লোক সকল! তোমরা কি আমার আম্মার সন্ধান

দিতে পার? তোমরা কি আম্মুকে আমার নিকট ফিরিয়ে দিতে পারবে?

কারো মুখ থেকে কোন শব্দ বের হচ্ছে না। মনে হয় ওরা আমার কথা কিছুই বুঝতে পারছে না, ওরা বধির, কিছুই শুনেনি। আমার কথার উত্তর না দিয়ে এক যুবক এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে বলল, ভাই! আপনি কে? কি আপনার পরিচয়? আজ দু'তিন দিন অতিবাহিত হল কেউ তো আমাদেরকে মুক্তি করা তো দূরের কথা, ভয়ে দেখতেও আসেনি। তাহলে কি আপনি আল্লাহর পক্ষ থেকে মুক্তিদাতা? আপনি কি ফেরেশতা? কোথা থেকে এলেন এ গভীর রজনীতে আমাদের মুক্ত করতে?

ওদের শত শত প্রশ্নের উত্তর এত সহজে দেয়া সম্ভব নয়। তবু এতটুকু বললাম, আমি খোবায়েব জামবুলী। যে বাড়ীতে তোমরা বন্দী ছিলে, সে বাড়ীটি আমাদের। জামিউল উলূম মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষক ছাড়াও বহু দ্বীনদারকে নরপশুরা শহীদ করে দিয়েছে। এদের মধ্যে আমার আব্বাও একজন।

আমি ফেরেশতা নই। আল্লাহ আমাকে জালেমের জুলুম বন্ধ করতে, বঞ্চিতের অধিকার ছিনিয়ে আনতে, বন্দীদের মুক্তি দিতে, গোটা দুনিয়ায় ইসলামকে গালেব করতে নিযুক্ত করেছেন। যতদিন পর্যন্ত শান্তি ও স্থিতিশীলতা ফিরে না আসবে, শির্‌ক, কুফরের অন্ধকার থেকে জাতিকে উদ্ধার করতে না পারব, ততদিন বিরামহীনভাবে যুদ্ধ চালিয়ে যাব।

আমার কথা শুনে এক যুবক বলল, খোবায়েব ভাই! আমি বাবর। আমাকে দু'দিন আগে বন্দী করে এনে ওরা শারীরিক নির্যাতন করেছে। আমাদের সাথে কোন আত্মীয়-স্বজনকে সাক্ষাৎ করতে দেয়া হয়নি। ওরা আমাদেরকে অনেক প্রহার করেছে। তাছাড়া আমাদের চোখের সামনেই মুসলিম নারীদের বিবস্ত্র করে গণধর্ষণ করেছে। অনেকেই লজ্জায় ও অনুশোচনায় আত্মহত্যা করেছে।

আমি বাবরের কথা শুনে বললাম, ওহে যুব সমাজ! তোমরা আমার কথাগুলো পাথরাঙ্কিত নকশায় ন্যায় হৃদয়ে অঙ্কিত করে রাখ। তোমরা যতটুকু নির্যাতন সচক্ষে অবলোকন করেছ, তার চেয়ে শত-সহস্র গুণ বেশী নির্যাতন প্রত্যক্ষ করতে হবে, ভোগ করতে হবে, যদি তার

প্রতিকার ও প্রতিশোধের ব্যবস্থা না করা হয়।

হে আমার যুবক বন্ধুরা! তোমাদের মত লক্ষ-কোটি যুবক বেঁচে থাকতে কাফেররা তোমাদের সামনে তোমাদের মা-বোনদের ইজ্জত লুণ্ঠন করছে, আর তোমরা নিষ্ক্রীয়ভাবে নীরবতা পালন করে যাচ্ছ। কি জবাব দেবে আল্লাহর কাছে। যুবক সমাজ তো ছিল মুক্তির অগ্রদূত। তোমাদের শিরায় শিরায় তো খালিদ ইবনে ওলিদ, ওমর ইবনুল খাত্তাবের শোণিতধারা প্রবাহমান। কেন আজ তোমরা জিহাদের রাস্তায় জীবন উৎসর্গ করছ না? যুব সমাজ যদি রুখে দাঁড়াত, তাহলে বলসেভিকদের সাধ্য ছিল না কোন মুসলিম নারীকে ধর্ষণ করতে। তোমরা যদি জাগ্রত হও, তবে সকল প্রকার জুলুম-নির্যাতনের অবসান ঘটিয়ে খেলাফত প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে। জিহাদের পথে যদি আমরা সুদৃঢ় থাকি, তাহলে আল্লাহ নিজেই সাহায্য করার অঙ্গী করেছেন।

পবিত্র কালামে ইরশাদ হয়েছে, "হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন কোন বাহিনীর সাথে সংঘাতে লিপ্ত হও, সুদৃঢ় থাক এবং আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ কর, যাতে তোমরা উদ্দেশ্যে কৃতকার্য হতে পার।" (সূরা আনফাল ঃ আয়াত ৪৫)

অপর এক স্থানে ইরশাদ হচ্ছে, "বরং আল্লাহ তোমাদের সাহায্যকারী, তার সাহায্যই হচ্ছে উত্তম সাহায্য।" (সূরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ১৫০)

আমার কথা শুনে সকলেই এক বাক্যে জিহাদের শপথ নিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করল এবং বলল, অযথা কাফেরদের পিটুনী খেয়ে লাভ নেই, বরং এর চেয়ে জিহাদ করে শহীদ হওয়াই শ্রেয়।

অতপর আমি তাদেরকে জিহাদের বাইয়াত করে বললাম, হে আমার মুজাহিদ ভাই ও বোনেরা! আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে যদি শহীদ হতে পারি, তবে সাথে সাথে চির শান্তির নীড় জান্নাত পেয়ে যাব, একটুও বিলম্ব হবে না।

হযরত জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত। জনৈক সাহাবী রাসূলুল্লাহ (সাঃ)কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি নিহত হলে কোথায় থাকব? নবী করীম (সাঃ) উত্তর দিলেন, জান্নাতে। এ কথা শুনেই তিনি হাতের খেজুরগুলো দূরে নিক্ষেপ করে যুদ্ধ করতে করতে

শহীদ হয়ে গেলেন। সুবহানাল্লাহ! এর চেয়ে বড় নেয়ামত আর কি হতে পারে? (মুসলিম)

অপর এক হাদীসে হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেন। মহানবী (সাঃ) ইরশাদ করেন, হে আবু সাঈদ! যে ব্যক্তি আল্লাহকে রব, ইসলামকে দ্বীন এবং মুহাম্মদ (সাঃ)কে রাসূল হিসেবে মেনে নিয়েছে, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেছে। একথা শুনে হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) বিস্মিত হয়ে আরজ করলেন, হে আল্লাহর নবী! কথাটা আবার বলুন! রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আবার বললেন। সাথে এ কথাও বললেন, আরেকটি আমল রয়েছে, যার বদৌলতে বান্দা জান্নাতে শত স্তরে সমাসীন হবে। প্রত্যেক দু'স্তরের মাঝে আসমান-জমিনের দূরত্বের সমপরিমাণ দূরত্ব হবে।

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) আরয করলেন, হে আল্লাহর নবী! সেই আমলটি কি? রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা। (মুসলিম)

আমার বক্তব্যে উপস্থিত শ্রোতাদের মাঝে জিহাদের স্পৃহা শতগুণে বেড়ে যায়। রাত প্রায় শেষ। ভোরের রবি প্রকাশের আগেই সকলকে নিরাপদ স্থানে চলে যেতে হবে। তা না হলে লোকাল মুনাফিকরা ক্ষতি করতে পারে। তাই তাদেরকে বললাম, ভাইয়েরা! আপনারা এখনই পৃথক পৃককভাবে লুকিয়ে যার যার গৃহে চলে যান। আর আগামী রাত ১১টায় কুহেলাব্বি পর্বত শিখড়ে জড়ো হবেন। সেখানে দিক-নির্দেশনা দেয়া হবে।

কুহেলাব্বি জামবুলের একটি পর্বতমালা। কয়েকটি জেলা জুড়ে কুহেলাব্বির বিস্তৃতি। সেখানে জনমানবের কোন চিহ্ন নেই। নেই চলার কোন পথঘাট। ঘন বন-জঙ্গলে ভরা। আছে শুধু বন্যপ্রাণী।

সবাইকে বিদায় দিয়ে গনীমতের বিপুল অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ফজরের সাথে সাথে বাবরের বাসায় পৌছলাম। তারপর ফজরের নামায পড়ে সামান্য নাস্তা খেয়ে বিশ্রাম নিলাম। এদিকে টাঙ্গাওয়ালা আবদুর রহিম হারুনীকে অর্থকড়ি দিয়ে বিদায় দিলাম। আবদুর রহিম অনেক কান্নাকাটি করে টাঙ্গা নিয়ে বিদায় হলেন। সারারাত ঘুমুতে পারিনি। একটু না ঘুমুলে চলবে না। তাই বাবরকে সঙ্গে নিয়ে খড়কুটার স্তূপের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লাম।

বেলা দু'টায় আমার নিদ্রা ভঙ্গ হল। বাবরকে জাগিয়ে দিয়ে আমি গোসল সেরে জোহর নামায আদায় করলাম। বাবরের বৃদ্ধা মা আমাদেরকে ডেকে খেতে দিলেন। আমরা খানা খেয়ে পরামর্শ করলাম। দিন তো চলে যাচ্ছে। আম্মার এখনও কোন সন্ধান পেলাম না। এদিকে যুবকরা রাতে জড়ো হবে কুহেলাব্বির শিখড়ে। দু'টিই গুরুত্বপূর্ণ। কোনটির চেয়ে কোনটি কম নয়।

বাবর ভাই বলল, খোবায়েব ভাই! আমরা যদি সন্ধ্যার সাথে সাথে তোমাদের মহল্লায় ঢুকতে পারি, তবে তোমার আত্মীয়-স্বজন বা পাড়া-প্রতিবেশী থেকে তোমার মায়ের খোঁজ নিয়ে রাত ১১টার আগেই আমরা কুহেলাব্বিতে পৌঁছতে পারব। সেখানে দু'তিন ঘন্টায় কাজ সেরে তুমি আবার তোমার মায়ের কাছে ফিরে যেতে পারবে।

বাবরের পরামর্শ আমার মনঃপূত হল। এভাবে উভয় কাজই সমাধা করা যাবে।

পড়ন্ত বেলা আমি বাবরকে নিয়ে গ্রামের আঁকাবাঁকা পথ বেয়ে চলছি। রাত সাতটার দিকে আমি আমার মহল্লায় এসে হাজির হলাম। চুপি চুপি বাড়ীর চারদিকটা ঘুরে দেখলাম। মনে হল স্বজন হারাবার বিরহে বাড়ীটি আর্তনাদ করছে। চিন্তা-ভাবনা করে দেখলাম, চাচার বাসায় গেলে হয়ত আম্মুর কোন সংবাদ পেতে পারি। যদিও আপন চাচা নয়, তবুও আমাদের সাথে গভীর সম্পর্ক রয়েছে।

আমি চাচার বাসায় গিয়ে আস্তে আস্তে চাচাজান, চাচাজান বলে ডাকতে লাগলাম। কয়েক ডাকের পর ঘরে থেকে আওয়াজ আসল, কে...?

আমি খোবায়েব।

খোবায়েব, তুমি কোত্থেকে এলে বাবা? তুমি না কয়েক মাস ধরে নিখোঁজ রয়েছ? আবার এটাও শুনেছি যে, তোমাকে নাকি পাষণ্ড বলসেভিকরা শহীদ করে দিয়েছে। এসব বলতে বলতে তিনি দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন।

আমার আওয়াজ পেয়ে চাচীমাও এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, বাবা! তুমি আমাদেরকে এত পর ভাবছ কেন? সেদিন না তোমাকে কোল থেকে নামিয়েছি! আমাদের সাথে তোমার আবার পর্দা কিসের? তুমি বাইরে দাঁড়িয়ে কথা বলছ।

আয় বাবা ঘরে আর, তোমাকে দেখে কলিজাটা ঠাণ্ডা করি।

চাচাজান আমার হাত ধরে আমাকে অন্দরমহলে নিয়ে গেলেন। বাবর ভাইও আমার পিছু পিছু গেল। এক এক করে বাড়ির ছোট-বড় অনেকেই এসে আমাকে দেখতে লাগল। অনেকেরই চোখ ছল ছল করছে।

চাচিমা আমাদের জন্য খাবার নিয়ে এসে বললেন, আগে খানা খাও, পরে কথা হবে। আম্মুর চিন্তায় আমার পেটে কোন ক্ষুধা নেই। কয়েকবার কাতর স্বরে আম্মুর কথা জিজ্ঞেস করলাম। কিন্তু তারা কোন উত্তর না দিয়ে শুধু কথা ঘুরাচ্ছেন। অগত্যা সামান্য আহার করে পুনঃ জিজ্ঞেস করলাম। চাচাজান বললেন, বাবা! তুমি বাড়ি থেকে যাওয়ার পর তোমার আম্মার ঘুম হারাম হয়ে গিয়েছিল। দিনমান শুধু তোমার পথপানে চেয়ে অশ্রু ঝরাত। তোমার চাচিমা প্রায়ই খুব জোর করে দু'চার লোকমা খানা খাওয়াত। সবসময় তোমার ফিরে আসার অপেক্ষায় পথপানে চেয়ে থাকত। রাস্তায় কোন কাফেলা দেখলে তোমার কথা জিজ্ঞেস করত। অনেক সময় গভীর রাতেও ঘর থেকে বেরিয়ে যেত এই বলে, ঐ যে আমার খোবায়েব আসছে। আম্মু আম্মু বলে ডাকছে। কখনো মাথার চুল ধরে টেনে ছিঁড়তেন, আবার কখনো বুকে হাত মেরে বিলাপ করতেন, আবোল-তাবোল বকতেন। তিনি আসলে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন।

আমরা গ্রামবাসীরা তোমার আম্মাকে মানসিক হাসপাতালে নিয়ে অভিজ্ঞ ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা করিয়েছি। কিন্তু কোন কাজ হয়নি। কখনো কখনো সারা গ্রাম ঘুরে বেড়াতেন আর তোমার কথা জপতেন। আজ প্রায় এক মাস যাবত কোথায় গেছেন, নাকি পরপারে পাড়ি জমিয়েছেন তা কেউ বলতে পারে না।

চাচার মুখ থেকে একথা শোনার সাথে সাথে আমি জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে পড়ে যাই। দীর্ঘক্ষণ জ্ঞানশূন্য অবস্থায় ছিলাম। তারপর সবাই আমাকে চিকিৎসা দিয়ে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনেন। আমি বাবর ভাইকে বললাম, তুমি বাড়ি ফিরে যাও। আমি আমার আম্মুর খোঁজে পথে পথে ঘুরে বেড়াব।

বাবর ভাই বললেন, খোবায়েব ভাই! তুমি না একজন মুজাহিদ। আল্লাহ কি বলেননি যে, প্রত্যেক প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে

হবে। সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) জীবনের চেয়ে নবীকে বেশি ভালবাসতেন। তিনিও তো দুনিয়া থেকে চলে গেছেন। তার তিরোধানে সাহাবায়ে কেরাম কোন কাজ বাদ দেননি। অনেক সাহাবা শহীদ হয়েছেন। অনেক মায়ের কোল খালি হয়েছে, অনেক শিশু এতিম হয়েছে, অনেক নারী বিধবা হয়েছে। তাই বলে কি তারা তোমার মতো ভেঙ্গে পড়েছে? তুমি না বন্দীদেরকে কুহেলাব্বির শিখড়ে জমা হতে বলেছ! ওদের কাছে না যাওয়া কি ওয়াদার খেলাফ হবে না? আর ওয়াদা ভঙ্গ করা কি মুনাফেকী নয়?

বাবর ভাইয়ের কথা শুনে আমার অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন হল। বুকে বল পেলাম, ধৈর্যধারণের ক্ষমতা ফিরে পেলাম। বুকের মাঝে প্রতিশোধের আগুন জ্বলতে লাগল।

আমি চাচা-চাচীকে বললাম, আমরা এখন চলে যাচ্ছি। খুব জরুরী কাজ আছে। আমাদেরকে থাকার জন্য তারা খুব পীড়াপীড়ি করলেন। কিন্তু কোন বাধাই আমাকে দমিয়ে রাখতে পারেনি। বিদায়ী ছালাম জানিয়ে বাবর ভাইকে নিয়ে অন্ধকারে হারিয়ে গেলাম। বহু রাস্তা পেরিয়ে রাত ১২টার দিকে আমরা কুহেলাব্বির উচ্চ শিখড়ে এসে পৌঁছলাম।

ঘুটঘুটে অন্ধকার। দু'চোখে কিছুই দেখা যায় না। লোকজনের কোন সাড়া-শব্দ নেই। আমরা পেরেশান হয়ে তাদেরকে খুঁজতে লাগলাম। আমরা ভাবছিলাম, বিলম্বের কারণে তাঁরা ফিরে গেল কিনা? এদিক-ওদিক খোঁজাখুঁজির পর মৃদুস্বরে একটি আওয়াজ ভেসে এল, খোবায়েব ভাই! তুমি এসেছ? আমি জবাবে বললাম, হ্যাঁ, এসেছি। এই বলে আমি যুবকদের মাহফিলে গিয়ে বসলাম।

আমি উপস্থিত যুবকদেরকে লক্ষ্য করে বললাম, হে আমার প্রাণপ্রিয় যুবক বন্ধুরা! আজ আমরা আরামের বিছানা হারাম করে, সুখ নিদ্রাকে বিসর্জন দিয়ে কুহেলাব্বীর গভীর অরণ্যে কেন হাজির হয়েছি, তা সকলের জানা। কমিউনিস্ট হায়েনারা আমাদের মা-বোনদের ইজ্জত হরণ করছে, আলেম-ওলামাদেরকে শহীদ করছে। মসজিদ-মাদ্রাসাগুলোয় তালা লাগিয়ে দিচ্ছে। এমনকি মাছুম বাচ্চারাও হায়েনাদের অত্যাচার থেকে রেহাই পাচ্ছে না। এসব নির্যাতিত-

নিপীড়িত মানুষের মুক্তির জন্য, আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা করার জন্য আল্লাহ আমাদের উপর জিহাদ ফরজ করে দিয়েছেন। জিহাদে বের না হওয়া আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ।

আল্লাহপাক পবিত্র কালামে ইরশাদ করেন, "হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কি হল, যখন তোমাদেরকে আল্লাহর পথে বের হবার জন্য বলা হয়, তখন তোমরা মাটি জড়িয়ে ধর? তোমরা কি আখেরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে পরিতুষ্ট হয়ে গেলে? অথচ আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবনের উপকরণ অতি অল্প।" (সূরা তওবা ঃ আয়াত ৩৮)

অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে, "তোমরা যদি যুদ্ধে বের না হও, তবে আল্লাহ তোমাদের মর্মন্তুদ আযাব দেবেন এবং অপর জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন। তোমরা তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে শক্তিমান।" (সূরা তওবা ঃ আয়াত ৩৯)

উক্ত আয়াতে কারীমা দ্বারা এটাই প্রতীয়মান হয়, আখেরাতের নেয়ামত ও সুখ-শান্তি পেতে হলে জিহাদ করতে হবে। আর কাফের-বেঈমানদের সাথে যুদ্ধ না করলে তাদেরকে আমাদের উপর চাপিয়ে দেবেন অর্থাৎ কাফেররা আমাদের উপর কর্তৃত্ব-নেতৃত্ব করবে, আর যুলুম করবে। আর তা আমাদেরকে মাথা পেতে মেনে নিতে হবে, বরদাস্ত করতে হবে এবং তাদের কোন ক্ষতিও আমরা করতে পারব না। বাস্তবে ব্যাপারটা এরকমই চলছে। এই বলে বাবরকে আমীর নিযুক্ত করে সবাইকে বাবরের কাছ থেকে অস্ত্র চালনা শিক্ষার নির্দেশ দিলাম। আমীরকে মান্য করা, পরামর্শ করে কাজ করার তাকিদ দিয়ে সবাইকে বিদায় দিলাম।

আমরা শেষ রাতে বাবর ভাইয়ের বাড়ী গিয়ে হাজির হলাম। বাড়ী ফেরার সাথে সাথে বুড়ো মা প্রদীপ জ্বালিয়ে আমাদেরকে হাত-পা ধুয়ে আসতে বললেন। আমরা হাত-পা ধুয়ে ঘরে এসে দেখি খানা প্রস্তুত। আমরা তৃপ্তির সাথে খানা খেলাম।

ফজরের সময় হয়ে গেছে। বাবর ভাইকে নিয়ে আমি নামায আদায় করে রুদ্ধকক্ষে বসলাম। তাকে এক এক করে সবগুলো হাতিয়ার চালানোর সব ধরনের প্রশিক্ষণ দিয়ে অনুশীলনের মাধ্যমে আরো পাকাপোক্ত করে দিলাম।

অত:পর তাকে গনীমতের সবগুলো অস্ত্র ও গোলাবারুদ দিয়ে বললাম, এগুলো মহামূল্যবান সম্পদ। এগুলোর কদর করবে। মহানবী (সাঃ) অস্ত্রকে অধিক মহব্বত করতেন। অস্ত্র হাতে আসলে চুমু খেতেন। তারপর বললাম, এগুলো সাথীদের মাঝে বন্টন করে দেবে। খুব বিচক্ষণতার সাথে জিহাদ চালিয়ে যাও। অবশ্যই আল্লাহ বিজয় দান করবেন।

সকাল ৮টা। চোখের পাতা ঘুমে আক্রান্ত হয়ে বন্ধ হয়ে আসছে। কাজেই বাধ্য হয়ে কিছুক্ষণের জন্য উভয়ে ঘুমিয়ে নিলাম। দুপুর একটার দিকে উঠে গোসল সেরে নামায আদায় করে খানা খেলাম। তারপর বাবরের বৃদ্ধ মাতাকে আমার আম্মুর হৃদয়বিদারক কাহিনী শোনালাম। বাবরের মা কাঁদতে কাঁদতে অস্থির হলেন। আম্মুর তালাশে বের হওয়ার এজাজত তলব করলে তিনি হাসিমুখে এজাজত দিলেন এবং বললেন, বাবা! তোমার আম্মাকে খুঁজে বের করে আমার এখানে নিয়ে এস। তিনি আমার সাথেই থাকবেন। আমি পোশাক পরিবর্তন করে প্যান্ট-শার্ট পরে আম্মুর খোঁজে বেরিয়ে পড়লাম।

[সাতাশ]

আমি মন্থরগতিতে পথ চলছি। কোথায় যাব, আম্মুকে কোথায় পাব, কার কাছে খোঁজ নেব কিছুই ভেবে পাচ্ছি না। আনমনে চলছি আর ভাবছি, আম্মু তো ছিলেন নানাজানের একমাত্র আদরের দুলালী। আলেমের মেয়ে, আবার একজন আলেমের স্ত্রী। ছোটকাল থেকেই খাস পর্দা পালন করে আসছেন। কোনদিন কোন পরপুরুষ তাকে দেখতে পায়নি। শুনতে পায়নি তার কণ্ঠস্বর। সংসারের কাজগুলো নিজ হাতে সমাধা করে বাকি সময় এবাদত-বন্দেগীতে কাটাতেন। শেষ রজনীতে দেখেছি, তিনি আঁধার গৃহের এক কোণে সালাতে দণ্ডায়মান। হায়! এমন এক পর্দানশীল মহিয়সী নারী আজ পথে পথে পাগলিনীর বেশে ঘুরছেন। আহ! কি করুণ কাহিনী। কি হৃদয়বিদারক ঘটনা। নাকি কোথাও শহীদ হয়ে পড়ে আছেন দাফন-কাফন ছাড়া তা কে জানে? এসব চিন্তায় আমার হৃদয় চৌচির হয়ে যাচ্ছে। অশ্রুতে বুক ভেসে যাচ্ছে। কি করব না করব স্থির করতে পারছি না। কতটুকু রাস্তা অতিক্রম করেছি তাও বলতে পানি না।

কত শহর-বন্দর, মাঠ-ঘাট, হাট-বাজার পেরিয়ে আম্মুকে তালাশ করেছি তার কোন ইয়ত্তা নেই। রাস্তায় যে কোন মানুষ পেলে আম্মুর আকার-গঠন বর্ণনা করে জিজ্ঞেস করেছি, এ ধরনের কোন মহিলাকে তারা দেখেছে কিনা? সবাই না সূচক উত্তর দিল। আবার কেউ উত্তর দিল, হ্যাঁ, এমন একজন মহিলাকে অমুক স্থানে দেখেছি। আমি সেদিকে পাগলের মতো ছুটে গিয়েছি। তথাকার লোকজনকে জিজ্ঞেস করলে তারা বলেছে, না এমন কোন পাগলিনীকে তো দেখিনি। আবার কেউ বলেছে, হ্যাঁ, কয়েকদিন তো এমন একজন মহিলাকে ঘুরতে দেখেছি। এসব শুনে আমি আরো পাগলপারা হয়ে খুঁজতে লাগলাম। হায়! কোথাও তো সন্ধান মিলল না।

আমি হেঁটেই চলছি। কারণ, কোন যানবাহনে চড়লে দ্রুতগতিতে চলে যাব। আম্মু যদি রাস্তায় থাকেন, তবে তো নজরে পড়বে না।

নিয়মিত ঘুম নেই। সময় মত খাওয়া নেই। গোসলের তো প্রশ্নই আসে না। অনাহারে-অর্ধাহারে দিনরাত ঘুরছি। এমনিভাবে ঘুরে ঘুরে দু'মাস অতিবাহিত হয়ে গেল, কিন্তু আম্মুর কোন সন্ধান পেলাম না।

আমার স্বাস্থ্যের অবস্থা দেখে মানুষকে পরিতাপ করতে শুনেছি, আহ! কি সুন্দর চেহারা। মনে হয় কোন উচ্চ বংশের সন্তান হবে। ব্রেন আউট হওয়ার কারণে আজ পথে পথে ঘুরছে। আবার কেউ কেউ তাদের ধারণা অনুযায়ী বলল, হয়ত কোন নারীর ব্যর্থ প্রেমের ফাঁদে পড়ে তিলে তিলে ক্ষয় হচ্ছে।

ছোট ছোট বালক-বালিকারা পিছু পিছু হৈ চৈ করে উল্লাস করে হাতে তালি দেয়, গালি দেয়, আবার বলে পাগল রে তোর বাড়ি কৈ। কোন কোন দুষ্টু প্রকৃতির বালক-বালিকারা ঢিল-পাথর নিক্ষেপ করে পাগলের পাওনা পরিশোধ করছে। আমার শরীর ক্ষত-বিক্ষত।

একবার ক্ষুধা-পিপাসায় কাতর হয়ে রাস্তার পাশে এক বৃক্ষ তলে শুয়ে বিশ্রাম করছিলাম। এমন সময় একটি পুলিশের ভ্যান আমার নিকট দিয়ে অতিক্রম করে। পুলিশ আমাকে দেখে ভ্যান থামিয়ে জোর করে ধরে আমাকে ভ্যানে উঠিয়ে নিয়ে যেতে শুরু করে। আমি অবোধ বালকের মত হাউ মাউ করে কাঁদতে লাগলাম। পুলিশ আমার দু'গালে দু'টি চড় বসিয়ে দিয়ে বলল, খামুশ।

আমি পুলিশকে সবিনয়ে বললাম, স্যার! আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন?

পুলিশ উত্তর দিল, শ্বশুর বাড়ী।

আহ! কি বিদ্রূপ। আমি কতক্ষণ চুপ থেকে আবার বললাম, স্যার! আমার অপরাধ কি? কোথায় নিয়ে চলছেন?

আমার প্রশ্নে অন্য এক পুলিশ বলল, লেলিন নির্দেশ দিয়েছে, অকর্মন্য, বিকলাঙ্গ, বৃদ্ধ ও তোমার ন্যায় পাগলদের ধরে জেলখানায় বন্দী করতে। তাই তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি।

আমি বললাম, স্যার! আমি তো পাগল নই। আমি আমার আম্মুকে তালাশ করছি।

পুলিশ বলল, হ্যাঁ, পাগল কি কোনদিন নিজেকে পাগল বলে?

আমি প্রশ্ন করলাম, এদেরকে একত্রিত করে কী করবেন?

পুলিশ বলল, এগুলো সমাজের আবর্জনা, জঞ্জাল। এদেরকে চিকিৎসা করান হবে। যদি তিন মাসের মধ্যে সুস্থ না হয়, তবে ফায়ার করে হত্যা করা হবে। তারপর চিড়িয়াখানার বাঘ আর সিংহের খাবার হিসেবে তাদেরকে দেয়া হবে।

এবার আমি আরো বেশি ঘাবড়ে গেলাম। বেশী বেশী দোয়া করতে লাগলাম আর আল্লাহর মদদ চাইতে লাগলাম। আহ! ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস! কত কঠিন পরীক্ষা!

পুলিশ প্রথমে আমাকে জেলখানায় না নিয়ে পাগলা গারদে নিক্ষেপ করল। সেখানে নারী, পুরুষ, যুবক, যুবতী, বুড়ো-বুড়ির কোন অভাব নেই। গালাগালি, মারামারি, হাতাহাতি চলছেই। এখানে অনেক ভিক্ষুক ও ভাল মানুষকেও সন্দেহ করে ধরে নিয়ে আসা হয়েছে। হতভাগারা আসছে ঈমানী পরীক্ষা দিতে। পাষণ্ডরা ঘুমের বড়ি আর ইনজকেশন দিয়ে এদেরকে নিস্তেজ করার চেষ্টা করছে।

একবার একজন লোক আমাকে বলল, ওরা অনেক বৃদ্ধ-বৃদ্ধাকে আমার সামনে নির্মমভাবে হত্যা করে ট্রাকভর্তি করে চিড়িয়াখানায় প্রেরণ করেছে। তাদের অপরাধ হল, তারা বৃদ্ধ, কাজ করতে পারে না। তাই তাদের এই পরিণতি।

অনেকে প্রায়ই আমার কাছে এসে ভীড় জমাত। আমি তারেদকে

নামায-রোযার তালিম দেই। মুখস্ত কুরআন শরীফ পড়াই। জিহাদের প্রয়োজনীয়তা ও ফাজায়েল বর্ণনা করি। আমার আলোচনায় দিন দিন লোকের ভীড় বাড়তে লাগল।

একবার আমি সবাইকে লক্ষ্য করে বললাম, হে আমার মজলুম ভাইয়েরা! তোমরাই তো একদিন ঘর থেকে রাজপথে কাস্তে-হাতুড়ি মার্কা ব্যানার নিয়ে বেরিয়েছিলে এ শ্লোগান দিয়ে, কেউ খাবে আর কেউ খাবে না, তা হবে না তা হবেনা। তোমরা সামান্য একটু রুটির বিনিময়ে এনজিওদের কাছে ঈমান বিক্রি করেছিলে! আজ তা তিলে তিলে উপভোগ কর। তোমরা নবীর দেয়া আদর্শকে হত্যা করেছ। জিহাদের পথকে ত্যাগ করেছ। অথচ জিহাদই ছিল বাঁচার একমাত্র পথ। শুধু দোয়া আর খতম দ্বারা কাজ হবে না। নবী করীম (সাঃ) দোয়ার সাথে সাথে অস্ত্রও ধরেছিলেন।

আমার কথা শুনে অনেকেরই ভুল ভাঙ্গল। মানব রচিত বিধানের অপকারিতা ও কমিউনিজমের চরিত্র ভালভাবে অবলোকন করেছে। এখন সকলেই বাকি জীবন জিহাদ করে কাটিয়ে দেয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করছে। একদিকে বিকারগ্রস্থরা হৈ-হুল্লোড় করছে, অপরদিকে আমরা তালিম-তালকিনে সময় কাটাচ্ছি। এভাবে পাগলা গারদে আটাশ দিন কেটে গেল।

একদিন হঠাৎ করে তারা আমাকেসহ বিশ-পঁচিশজনকে জোর করে পাঠিয়ে দিল জেল হাজতে। তার কারণ জানতে পারলাম, আমি নাকি ইসলামী আন্দোলনের একজন নেতা। আমি নাকি বন্দীদেরকে বলসেভিকদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলছি। বন্দীশালায় নাকি সবাই রুহানী হয়ে যাচ্ছে।

এ সংবাদ গারদ কর্তৃপক্ষ আইন প্রয়োগকারী সংস্থার গোচরে দেয়। তারপর কঠোর শাস্তির জন্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থা আমাদেরকে নিয়ে এল বহু দূরে। ঢুকিয়ে দিল জেল হাজতে। আমরা এখানে তিনদিন তিনরাত অতিবাহিত করার পর একদিন শুধু আমাকে নিয়ে গেল অন্ধকার প্রকোষ্ঠে, ফাঁসির সেলে। সেখানে নেই কোন প্রাণী, নেই আলো-বাতাস। এটা যে ঈমানের উচ্চ পরীক্ষা! তা বুঝতে বাকি রইল না।

আমাকে সেলে ঢুকানোর সাথে সাথে বাবুর্চি এসে জানাল, তোমাকে দু'বেলা দু'টো রুটি আর শূকরের গোস্ত দেয়া হবে। মাননীয় জেলার সাহেব তোমার জন্য এই খাবার বরাদ্দ করেছেন। বাবুর্চির কথা শুনে আমি প্রতিজ্ঞা করলাম, কাফেরদের দেয়া খাবার ভক্ষণ করব না। আল্লাহ আমার রব, তিনি ইচ্ছা করলে না খাইয়েও আমাকে বাঁচাতে পারেন, ক্ষুধার জ্বালা কমিয়ে দিতে পারেন। যা শপথ তা কাজ।

বাবুর্চি প্রতিদিন দু'বেলা গোস্ত-রুটি নিয়ে আসে। আমি পানি ছাড়া অন্যকিছু গ্রহণ করি না।

তিনদিন অতিবাহিত হওয়ার পর বাবুর্চি আমাকে জিজ্ঞেস করল, বাবা! তুমি না খেয়ে কিভাবে থাক?

আমি বললাম, আমি মুসলমান, তোমাদের দেয়া হারাম না খাওয়ার জন্য আল্লাহর নামে কসম খেয়েছি। তখন থেকে আমার ক্ষুধা অনুভব হয় না।

বাবুর্চি আমার নিকট ঈমান গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে যায়। সে মুসলমান হয়ে প্রায়ই আমার কাছে আসে। আমি তাকে দ্বীনের কথা, ধর্মের কথা ও মাছলা-মাছায়েল তালিম দেই। এভাবে এগারদিন কেটে গেল।

একদিন জেলার বাবুর্চিকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি দেখি প্রত্যেক দিনই খানা ফিরিয়ে আন, তার কারণ কি? বাবুর্চি উত্তর দিল, স্যার! প্রথম দিন থেকে আজ পর্যন্ত সে আমাদের কিছুই গ্রহণ করেনি। শুধু পানি পান করে জীবনধারণ করছে। জেলার বললেন, আমরা দিনে তিন-চারবার খাই, তাছাড়া চা-বিস্কুট-চানাচুর তো আছেই। তারপরও অনেক সময় ক্ষুধায় জীবন যায়। আর এ কয়েদী এগারদিন যাবত কিছুই খায়নি, সে কিভাবে থাকে? লোকটাকে দেখা দরকার।

সত্যি সত্যি একদিন জেলার আমার কক্ষের দরজায় এসে হাজির। আমি তখন আম্মুর জন্য অস্থিরতা ভোগ করছিলাম। হটাৎ দরজায় আঘাত দিতেই আমি চমকে উঠলাম। কে যেন বলছে, দরজা খোল। আমি তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দেখি, বিরাট এক জোয়ান, ইয়া বড় গোফ, চোখ দু'টি তামাটে। দেহ ঢোকার আগেই বিশাল ভুড়িওয়ালা পেটটা কক্ষে প্রবেশ করল।

তিনি প্রথমে নিজের পরিচয় দিলেন। তারপর আমাকে প্রশ্ন করলেন, বাপু! তোমার বাড়ি কোথায়? বললাম, আলমাআতা।

প্রশ্ন করলেন, তুমি কী কর?

উত্তর দিলাম, কলেজে লেখাপড়া করি আর ফাঁকে ফাঁকে কুলির কাজ করি।

তিনি বললেন, কুলির কাজ কেন কর?

বললাম, স্যার! আমি গরীব মানুষ, বাবা-মার একমাত্র সন্তান। তারা লেখাপড়ার খরচ দিতে পারেন না বলে এ কাজ করি।

তিনি বললেন, তুমি এখানে এলে কিভাবে?

বললাম, স্যার! আমার আম্মু বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছেন। তাকে খুঁজতে গিয়ে আজ এখানে। তিনি প্রশ্ন করলেন, তুমি কি মৌলবাদে বিশ্বাসী?

উত্তর দিলাম, আগে ছিলাম না, এখন হতে হবে। কারণ, জীবনভর কমিউনিস্ট বিপ্লব করে এসেছি। এখন ভাগ্যের বিড়ম্বনায় ফাঁসির সেলে। এই বলে পকেট থেকে মেজর ও প্রধান সেনাপতির দেয়া পরিচয়পত্রটা বের করে তার সামনে ধরলাম।

জেলার তা ভাল করে দেখে বললেন, বাবা! তুমি চিন্তা কর না, তোমার মুক্তির ব্যবস্থা অচিরেই করব। পুলিশ হয়ত তোমাকে ভুলবশত গ্রেফতার করেছে। এই বলে লোকটি চলে গেলেন।

মাত্র কয়েক কদম এগিয়ে গিয়ে জেলার আবার ফিরে এসে বললেন, তোমাকে একটি কথা জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেছি। বল তো বাবা! তুমি আজ এগার দিন যাবত কিছু খাও না। বেঁচে আছ কিভাবে?

জেলারের প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিলে তো আমার আর রক্ষা নেই। আবার কিছু না বলেও তো উপায় নেই।

আমি বললাম, স্যার! আসলে আমি জন্মগতভাবে মুসলমান। এখন না কমিউনিজমের সন্ধান পেয়ে কমিউনিস্ট হয়েছি। আগে মুসলমানই ছিলাম। কমিউনিস্ট হওয়ার পরেও যদি বলসেভিকদের নির্যাতন ভোগ করতে হয়, তবে এ ধরনের কমিউনিস্ট হওয়াতে লাভ কি? তাই বন্দী জীবনে মুহাম্মদ (সাঃ)-এর খোদার নিকট প্রার্থনা করেছি এবং তারই এবাদত করছি। সেই নিরাকার খোদা আমাকে কোন কিছু না খাইয়ে

জীবিত রেখেছেন। এমনকি ক্ষুধার কোন কষ্টও আমি অনুভব করছি না।

আমার কথা শুনে জেলার বললেন, বাবা তুমি সত্য কথাই বলেছ। তোমাকে ধন্যবাদ। আমিও মুসলমান ছিলাম। চাকুরী বাঁচাতে গিয়ে কমিউনিস্ট হতে বাধ্য হয়েছি। এখন আস্তে আস্তে কমিউনিজমের প্রতি ঘৃণা জন্মাচ্ছে। কারণ, আগে এ পার্টিকে খুব পছন্দ করে গ্রহণ করেছিলাম, এখন তো দেখি গরীব, অসহায়, ভিক্ষুক, রোগগ্রস্থ ও বৃদ্ধদের কোন মর্যাদা এদের কাছে নেই। বার্ধক্যের কারণে কাজ করতে পারে না, এমন অনেক পিতৃতুল্য মুরুব্বীদেরকে হত্যা করে চিড়িয়াখানায় পাঠাচ্ছে। এমনকি আমার পিতাকে পর্যন্ত তারা ক্ষমা করেনি।

জেলার আরো বললেন, তুমি তোমার নীতির উপর অটল-অবিচল থাক। আমিও আজ থেকে তওবা করে আসলের দিকে ফিরে যাব। আল্লাহ যেন আমার কৃত অপরাধ মার্জনা করেন।

তিনি আরো বললেন, তোমাকে মুক্ত করতে দু'একদিন সময় লাগতে পারে। তবে আজকেই তোমাকে ফাঁসির সেল থেকে অন্য একটি সেলে স্থানান্তর করব। তুমি আল্লাহর নিকট দোয়া করতে থাক। এই বলে তিনি বেরিয়ে গেলেন।

দিন চলে গেল, রাত এল। আমি তায়াম্মুম করে ইবাদতে লিপ্ত হলাম। এবাদত-বন্দেগী, জিকির-আজকার ও তিলাওয়াতের মধ্যদিয়ে রাত কাটিয়ে দিলাম। সকাল আটটায় কিছু কাগজপত্র নিয়ে জেলার নিজে আসলেন এবং বললেন, বাবা! তুমি আমার সঙ্গে আস। আমি জেলারের পিছু পিছু বেরিয়ে গেলাম। কয়েকটি বিল্ডিংয়ের পর এক বিল্ডিংয়ে নিয়ে বললেন, এই সেলে আলো-বাতাস, পানি সবকিছুই রয়েছে। আপাতত এখানে থাক। আগামীকাল আটটায় তুমি রিলিজ পাবে।

জেলার চলে গেলেন।

আমি উক্ত সেলটি ঘুরে ঘুরে দেখছি। আগেরটির তুলনায় অনেক উন্নত, মানুষ থাকার উপযুক্ত। আমি আল্লাহর শুকর আদায় করলাম।

এ বিল্ডিং-এ অনেকগুলো সেল রয়েছে। আমি সবগুলো সেল ঘুরে ঘুরে দেখছি আর জিহাদের দাওয়াত দিচ্ছি। এমন সময় প্রকোষ্ঠের এক

কোণে সবুজ রঙের সেলোয়ার ও সুর্মা রঙের ফুলহাতা কামিজ পরা একজন মহিলাকে দেখে চমকে উঠলাম।

আমি দ্রুতপদে তার দিকে এগিয়ে গিয়ে অবাক হয়ে যাই। এ যে আর কেউ নয়, আমার প্রাণপ্রিয় আম্মুজান। আমি এক চীৎকার দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরলাম। আম্মু আম্মু বলে কেঁদে ফেললাম। হায়! তার মুখে একই জপনা খোবায়েব, খোবায়েব। কিন্তু তিনি তো আমাকে গ্রহণ করলেন না। কত যে বোঝালাম, আম্মু তোমার খোবায়েব তোমার কোলে ফিরে এসেছে। একটিবার তুমি আমার দিকে তাকাও। তোমার পাগলকে গ্রহণ কর। কিন্তু তিনি যেন আমাকে দেখতেই পাচ্ছেন না। তিনি একদম পাগল হয়ে গেলেন, এতে কোন সন্দেহ নেই।

এগারটার দিকে তিনজন পুলিশ একটি ভ্যান নিয়ে আসে। ছবি দেখে দেখে হাত-পা বেঁধে লোকদের ভ্যানে তুলছে। এর মধ্যে আম্মুর ছবিও রয়েছে। এই সেল থেকে দশ-বারজনের নাম লিস্ট হয়েছে। এদেরকে হত্যা করে নিয়ে যাবে চিড়িয়াখানায়। আম্মুকে কিছু বলার আগেই তিনি ভ্যানে ওঠার চেষ্টা করছেন।

আমি পুলিশদেরকে হাতে-পায়ে ধরে বললাম, ইনি আমার আম্মু। আমার চিন্তায় তিনি পাগল হয়ে গেছেন। আপনারা দয়া করে আমার আম্মুকে রেখে যান। আমি চিকিৎসা করিয়ে দেখি তিনি ভাল হন কিনা। আমার কথায় এক পুলিশ ধমক দিয়ে বলল, খামুশ! যাদের লিস্ট আমাদেরকে দেয়া হয়েছে, তাদেরকে ছেড়ে দেয়ার কোন আইন নেই। একে অবশ্যই নিয়ে যেতে হবে।

এ ধরনের কথোপকথনের মধ্যেই জেলার এসে গেলেন। তিনি পুরো ঘটনা শুনলেন। তারপর বললেন, একে রেখে যাও। পরে দেখব কি করা যায়। পুলিশ আম্মুকে রেখে অন্যদেরকে নিয়ে চলে গেল।

জেলার আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, বাবা! যাকে খুঁজতে গিয়ে জীবনের দু'তিন মাস নষ্ট করেছ, সোনার দেহ ক্ষয় করেছ, আজ তার সন্ধান পেয়েছ। জেলখানায় আসা একটা পরীক্ষা। তুমি পাগল হয়ে তোমার মাকে তালাশ করেছ। কোথাও পাওনি। এখানে জিন্দিগীতে আসা হত না। কারণ, একটা সংরক্ষিত এলাকা। তুমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছ, আল্লাহ তা কবুল করেছেন। আল্লাহ তোমাকে

কুদরতিভাবে গ্রেফতার করিয়ে পাগলা গারদ ও ফাঁসির সেল ঘুরিয়ে তোমার মায়ের নিকট নিয়ে এসেছেন। সুবহানাল্লাহ!

পরদিন জেলার সাহেব আমাকে ও আম্মুকে বের করে মানসিক হাসপাতালে নিয়ে গেলেন। সেখানে ভর্তি করে উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন। ওষুধের জন্য প্রচুর টাকা দিলেন। দিলেন বড় বড় ডাক্তার।

বেশ ক'দিন চিকিৎসা করার পর এখন আম্মুর কিছুটা পরিবর্তন দেখা যায়। আগে তো মোটেই ঘুমাতেন না।। এখন কিছুক্ষণ ঘুমান। আগের তুলনায় খানাপিনাও করতে পারেন। এভাবে আরো ক'দিন অতিবাহিত হল।

একদিন আম্মু শুয়ে ঘুমাচ্ছেন। আমি তার শিয়রে বসে মাথায় তেল দিচ্ছি। প্রায় তিন থেকে চার ঘন্টা ঘুমিয়ে হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে উঠে বসলেন। আমার দিকে তাকিয়ে এক চীৎকার দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, খোবায়েব! বাবা তুই ফিরে এসেছিস? এত বিলম্ব করলি যে!

আম্মুর অবস্থা দেখে বুঝতে পারলাম, তিনি জ্ঞান ফিরে পেয়েছেন। এখন আমার আনন্দ দেখে কে? আমি আল্লাহর শোকর করতে লাগলাম। এ অবস্থায় সবকিছু আম্মুর নিকট বলা ঠিক হবে না। তাই অভয়বাণী, কুরআন ও হাদীসের বাণী শুনিয়ে সময় কাটাই। জেলার প্রতিদিন আমাদের খোঁজ নিতে হাসপাতালে আসেন।

সপ্তাহকাল হাসপাতালে আম্মুকে নিয়ে অতিবাহিত করলাম। এখন আলহামদুলিল্লাহ, তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছেন। হাসপাতাল থেকে রিলিজের জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট গেলে বলা হল, আরো ক'দিন রাখতে পারলে ভাল হবে। তবে এখনও নিয়ে যেতে পারেন, কিন্তু ওষুধগুলোর কোর্স পুরা করতে হবে। আমি তাতে রাজি হলাম।

অন্যদিনের মতো জেলার সাহেব হাসপাতালে আসলে বিদায়ের আবেদন জানালাম। তিনি খুশি হয়ে বললেন, যাও বাবা! আমি তোমার তেমন কোন উপকার করতে পারলাম না। এই বলে পকেট থেকে দু'হাজার টাকা বের করে আমার হাতে দিলেন। বললেন, তোমার মাকে এ দিয়ে পথ্য কিনে দিও। আর যখন টাকা-পয়সার দরকার হবে এসে নিয়ে যেও। ভালভাবে লেখাপড়া করবে। বলসেভিকদের সাথে বাড়াবাড়ি না করে খুব কৌশলে উৎখাতের চিন্তা কর। তিনি চলে গেলেন।

আমি আম্মুর জন্য ভাল কাপড়-চোপড়, জুতা ও বোরকা খরিদ করে আনলাম। তারপর গোসল করিয়ে সেগুলো পরিয়ে হাসপাতাল থেকে নিয়ে এলাম। সেখান থেকে বাসে চড়ে চলে এলাম আলমাআতায়। তখন রাত প্রায় ১২টা। এখন বুকাইলী যাওয়ার কোন যানবাহন নেই। তাই একটি হোটেলে গিয়ে আশ্রয় নিলাম। পরদিন ভোরে একটি ট্যাক্সি রিজার্ভ করে আম্মুকে নিয়ে তুরাব হারুনীর বাড়ীর দিকে রওয়ানা হলাম।

ট্যাক্সি তুরাব হারুনীর বাড়ীর আঙ্গিনায় আসার সাথে সাথে ছায়েমা ও তৃষ্ণা দৌড়ে এসে আম্মুকে কোলে করে অন্দর মহলে নিয়ে গেল। তুরাব হারুনীও মাঠ থেকে দৌড়ে বাড়ী আসল। ছায়েমা ও অন্যদের দেখে আম্মু প্রশ্ন করলেন, এরা করা? আমাকে কোথায় নিয়ে আসলি বাবা? আমি বললাম, জামবুল অনেক দূর। সেখানে এখন যাওয়া সম্ভব নয়। এখানে দু'চার দিন বিশ্রাম করে আপনাকে নিয়ে বাড়ী ফিরব।

ছায়েমার পরিচয় জানতে চাইলে তৃষ্ণা হাসতে হাসতে কৌতুক করে বলল, এ আপনার পুত্রবধূ। ছায়েমা মুচকি হেসে মুখ লুকিয়ে ফেলল। আম্মু হঠাৎ করে বলে ফেললেন, তাহলে তো মনের মতো বৌমা পেয়েছি। আমি আম্মুর ভ্রম দূর করতে গিয়ে বললাম, না মা, তৃষ্ণা দুষ্টুমী করছে। আসলে এ আমার সহযোদ্ধা। আমরা এক সাথেই হেফজখানায় লেখাপড়া করেছি। একসাথেই যুদ্ধ করছি। এখন সে অসহায়। তাই...।

ছায়েমা আম্মুর গোসলের জন্য পানি গরম করতে গেল। তৃষ্ণা নিয়ে এল বিভিন্ন ধরনের সুস্বাদু নাস্তা। আমি আম্মুকে নিয়ে তৃপ্তির সাথে নাস্তা করলাম। এদিকে ছায়েমা পানি গরম করে আম্মুকে গোসল করাতে নিয়ে গেল। ছায়েমা নিজ হাতে সাবান মাখিয়ে আম্মুকে ভালভাবে গোসল করাল। তারপর মাথায় তেল মাখিয়ে বিছানা করে দিল বিশ্রামের জন্য। বহু দিন পর আম্মুর সাথে একই খাটে শোয়ার সুযোগ পেলাম। চোখের পানি নজরানা দিয়ে আল্লাহর শোকর আদায় করতে লাগলাম। ছায়েমা আম্মুর শিয়রে বসে মাথায় হাত বুলাচ্ছে। তৃষ্ণা পাখা হাতে নিয়ে বাতাস করছে। এভাবে কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা ঘুমিয়ে পড়লাম।

ঘুম থেকে জেগে অযু করে নামায আদায় করলাম। দুপুরের

খানাপিনা সেরে আম্মুকে অল্প অল্প করে অতীতের ঘটনাবলী এবং আল্লাহর নুছরত ও মদদের কাহিনী শোনাতে লাগলাম। ছায়েমার পারিবারিক অবস্থা, তাকে উদ্ধারের ঘটনা, সেও যে আমাকে যুবকদের হাত থেকে বাঁচিয়েছিল এসব ঘটনা বর্ণনা করলাম। আম্মু অধীর আগ্রহে তা শ্রবণ করতে লাগলেন এবং যারপরনাই খুশী হলেন। তিনি আমার মাথায় হাত বুলিয়ে সোহাগ করলেন, ছায়েমাকেও সোহাগ করলেন। এসব আলাপ-আলোচনার মধ্যদিয়ে রাত হয়ে গেল। আব্বুর শাহাদাতের খবর আম্মু অনেক আগেই পেয়েছেন।

তুরাব হারুনীর বাসগৃহে আদর-যত্নের মধ্যদিয়ে কেটে গেল পঁয়তাল্লিশ দিন। এর মধ্যে দেশের অবস্থা দ্রুত খারাপ থেকে খারাপের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আম্মাজানও এখন পূর্ণ সুস্থ। চলাফেরা, খানাদানা সবই রীতিমত করতে পারেন। এখন এক মুহূর্তকাল এখানে বসে কাটান আমার কাছে এক বছরের মত মনে হচ্ছে। অযথা অমূল্য সময় নষ্ট করা জায়েয মনে করি না। তাই রাতে শুয়ে শুয়ে আম্মুকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বললাম, আম্মু! তোমার মতো লক্ষ মায়ের ইজ্জত রক্ষা করতে, তোমার লক্ষ ছেলের জীবন বাঁচাতে, বিধবা মায়ের অধিকার ফিরিয়ে দিতে, সন্তানহারা মায়ের চোখের পানি মুছে দিতে, বঞ্চিতের অধিকার ছিনিয়ে আনতে, মলিন মুখে হাসি ফুটাতে, মসজিদ-মাদ্রাসা রক্ষা করতে, সমস্ত জুলুমের অবসান ঘটিয়ে দ্বীন প্রতিষ্ঠা করতে তোমার কলিজার টুকরা নয়নের মণি খোবায়েবকে রণসাজে সজ্জিত করে রণাঙ্গনে পাঠিয়ে দাও। মাগো! যেতে দাও তোমার ছেলেকে শহীদের ঈদগাহে, খুনরাঙ্গা প্রান্তরে। মা তুমি তো শহীদের স্ত্রী হয়েছ! তুমি কি চাও না শহীদের জননী হতে? তুমি কি চাও না হযরত খানছা (রাঃ)-এর সাথে জান্নাতে থাকতে?

আমার কথা শুনে আম্মু কেঁদে আমাকে বুকের কাছে নিয়ে হাত বুলাতে লাগলেন। আম্মুর পাশে ছায়েমাও কেঁদে হয়রান, পেরেশান। আম্মু কি যেন একটু চিন্তা করে বললেন, যা বাবা! আল্লাহর রাস্তায় বেরিয়ে পড়। এখন থেকে আমি তোকে আল্লাহ রাস্তায় ছেড়ে দিলাম। তোর প্রতি আমার আর কোন দাবী নেই। দাবী শুধু একটাই যে, জীবন দিয়ে আল্লাহর জমিনে দ্বীন আর সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করবি।

আমার এজাজত হয়ে গেলে ছায়েমা কেঁদে কেঁদে বলল, খোবায়েব ভাই! তুমি কি আমাকে সঙ্গে নেবে না? আমি না তোমাকে মৃত্যুর হাত থেকে ছিনিয়ে এনেছিলাম। আমি কি তোমার সামান্যতম উপকারে আসব না? আমি স্বস্নেহে বললাম, ছায়েমা! আপাতত তুমি আম্মুর খেদমতে থাক। আমি আনোয়ার পাশার সাথে সাক্ষাৎ করে আলাপ-আলোচনা সেরে ফিরে আসব। তারপর তোমাকে নিয়ে যাব। আমার কথায় ছায়েমা রাজি হল বটে, কিন্তু কান্না থামাতে পারেনি। এসব আলাপ-আলোচনা করে সবাই ঘুমিয়ে পড়লাম।

প্রত্যুষে ঘুম থেকে জেগে দেখি, ছায়েমা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। আমি তার কাছে গিয়ে বললাম, আরে পাগলিনী! এখনো কাঁদছ? তাহলে আমার আর যাওয়া হবে না। ঠিক আছে, তোমাদের খেদমতেই রয়ে গেলাম।

ছায়েমা আঁচলে অশ্রু মুছে বলল, খোবায়েব ভাই! তুমি রাগ করছ কেন? আমি কি তোমাকে যেতে বারণ করেছি? আমি বললাম, তাহলে এমন আবোল-তাবোল বকছ যে? ছায়েমা বলল, তোমার বিরহ যাতনা আমি মোটেও সইতে পারি না। তোমাকে ছাড়া আমি এক মুহূর্ত থাকতে পারব না। তোমাকে দেখলে আমার ক্ষুৎ-পিপাসা কিছুই থাকে না। তুমি তো খাঁচা থেকে ছাড়া পেলে আর ফিরে আসতে চাও না। তুমি একা একা কাজাকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান, বুখারা-সমরকন্দ, তাসকন্দ সফর করবে। এর মাঝে কত বিপদ আসতে পারে। যদি শহীদ হয়ে যাও, তখন আমি কিভাবে বাঁচব...।

আমি সান্ত্বনা দিয়ে আবারও বললাম, তুমি দোয়া কর, আমি আনোয়ার পাশার সাথে সাক্ষাৎ করে, তার সাথে কথাবার্তা চূড়ান্ত করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে আসব। তারপর তোমাকে নিয়ে যাব। নিয়ে যাব আরো অনেক সাথীদেরকে। এবার ছায়েমা কিছুটা শান্ত হয়ে বলল, ঠিক আছে, যাও। আল্লাহ হাফেজ।

[আটাশ]

আমি ফজরের নামায পড়ে তুর্কমেনিস্তানের উদ্দেশ্যে বুকাইলী ত্যাগ করার আয়োজন করছি। তৃষ্ণা খানা তৈরীতে ব্যস্ত। ছায়েমা নিজ হাতে আমাকে শার্ট পড়িয়ে মাথা আঁচড়িয়ে, জুতা পরিয়ে, মাথায়

কমিউনিস্ট টুপি পরিয়ে সাজিয়ে দিল। বুকে কাস্তে-হাতুড়ি স্টিকার পিনের সাহায্যে আটকিয়ে দিতে ভুল করেনি।

একটু পরেই তৃষ্ণা নাস্তা নিয়ে হাজির হল। আমি বললাম, এবারের খানা একত্রে বসে খাব। তৃষ্ণা অন্য ঘর থেকে ইয়া বড় একটি থালা নিয়ে এল। তুরাব হারুনীকেও ডেকে নিয়ে সবাই একসাথে খানা খেলাম। আম্মু নিজ হাতে আমার মুখে খানা তুলে দিলেন, আমিও আম্মুর মুখে লোকমা তুলে দিলাম।

খানা খাওয়া শেষ করে সকলের কাছ থেকে বিদায় ও দোয়া নিলাম। তারপর আম্মুকে সালাম করে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। হারুনী পাঁচ হাজার টাকা এনে আমার পকেটে ভরে দিয়ে বলল, পথ অনেক দীঘ্য, টাকাগুলো রাখ, কাজে লাগবে। বিদেশে কেউ কাউকে সাহায্য করতে চায় না।

আমি রিকশায় চড়ে আলমাআতা রেলস্টেশন এসে হাজির হলাম। অনেকেই আমাকে দেখে মনে করেছে, আমি কলেজপড়ুয়া লেনিন সেনা। একটু পরেই তুর্কমেনিস্তানগামী মেইল ট্রেনটি এসে এক নাম্বার প্লাটফরমে দাঁড়াল। আমি টিকিট সংগ্রহ করে ট্রেনে গিয়ে আসন নিয়ে বসলাম। অনেক দূরের সফর, তাই যাতায়াতের সুবিধার জন্য একাই দু'টি সিট রিজার্ভ করে নিলাম, যাতে প্রয়োজনে ঘুমাতে পারি।

একটু পরেই ইস্রাফিলের সিংগা ফুঁকিয়ে ট্রেনটি পাগলা ঘোড়ার মতো ছুটে চলল। কত মাঠ-ঘাট, বন-বাদার পেরিয়ে চলছি। কোথাও বিরাম নেই। স্টেশনের পর স্টেশন পার হয়ে বড় বড় স্টেশনে গিয়ে থামে। পানি ও কয়লা তোলার জন্য দু'এক স্টেশনে একটু সময় বেশী খরচ করছে। এভাবে চার দিন চার রাত একটানা চলার পর ট্রেনটি তুর্কমেনিস্তান স্টেশনে এসে দাঁড়াল। আমি আমার ছামানা নিয়ে ট্রেন থেকে অবতরণ করলাম।

তখন রাত ১১টা। কোথায় যাব ঠিক করতে পারছিলাম না। কিছুক্ষণ ভেবে-চিন্তে এক আবাসিক হোটেলে গিয়ে সিট ভাড়া করে রাত যাপন করলাম।

প্রত্যুষে ঘুম থেকে ওঠে রুমেই নামায আদায় করলাম। তারপর সকাল ৮টা পর্যন্ত রুদ্ধদ্বারে বসে তিলাওয়াত, তাছবীহ-তাহলীল ও

দোয়া করে নাস্তা সেরে বেরিয়ে পড়লাম। শহরে ঘুরে ঘুরে আনোয়ার পাশার সন্ধান করছি। হোটেলে লোকমুখে আনোয়ার পাশার অনেক কথাই শুনলাম। কেউ বলল, আনোয়ার পাশা অমুক শহরে আক্রমণ করে অতগুলো সৈন্য হত্যা করেছে। আবার কেউ বলল, তার বাহিনী খুব কঠোর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। সরকারী ফৌজ পাগল হয়ে তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। কিন্তু তার একজন সদস্যও গ্রেফতার করতে পারেনি। শুধু সাধারণ মানুষকে সন্দেহমূলক গ্রেফতার করছে। আবার কেউ বলল, তার সদস্যরা তো আমাদের আশপাশেই ঘুরাফেরা করে; কিন্তু চেনা যায় না। এ ধরনের কথাবার্তা পুরো শহরের লোকজনের মুখে মুখে।

আনোয়ার পাশার ভয়ে বাতিল শক্তির ঘুম হারাম হয়ে গেছে। আতংক বিরাজ করছে চারদিকে। বিশেষ করে সরকারী-আধা সরকারী অফিস-আদালতে ও সরকারী ভবনগুলোতেই বেশী আতংক। বেশীরভাগ আক্রমণ সরকারী স্থাপনাগুলোতেই হচ্ছে।

সারাদিন ঘুরে ঘুরে আনোয়ার পাশার কোন সন্ধান মেলেনি। ভয়ে কারো নিকট জিজ্ঞেস করার সাহস পাইনি। কার কাছে জিজ্ঞেস করে কোন্ বিপদে পড়ি কে জানে? পরদিন পল্লী এলাকায় বের হয়ে খুঁজতে লাগলাম। তার বাড়ীর ঠিকানা জানা নেই বিধায় যেতে পারছি না। আর বাড়ীতে গেলেও লাভ হবে না, কারণ তিনি তো বাড়ীতে থাকেন না।

পরক্ষনে চিন্তা করে একটি পথ বের করলাম। তাহল, দৈনিকই তো আক্রমণের ঘটনা পত্রিকায় ছাপা হচ্ছে। তাই পত্রিকা পড়ে হয়ত কোন পথ বের করা যাবে। তাই নিয়মিত পত্রিকা পড়তে লাগলাম।

পত্রিকার হেড লাইনেই আনোয়ার পাশার অভিযানের কথা ছাপা হয়। একই দিনে একাধিক আক্রমণ হয়, তাও এক জেলাতে নয়, একেক জেলায়। এবার বুঝতে পারলাম, আনোয়ার পাশার দল একটা নয়। তারা কয়েক দলে বিভক্ত। এক জায়গায় আক্রমণ করে তারা অন্য স্থানে চলে যায়, তাও নিকটে নয়, বহুদূরে। চিন্তা করে দেখি, খুঁজে ঠিকানা বের করা খুবই কঠিন। এভাবে প্রায় একটি সপ্তাহ এখানেই কাটালাম।

এক সপ্তাহ পর চলে গেলাম সমরকন্দে। সেখানে গিয়ে তাসকন্দ, সমরকন্দ ও বুখারা চষে বেড়ালাম। কিন্তু কোথাও তাকে ধরতে পারছি না। এ সমস্ত এলাকায় মসজিদ-মাদ্রাসা এক সময় প্রচুর

ছিল। কিন্তু আজ এসব বিরানভূমিতে পরিণত হয়েছে। উঁচু উঁচু ইমারতগুলে ছাত্র-শিক্ষকের অভাবে যেন নীরবে কাঁদছে। মসজিদগুলো যেন মুসল্লীর বিরহ যাতনায় অশ্রুবর্ষণ করছে। অনেক মসজিদই ক্লাব কিংবা অফিসে রূপান্তর করা হয়েছে। আহ! কি করুণ দৃশ্য! কতইনা বেদনাদায়ক ইতিহাস।

ইমাম বুখারী (রাঃ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসা, যেখানে পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকা থেকে ছুটে আসা নব্বই হাজার ছাত্র অধ্যয়ন করতে, যেখানে আঠার হাজার ছাত্র ছিল শুধু দরসে বুখারীতে। সে মাদ্রাসায় আজ তালা ঝুলছে। ছাহেবে হেদায়া বুরহানউদ্দীন মরগেলানী যেখানে বসে ফেকাহ্ শাস্ত্রের তালিম দিতেন, সেখানে আজ কমিউনিজমের তালিম হচ্ছে। এ হৃদয়বিদারক অবস্থা দেখে চোখের পানিতে বুখে ভেসে যাচ্ছে।

এভাবে বেশ কয়েক দিন ঘুরাফেরা করার পর এক বৃদ্ধ আমাকে কাছে ডেকে স্বস্নেহে নম্রসুরে জিজ্ঞেস করল, বাবা! আজ বেশ ক'দিন যাবত তোমাকে বিষন্নবদনে এখানে ঘোরাফেরা করতে দেখছি। তোমাকে এ এলাকার বাসিন্দা হিসেবে মনে হচ্ছে না। তুমি কি কাজের সন্ধানে এসেছ? নাকি কাউকে খুঁজছ?

মুরুব্বীর কথা শুনে আমি খানিকটা অপ্রস্তুত হয়ে পড়লাম। তাকে কি উত্তর দেব ভেবে পাচ্ছিলাম না। কোন্ উত্তরে কোন মছিবত আসে, তা কে জানে! লোকটি আমার অবস্থা আঁচ করতে পেরে আমাকে অভয় ও সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, বাবা! তুমি আমার সাথে নির্ভয়ে সব বলতে পার, আমার দ্বারা তোমার উপকার না হলেও কোন ক্ষতি হবে না। বুড়ো যে একজন মুসলমান, তা আমার বুঝতে বাকি রইল না।

লোকটির কথায় আশ্বস্ত হয়ে আমি প্রথমে আমার পরিচয় দিয়ে নির্যাতনের কাহিনী শোনালাম। আনোয়ার পাশার ঠিকানা জানতে চাইলাম। আমার অভিপ্রায় কি, তাও জানালাম।

লোকটি এক দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, বাবা! তুমি সত্য কথাই বলেছ এবং তোমার চিন্তাও সঠিক। তবে তুমি আনোয়ার পাশার সাথে হয়ত সাক্ষাৎ করতে পারবে না। আনোয়ার পাশাকে আমি ব্যক্তিগতভাবে চিনি। তিনি একজন পাক্কা ঈমানদার। আলেম দ্বীন

এবং জানবাজ মুজাহিদ। তিনি লোকালয়ের বাইরে থাকেন। তিনি জিহাদের মাধ্যমে খেলাফত প্রতিষ্ঠা করতে চান। তিনি চান নির্যাতন-নিপীড়ন বন্ধ করে মদীনার মতো একটি রাষ্ট্র গঠন করতে, আল্লাহর বিধান কায়েম করতে।

তিনি তার বাহিনী নিয়ে বলসেভিক, লাল ফৌজ ও কমিউনিস্টদের উপর আক্রমণ করে তাদের অনেক ক্ষতিসাধন করেছেন। অনেক থানা, সেনা ছাউনী ও ইউনিট তছনছ করে দিয়েছেন। যেখানে মুসলিম নির্যাতন হচ্ছে, সেখানেই তার বাহিনী অভিযান চালাচ্ছে।

তিনি আরো মন্তব্য করলেন, দেশের সর্বস্তরের মুসলমান বিশেষ করে আলেম সমাজ যদি সহযোগিতা করতেন এবং এ কাজটাকে সমর্থন জানাতেন, তবে বলসেভিক বা কমিউনিজমের পতন ছিল অনিবার্য। ওলামায়ে কেরাম নামায-রোযার ওয়াজ ছাড়া অন্য ওয়াজ করেন না। ছবর আর ধৈর্যধারণের উপদেশ দেন। জিহাদের প্রয়োজনীয়তা, জিহাদের ফজিলত ও শহীদের মর্যাদার কোন ওয়াজ নেই। জিহাদ যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরয আমল, উম্মত তাও জানে না। এর জন্য দায়ী আলেম সমাজ।

লোকটির কথায় বুঝতে পারলাম, তিনি উঁচু মানের আলেম। আমি আরজ করলাম, হুজুর! আনোয়ার পাশার ঘরের সন্ধান যদি আপনার কাছে থাকে, তবে দয়া করে আমাকে ঠিকানাটা দিন। আমি অনেক দূর থেকে খুব কষ্ট করে এসেছি। যেভাবে হোক তার সাথে আমার সাক্ষাৎ করতেই হবে। তিনি বললেন, বাবা! আজ ক'দিন হল তার কোন সংবাদ পাচ্ছি না। বোধ হয় তিনি দেশ ত্যাগ করেছেন। দেশবাসীর অসহযোগিতার কারণে আনোয়ার পাশার অনেক মুজাহিদ শাহাদাতবরণ করেছেন।

আমি বৃদ্ধকে প্রশ্ন করলাম, হুজুর! ওলামায়ে কেরাম ও দেশবাসী তার বিরোধিতা করার কারণ কি? বুড়ো বললেন, জিহাদ করা ফরজ। কেউ যদি জিহাদ না করে, তবে আমাকে একা হলেও এই ফরয আদায় করতে হবে। প্রত্যেকেরই যার যার আমলের জন্য আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। অন্যের ব্যাপারে আমাকে জিজ্ঞেস করা হবে না। আনোয়ার পাশা ফতোয়া দিয়েছেন, জিহাদ প্রত্যেকের উপর ফরযে

আইন। নাস্তিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা সকলের উপর ফরয। তিনি ফতোয়া দিয়ে বসে থাকেননি। তার শাগরেদ, মুরিদ, ভক্তবৃন্দ ও বন্ধু-বান্ধবদের প্রশিক্ষণ দিয়ে জিহাদ আরম্ভ করেছেন।

আনোয়ার পাশা তিনটি মিশন নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন– ক) দাওয়াত, খ) তরবিয়াত ও গ) জিহাদ। অর্থাৎ একদল প্রত্যেক মসজিদ-মাদ্রাসায়, পাড়ায় মহল্লায় ঘুরে জিহাদের দাওয়াত দিচ্ছেন। তার দাওয়াতে মাদ্রাসার ছাত্র ও যুবকরা দলে দলে আসতে লাগল। দ্বিতীয় পর্যায়ে তাদেরকে যুদ্ধের প্রশিক্ষণ দিয়ে আদর্শ সৈনিক হিসেবে গঠন করছে। তৃতীয় পর্যায়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুজাহিদদের নিয়ে যুদ্ধ করেন।

যেখানে মুসলমানদের উপর নির্যাতন হচ্ছে বা মসজিদে-মাদ্রাসার উপর আক্রমণ আসছে, সেখানেই আনোয়ার পাশা তার মুজাহিদদেরকে নিয়ে দুশমনের উপর অতর্কিতে, গেরিলা পদ্ধতিতে আক্রমণ করে চরম ক্ষতিসাধন করছেন। লাল ফৌজ দিশেহারা হয়ে ঐ এলাকার ইমাম, মুয়াজ্জিন, আলেম-ওলামাদেরকে পাইকারীহারে গ্রেফতার করে, নির্বিচারে শহীদ করে দিচ্ছে। আনোয়ার পাশা বা তার অনুসারীদের খুঁজে পায় না। যে সমস্ত আলেম নিজেরা জিহাদ করেন না, তারা অন্যেরা করুক, তাও চান না। তাদের সামনে তাদের যুবতী মেয়েকে ধর্ষণ করছে, বোনের ইজ্জত হরণ করছে, তবুও তাদের দেলে প্রতিশোধের আগুন প্রজ্বলিত হচ্ছে না। তাদের মুখে শুধু ছবরের ওয়াজ। এসব কারণে আলেমগণ আনোয়ার পাশার বিরুদ্ধে ফতোয়া প্রদান করছে। এসব আলোচনার পর বৃদ্ধ আনোয়ার পাশার বাড়ীর একটি ঠিকানা আমাকে দিলেন।

[ঊনত্রিশ]

আনোয়ার পাশার বিরুদ্ধে ওলামা কেরামের ফতোয়া নিম্নরূপ-
"প্রিয় দেশবাসী!

আনোয়ার পাশা জিহাদের নামে সারাদেশে মারামারি, কাটাকাটি, খুনাখুনি করছে। এতে দেশের শান্তি ও স্থিতিশীলতা বিনষ্ট হচ্ছে। এগুলো দমন করতে গিয়ে আমাদের সরকার নিরীহ মানুষের উপর চাপ সৃষ্টি করছে। আনোয়ার পাশা যদি এ ধরনের সন্ত্রাসী কার্যকলাপে লিপ্ত

না থাকত, তাহলে নিরীহ মানুষের উপর এ ধরনের জুলুম-নির্যাতন নেমে আসত না। তারা শান্তিতে থাকতে পারত।

আমরা আযান দিতে ও জামাতে নামায পড়তে না পারলেও তো ঘরে নামায পড়তে পারি। এতে তো কেউ বাধা দেয় না। আর দেশের সরকারের বিরোধিতা করা শরীয়তে জায়েয নয়। যারা প্রশাসনের বিরোধিতা করে, তাদেরকে শরীয়তের পরিভাষায় 'বাগী' বলা হয়। আর বাগীর শাস্তি হল মৃত্যুদণ্ড।

অতএব, আনোয়ার পাশাকে অথবা তার অনুসারীদেরকে ধরে হুকুমতের হাতে তুলে দেয়া ফরয। তাদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা না করা, আশ্রয় না দেয়া, পথ না দেখানোর জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান হচ্ছে। তাদেরকে যেখানে পান ধরিয়ে দিয়ে দেশকে বাঁচান এবং ঈমানী দায়িত্ব পালন করুন।

নিবেদক
ওলামা পরিষদ
বুখারা।"

উক্ত ফতোয়াটি পোস্টার আকারে বড় বড় অক্ষরে ছাপিয়ে মসজিদ-মাদ্রাসা, স্কুল-কলেজ, রাস্তায় রাস্তায়, দেয়ালে দেয়ালে, মোড়ে মোড়ে, হোটেল-রেস্তোরাঁয়, গাড়ীতে গাড়ীতে, বাড়ীতে বাড়ীতে লাগিয়ে দিল। দৈনিক, মাসিক ও পাক্ষিক পত্রপত্রিকায় ছাপিয়ে প্রচার করতে লাগল। ওলামায়ে কেরাম মিম্বরে বসে, ওয়াজ মাহফিলে, সভা-সমিতিতে জিহাদের বিরুদ্ধে জনগণকে বোঝাতে আরম্ভ করল।

বলসেভিকরা ওলামাগণের ফতোয়া নিয়ে সর্বস্তরে বিলি বন্টন করতে লাগল। ওলামাদের প্রচারণার যাবতীয় খরচ বলসেভিকরা বহন করতে লাগল। ফলে জনগণ আস্তে আস্তে জিহাদ বিদ্বেষী মনোভাব পোষণ করতে আরম্ভ করল।

আনোয়ার পাশার জিহাদী কার্যক্রম বন্ধ করার জন্য যে সমস্ত দল-উপদল বা প্রতিষ্ঠান কাজ করেছে, তাদের মধ্যে ওলামায়ে কেরামের ভূমিকা ছিল মুখ্য।

১৯১৭ইং সালের অক্টোবর মাসে রাশিয়ার কমিউনিস্টদের বিপ্লবের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন মিস্টার লেনিন। তিনি তার চিন্তা-চেতনা ও

মেধা খরচ করে একটি অর্থনীতি প্রণয়ন করেন। উক্ত অর্থনীতি গ্রহণ করার জন্য তিনি যেভাবে কাজ করেছেন, তার বিবরণ নিম্নরূপ—

শ্রমিক ইউনিয়ন

মিল, ফ্যাক্টরি ও কলকারখানার শ্রমিকদের জড়ো করে বোঝাতে লাগলেন যে, অল্প মূল্যে শ্রমিকদের শ্রম দিয়ে মিল মালিকরা বড়লোক হচ্ছে। শ্রমের ন্যায্য মূল্য শ্রমিকরা পাচ্ছে না। লভ্যাংশ যদি সঠিকভাবে বন্টন হত, তবে শ্রমিক আর মালিকদের মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান থাকত না। শ্রমিকদের শ্রমে মালিকগণ গাড়ী-বাড়ীর মালিক হচ্ছে আর শ্রমিকরা শ্রমিকই রয়ে যাচ্ছে। ফলে ধনী-গরীবের সংঘাত থেকেই যাচ্ছে। কাজেই, আপনারা শ্রমিক ইউনিয়নে ভর্তি হয়ে আন্দোলন চালিয়ে যান। এভাবে শ্রমিকগণ সংঘবদ্ধ হল।

কৃষক ইউনিয়ন

গ্রামে গ্রামে ঘুরে কৃষকদেরকে সমবেত করে বুঝাতে লাগল, হে আমার চাষী ভায়েরা! আপনারা দেশের গুরুত্বপূর্ণ নাগরিক। আপনারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সোনালী ফসল উৎপাদন করেন, অথচ কৃষি পণ্যের ন্যায্য মূল্য পাচ্ছেন না। ধনীরা আপনাদের জমির ফসল খেয়ে গাড়ী-বাড়ীর মালিক হচ্ছে, আর আপনাদের ভাগ্যে জুটছে বাসী পান্তা। হে আমার কৃষক ভায়েরা! আপনারা অন্যান্য ফসলের পাশাপাশি তুলার চাষও করুন। আমরা ট্রাক্টর, স্প্রে মেশিন, কিটনাশক ওষুধ, সার ও সেচ-এর ব্যবস্থা করব। আপনারা ফসল কেটে এসব ঋণ পরিশোধ করবেন। এভাবে কৃষকদেরকে সমিতিভুক্ত করলেন। কৃষকরা সমিতিভুক্ত হয়ে কৃষি ঋণ নিয়ে তুলা চাষ করে অনেক উন্নতি করতে লাগল।

বণিক ইউনিয়ন

হাট-বাজারে গিয়ে ব্যবসায়ীদেরকে বোঝালেন, হে আমার ব্যবসায়ী ভায়েরা! আপনারা প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সরবরাহ করে সমাজের চাহিদা পূরণ করেন। কিন্তু আপনাদেরকে সামান্য লাভে পণ্য বিক্রয় করতে হয়। তাই প্রচুর মাল আমদানি করে অল্প লাভে বিক্রি করলেও সুখে থাকতে পারবেন। কাজেই আপনারা সমিতিভুক্ত হয়ে আমাদের থেকে ঋণ নিয়ে ব্যবসা করুন, মাল বিক্রি করে ঋণ পরিশোধ

করবেন। এভাবে ব্যবসায়ীদের মধ্যে কাজ আরম্ভ করেন।

ঠিক এমনিভাবে কর্মকার, স্বর্ণকার, চর্মকার, ছুতার, জেলে, কুমার ও তাঁতীদেরকে যার যার ব্যবসার লোভ দেখিয়ে সমিতিভুক্ত করে ঋণ দিতে লাগল। তাদের মধ্যেও ধনী-গরীবের শ্রেণীবৈষম্য বুঝিয়ে কমিউনিস্ট মনোভাব সৃষ্টি করতে লাগল।

মহিলা সমবায় সমিতি

গরীব, অশিক্ষিত ও মধ্যবিত্ত মহিলাদেরকে সমিতিভুক্ত করার জন্য, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মহিলারা বোরকা পরে, পর্দানশীল লেবাস ধরে গ্রামে গ্রামে বাড়ি বাড়ি গিয়ে বোঝাতে লাগল, হে আমার পর্দানশীল মা ও বোনেরা! উন্নয়নশীল দেশগুলোতে পুরুষের পাশাপাশি মহিলারাও কাজ করে স্বাবলম্বী হচ্ছে। আজ নারী সমাজ এতই অবহেলিত ও বঞ্চিত যে, তারা পুরুষের দিকে হা করে তাকিয়ে থাকতে হয়। পুরুষরা আপনাদের সাথে দাসীর ন্যায় ব্যবহার করে। তাই আসুন, আমরা আমাদের অধিকার আদায় করে নেই। আপনারা পর্দায় থেকে অনেক কাজ করতে পারেন। যেমন তুলার গুদামে গিয়ে তুলা থেকে আঁটি ছাড়ান ইত্যাদি। এভাবে লেনিন মহিলাদেরকে সমিতিভুক্ত করে কাজ আরম্ভ করলেন।

মহিলা ক্লাব নির্মাণ

জায়গায় জায়গায় জমি ক্রয় করে সুন্দর বিল্ডিং নির্মাণ করল। বাউন্ডারি ওয়াল টেনে পর্দার ব্যবস্থা করল। ভেতরে পাঠাগার, নামাযখানা ও অযু-এস্তেঞ্জার ব্যবস্থা করল। বিরাট এলাকা নিয়ে ফুল বাগান রচনা করা হল। তাছাড়া ছায়াদারা বৃক্ষ ও বসার ব্যবস্থা করে ভূস্বর্গ তৈরি করা হল। পাঠাগারে ধর্মীয় বই-পুস্তকের পাশাপাশি গান, নাটক, নভেল ও বিভিন্ন দেশের নগ্ন ছায়াছবি রাখা হল। তাছাড়া টিভি, ভিসিআর-দেখার জন্য খুব সুন্দর কক্ষ তৈরি করা হল।

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মহিলারা শিক্ষিত মহিলাদেরকে দাওয়াত দিতে লাগল। প্রথমত এরা বলত, আমরা মুসলমান, পর্দায় থাকি, ক্লাবে যাব না। এদেরকে সুকৌশলে বুঝাল যে, সেখানে কোন পুরুষ লোক নেই। ধর্মীয় কিতাবাদী পাঠ করবেন। তাছাড়া নামাযের ব্যবস্থা ছাড়াও আরো অনেক সুবিধাদি রয়েছে। এভাবে তাদেরকে ক্লাবমুখী করতে লাগল। এসব মহিলা আস্তে আস্তে বেহায়াপনা ও বেলেল্লাপনার দিকে কখন যে

চলে গেল, তা তারা টেরও পেল না।

শিক্ষিত মহিলারা বোরকা পরে বিকেলে ক্লাবে যায়। বই-পুস্তক পড়ে। মাঝে-মধ্যে ধর্মীয় পুস্তক, ছড়া, ম্যাগাজিন, উলঙ্গ ছবি প্রদর্শন করে। কোন কোন সময় টিভি রুমে নোংরা ছবি দেখে।

এ আগন্তুকদের আপ্যায়নের জন্য সুন্দরী মেয়ে রয়েছে। একটু পরপর সুস্বাদু শরবত, চকলেট, চানাচুর, কলা, বিস্কুট, আচারসহ বিভিন্ন ফলমূল দেয়া হয়। এভাবেই ঐসব মহিলা ঈমান বিক্রি করছে। তখন আর ভাড়াটিয়া ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মহিলাদের আর বাড়ী বাড়ী যেতে হল না। যারা একবার ক্লাবে এসেছে, তারাই পরবর্তীতে অন্যদের দাওয়াত দিয়ে ক্লাবে আনতে লাগল।

এ সমস্ত মহিলাদেরকে বেপর্দা করে দেশ ভ্রমণের দাওয়াত দেয়। প্রথমে তারা দাওয়াত কবুল করেনি। তারপর বুঝান হল যে, আপনাদেরকে যে গাড়ীতে নেয়া হবে, সে গাড়ীতে কোন পুরুষ লোক থাকবে না। ড্রাইভার পর্যন্ত মহিলা। অযু-গোসল, নামাযের কোন অসুবিধা হবে না। একদিন দু'দিন দাওয়াত দিতে দিতে কিছু মহিলাদেরকে রাজি করা গেল। তারপর তাদেরকে নিয়ে গেল প্যারিসে।

প্যারিস পৃথিবীর এক সুন্দর নগরী। সেখানে নারী-পুরুষে কোন ভেদাভেদ নেই। চেনা-অচেনা, আপন-পর কোন পার্থক্য নেই। একে অপরের সাথে যে কোন ব্যবহার করতে পারে। কেউ শার্ট-প্যান্ট, কেউ হাফপ্যান্ট অর্থাৎ যে যা ইচ্ছে তাই পরে। নারী-পুরুষ সবই এক ধরনের। এসব অবস্থা স্বচক্ষে দেখে তাদের অন্তরে খেয়াল জন্মাল যে, এরাও তো মানুষ আর আমরাও মানুষ। কিন্তু এরা কত স্বাধীনভাবে চলাফেরা করে। আহ! কত আনন্দ! আর আমরা ঘরের কোণে বসে বসে জীবন ক্ষয় করছি।

এ সমস্ত মহিলা নিজ দেশে ফিরে এসে অন্য মহিলাদেরকে বুঝাতে লাগল। এভাবে অন্য মহিলাদেরকেও পরপর ভ্রমণ করিয়ে আনা হল। তারপর এসব মহিলারাই বোরকা জ্বালিয়ে রাজপথে মিছিল করে শ্লোগান দিয়েছিল– 'বোরকার কালো আবরণে আমরা আর থাকব না, থাকব না'।

বুখারা তরুণ সংঘ

বেকার যুবকদেরকে কাজ দেয়ার নামে তরুণ সংঘে সংঘবদ্ধ করা হল। নিরক্ষরতা দূরীকরণের নামে গ্রামে গ্রামে স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হল।

দিনে দু'তিন ঘন্টা করে বালক-বালিকাদের এবং রাতে দু'তিন ঘন্টা করে বয়স্ক পুরুষ-মহিলাদেরকে অক্ষরজ্ঞান দিতে লাগল। ফলে মসজিদে যে সূরা-ক্বেরাত ও মাছলার তালিম চলত, তা আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে গেল। সকালে মক্তবে বাচ্চারা কায়দা-কুরআন শরীফ পড়ত, তাও বন্ধ হয়ে গেল। এদিকে সরকারী প্রাইমারী স্কুলগুলোতে ব্যাপক ছাত্রশূন্যতা দেখা দিল। এসব শিক্ষার পাশাপাশি সমাজতন্ত্রের ছবকও শিক্ষা দেয়া হত।

ভ্রাম্যমান শিক্ষা

হাটে-বাজারে, শহরে-বন্দরে, অলিতে-গলিতে এবং রাস্তার মোড়ে মোড়ে বড় বড় ব্লাকবোর্ড ঝুলিয়ে গান-বাজনার মাধ্যমে নর্তকী নাচিয়ে লোক জড়ো করত। তাছাড়া পথিকদের মাঝে বিড়ি, সিগারেট, চকলেট, বিস্কুট ছিটিয়ে লোক জমিয়ে কমিউনিজম সম্পর্কে তালিম দিত। ব্লাকবোর্ড চক দিয়ে আঁকিয়ে ধনী-গরীবদের বাড়ী ও জায়গা জমি অংকন করে শ্রেণী বৈষম্য বুঝাত।

হিলফুল ফুজুল

হিলফুল ফুজুল নামে সংগঠন করে ইমাম-মোয়াজ্জিন ও আলেম-ওলামাদেরকে সংঘবদ্ধ করে তাদের মাধ্যমে কিছু কিছু জনকল্যাণমূলক কাজ করিয়ে হাত করে নেয়। তাদের পেছনে প্রচুর অর্থ খরচ করতে লাগল। রাস্তার পাশে আম, জাম, কাঁঠাল, নারিকেল, সুপারী গাছ না লাগিয়ে তুত গাছ লাগাল। যে গাছের ফুল নেই, ফল নেই, ছায়া নেই কাঠের কোন মূল্য নেই, সৌন্দর্য নেই। এসব গাছ ইমাম সাহেবদের দ্বারা রোপণ করাল। ইমাম সাহেবরাই এসব গাছের পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণ করত। প্রশিক্ষণের নামে ভাতা দিয়ে দিয়ে দিয়ে পঁয়তাল্লিশ দিন প্রশিক্ষণ করাত। এতে সমাজতন্ত্রের ছবকও পড়ান হত।

এ ছাড়াও আরবী নামে অনেক সমিতি করে আলেমদের দ্বারা পরিচালনা করাত। এভাবে আলেমদেরকে হাত করে নেয়। বলসেভিকরা প্রথমে আলেম-ওলামা, পীর-মাশায়েখ, মসজিদ-মাদ্রাসা, কিতাব-কুরআন, টুপি-দাড়ি, নামায-রোযা, ঈমান-আকিদার উপর কোন আঘাত করেনি।

যখন সর্বস্তরের জনগণ সমাজতন্ত্রের উপর ঐক্যবদ্ধ হল, তখন আস্তে আস্তে বুঝাতে লাগল, তোমরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কাজ কর,

আর আলেম-ওলামারা মসজিদে বসে বসে খায় আর বেহেশত-দোযখের ওয়াজ করে। দুনিয়াতে থাকতে হলে সকলের সমান কাজ করতে হবে। তোমরা হাদিয়া-তোহফা বন্ধ করে দাও। এদেরকে মসজিদ-মাদ্রাসা থেকে টেনে বের কর।

মহিলাদেরকে বুঝানো হল যে, একমাত্র আলেমরাই বেহেস্তের আর দোযখের কথা বলে তোমাদেরকে ঘরের কোণে আটকিয়ে রেখেছে। তোমরাও তো ছিলে পুরুষের মত স্বাধীন। একমাত্র আলেম সমাজই প্রগতির পথ রুদ্ধ করে দিয়েছে। এরাই ফতোয়া নামক ধোঁয়া তুলে মানবাধিকার লংঘন করছে। এরাই পুরুষদেরকে তোমাদের বিরুদ্ধে ধর্মের কাহিনী শুনিয়ে ক্ষেপিয়ে তুলছে। তাদের মত জঘন্য ফতোয়া দিয়ে নারী সমাজের কলংক ডেকে এনেছে।

অতএব, তোমরা পুরুষ ও আলেমদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে তোমাদের অধিকার আদায় কর। এভাবে নারীদেরকে স্বামী বিদ্বেষী ও ওলামা বিদ্বেষী করে তুলল।

ওলামা হকের ভূমিকা

বলসেভিকরা যখন সরাসরি দ্বীনের উপর আঘাত হানতে আরম্ভ করল, তখন ওলামায়ে কেরাম বলসেভিকদের বিরুদ্ধে অর্থাৎ ঈমান বিধ্বংসী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে জনগণকে বুঝাতে লাগলেন। মসজিদে মসজিদে খানকায় খানকায় ওয়াজ-নছিহতের মাধ্যমে বলসেভিকদের কূটকৌশলের কথা জানাতে লাগলেন। বই-পুস্তক রচনা করে পোস্টার, বিজ্ঞাপন, এশতেহার ছাপিয়ে বিলি করতে লাগলেন। এ প্রচারাভিযানে কিছু মানুষ বলসেভিকদের ফন্দি ও মতলতবাজী বুঝতে সক্ষম হয়। তবে তাদের সংখ্যা নেহায়েত নগণ্য।

ওলামায়ে ছু'দের ভূমিকা

ওলামায়ে ছু বলতে পথভ্রষ্ট আলেমদের বুঝায়। ওলামা ছু অর্থাৎ নামধারী ও বাতেল আলেমরা বলসেভিকদের থেকে লাখ লাখ টাকা খেয়ে ওলামায়ে হকের বিরোধিতা করতে লাগল। কমিউনিজমের ছত্রছায়া ও মদদে এরা জনগণকে বুঝাতে লাগল, বলসেভিকরা এনজিও খুলে মুক্ত হস্তে আমাদেরকে ঋণ দান করে সহায়তা করছে। ব্যবসা, বাণিজ্য বা কৃষি কাজে খরচ করে আমরা লাভবান হচ্ছি। পশুপালন,

হাঁস-মুরগীর খামার, মৎস্য চাষ ও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচীতে আমরা প্রচুর অর্থ পাচ্ছি। এ কর্মকাণ্ড আমাদের জীবনে ও রাষ্ট্রীয় জীবনে মহাশান্তি বয়ে আনবে। লেনিনের মতবাদ ইসলামবিরোধী নয়। লেনিনের থিউরী আর হযরত আবুজর গিফারী (রাঃ)-এর থিওরি অভিন্ন। কাজেই যে সমস্ত আলেম কমিউনিস্ট বিপ্লবের বিরোধিতা করবে, তাদেরকে মসজিদ-মাদ্রাসা থেকে বহিষ্কার করুন। দু'দল আলেমের পরস্পর বিরোধী বক্তব্যে জনগণ বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল।

সংবাদপত্রের ভূমিকা

বলসেভিকদের মদদে নতুন নতুন অনেক পত্রিকা রাতারাতি ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠল। দৈনিক, পাক্ষিক ও মাসিক পত্রিকাগুলো একচেটিয়াভাবে মৌলবাদ ও রুহানীদের বিরুদ্ধে লেখালেখি আরম্ভ করল। আলেমদের নামে মিথ্যা, কাল্পনিক ও বানোয়াট কাহিনী লিখে জনসাধারণকে ওলামা ও দ্বীন বিদ্বেষী করে তুলল।

ওলামায়ে হকদের কোন দৈনিক পত্রিকা না থাকায় তারা সত্য কথাগুলো দেশবাসীর নিকট তুলে ধরতে ব্যর্থ হল। ফলে জনগণ আস্তে আস্তে দ্বীন বিদ্বেষী হতে লাগল।

তুর্কী বীর আনোয়ার পাশার ভূমিকা

জাতির এ ক্রান্তিলগ্নে আনোয়ার পাশা চিন্তা করলেন, দেশ, জাতি ও দ্বীনকে রক্ষা করতে হলে জিহাদের বিকল্প নেই। অন্য কোন তন্ত্রমন্ত্র, ঝাড়-ফুঁক, দোয়া, কালাম, খতম আর মিছিল, মিটিং দ্বারা দ্বীনের বিজয় ছিনিয়ে আনা সম্ভব নয়। তাই তিনি ওলামায়ে কেরাম ও পীর-মাশায়েখ ও মুফতীদের নিকটে গিয়ে তার চিন্তাধারা ব্যক্ত করতে লাগলেন। পবিত্র কুরআনের ৬৮০ আয়াত ও অসংখ্য হাদীস উপস্তাপন করলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অধিকাংশ আলেমই জিহাদের পক্ষে কোন কথা বলেননি। যখন এক শ্রেণীর ওলামায়ে কেরাম থেকে নিয়মিত তিরস্কার আসতে লাগল, তখন অন্য কোন পন্থা না পেয়ে নিজেই 'জিহাদ ফরযে আইনে'র ফতোয়া জারি করলেন এবং তিনটি মিশনে জিহাদী কার্যক্রম আরম্ভ করলেন। দাওয়াত, তরবিয়ত ও জিহাদ।

ওলামায়ে হক বলসেভিকদের বিরোধিতা করার কারণে অনেককেই শহীদ করে দেয়া হল। বাকিরা মুখ থুবড়ে বলসেভিকদের

দাসত্ব মেনে নিল। পীর-মাশায়েখগণও নীরব ভূমিকা পালন করে চলছেন। কিন্তু আনোয়ার পাশা কোন হুমকিতে দমে যাননি। তিনি নিয়মিত জিহাদী প্রোগ্রাম অর্থাৎ অপারেশন চালিয়ে যাচ্ছেন। আনোয়ার পাশার অভিযানে বহু কমিউনিস্ট সৈন্য প্রাণ হারাল। তিনি অনেক কমিউনিস্ট নেতা ও জালেমদেরকে হত্যা করলেন। কোন বাহিনী আনোয়ার পাশার আক্রমণ ঠেকাতে পারেনি। প্রত্যেক সেনাবাহিনী, থানা ও পুলিশ ফাঁড়িগুলোতে আতংক ছড়িয়ে পড়ল। সেনাবাহিনী ও পুলিশ বাহিনীর ঘুম হারাম হয়ে গেল। আনোয়ার পাশার আক্রমণ প্রতিহত করতে না পেরে জালেমরা ক্ষোভে নিরীহ জনগণ ও ওলামায়ে কেরামের উপর অকথ্য নির্যাতন আরম্ভ করে দিল।

এমতাবস্থায় শীর্ষস্থানীয় আলেমগণ একত্রিত হয়ে পরামর্শ করলেন, আনোয়ার পাশার জিহাদী তৎপরতার কারণে সাধারণ মুসলমান ও ওলামায়ে কেরামের উপর বলসেভিকদের নির্যাতন বেড়ে চলছে। কাজেই আমাদের যেহেতু জিহাদ করার মত ঈমান, সাহস, শক্তি ও অস্ত্র নেই, সেহেতু বিশাল শক্তির সাথে লড়াই করা সম্ভব নয়। তাই জিহাদ না করে আমরা যদি কমিউনিস্টদের সাথে একাত্ম হয়ে যাই, তাহলে জুলুম থেকে রেহাই পাওয়া যাবে।

আবার কোন কোন আলেম এটাও বলেছেন, আনোয়ার পাশা জিহাদের ফতোয়া চেয়ে বড় বড় আলেমদের নিকট গিয়েছিলেন, কিন্তু কেউ সে ফতোয়ায় দস্তখত করেননি, বরং ধমকিয়ে দিয়েছেন। তারপরও তিনি ওলামাদেরকে পাশ কেটে নিজেই মুফতি সেজে জিহাদের ফতোয়া দিয়েছেন এবং যুবকদেরকে নিয়ে জিহাদে অবতীর্ণ হয়েছেন। কাজেই, তার বিরুদ্ধে অর্থাৎ জিহাদের বিরুদ্ধে ফতোয়া দিয়ে তার কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়া দরকার। অন্যথায় চরম খেসারত দিতে হবে।

নগন্যসংখ্যাক আলিমের একটি দল বললেন, আনোয়ার পাশার ফতোয়ায় দস্তখত না করা ঈমানের দাবী নয়। বর্তমানে বলসেভিকদের বিরুদ্ধে লড়াই করা তো কুরআন-সুন্নাহর আলোকেই ফরযে আইন। তিনি তো আল্লাহর বিধান মেনে চলছেন। আর আমরা নিজেরা জিহাদ না করে গুনাহে কবিরায় লিপ্ত আছি আবার জিহাদের বিরোধিতা করছি। এটা পরিষ্কার কুফরী। এসব তথ্য বৃদ্ধের নিকট থেকে পেলাম।

[ত্রিশ]

আমি আনোয়ার পাশার বাড়ীর ঠিকানা নিয়ে সমরকন্দ থেকে তুর্কমেনিস্তানের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। বহু দূরের পথ। চারদিক শুধু যুদ্ধ আর যুদ্ধ। এর মধ্যদিয়ে তুর্কমেনিস্তান যাওয়া সহজ ব্যাপার নয়। তবুও যেতে হবে। আমাকে আনোয়ার পাশার মুজাহিদ বাহিনীতে যোগ দিতেই হবে। জিহাদের মাধ্যমে মুসলমানদের মুক্তি ছিনিয়ে আনতে হবে। তাই সমস্ত ভয়ভীতি ঝেড়ে ফেলে দিয়ে স্টেশনে গিয়ে টিকিট কিনে প্লাটফরমে ট্রেনের অপেক্ষায় বসে রইলাম। এসময় চলছিল তুমুল চেক। এমন কোন লোক নেই, যাকে চেক করা হচ্ছে না। আমিও তা থেকে রেহাই পেলাম না। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর গাড়ীটি স্টেশনে এসে দাঁড়াল। টিকিটের মেয়াদ যাদের শেষ, তাড়া দ্রুত নামতে লাগল। আর অন্য যাত্রীরা ট্রেনে উঠার জন্য হুড়াহুড়ি আরম্ভ করল। আমিও অনেকটা হুড়াহুড়ির মধ্যদিয়ে ট্রেনে উঠে বসলাম। গাড়ী উল্কাবেগে পাগলের মত ছুটে চলছে। কত মাঠ-ঘাট বন-বাদার পেরিয়ে তিন দিনে ট্রেনটি তুর্কমেনিস্তানের রাজধানীতে এসে দাঁড়াল।

বিকেল ৪টা বাজার আগেই আনোয়ার পাশার গ্রামে পৌঁছতে পারলে খুবই ভাল হয়। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও বাহনের ব্যবস্থা করতে পারিনি। সন্ধ্যার আগমনবার্তা প্রকৃতিতে বিরাজ করছে। এ অল্প সময়ে এতদূর পথ যাওয়া সম্ভব নয়। তাই শহরের একটি মাদ্রাসায় রাত যাপন করার নিয়ত করলাম।

আমি পূর্বেই জানতাম, আমার আব্বার একান্ত বন্ধু আল্লামা ইউসুফ দায়েমী তুর্কমেনিস্তানের ঐতিহ্যবাহী বিদ্যাপীঠ জামিয়া আরাবিয়ার মহাপরিচালকদের দায়িত্ব পালন করতেন। তাই একটি রিকশা নিয়ে জামিয়ায় চলে গেলাম।

দ্বাররক্ষী আমাকে দেখে খুব ভদ্র ভাষায় জিজ্ঞেস করলেন, স্যার, কার নিকট এসেছেন? কাকে চান?

আমি উত্তর দিলাম, আল্লামা ইউসুফ দায়েমী সাহেবকে।

দ্বাররক্ষী আশ্চর্য হয়ে আবার প্রশ্ন করলেন, আপনারা দায়েমীর খবর আমাকে কেন জিজ্ঞেস করছেন? তা তো আপনারাই ভাল জানেন। আমাদের দায়িত্ব ছিল তাকে ধরিয়ে দেয়া, আমরা তা করেছি এবং

আপনাদের হাতে তুলে দিয়েছি। তাহলে কি দায়েমী আপনাদের হাত থেকে পলায়ন করেছে? আহা! আবার কোন মছিবতে নাকি গ্রেফতার হতে হয়।

দ্বাররক্ষীর কথাগুলো আমাকে ভাবিয়ে তুলল। একটু চিন্তা করে বুঝতে পারলাম, সে আমাকে একজন কমিউনিস্ট হিসেবে মনে করেছে। আর কমিউনিস্ট হিসেবে মনে করা তার অন্যায় নয়। কারণ, পোশাক-পরিচ্ছদ ও কাস্তে-হাতুড়ি স্টিকার কমিউনিস্টদের আলামতই বহন করে। তারা ইউসুফ দায়েমীকে ধরে কমিউনিস্টদের হাতে তুলে দিয়েছে হত্যার জন্য, আমার তা বুঝতে আর বাকি রইল না।

আমি বুদ্ধি করে বললাম, ভাই! আমি বহুদূর থেকে এসেছি, শুনেছি তিনি নাকি রাষ্ট্রদ্রোহী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত। তাই খোঁজ নিতে এসেছি। আমার কথা শেষ হতে না হতে দ্বাররক্ষী বললেন, হ্যাঁ তিনি আনোয়ার পাশার একজন কমান্ডার। তার নেতৃত্বে বেশক'টি অভিযান পরিচালিত হয়েছে, এতে শত শত লাল ফৌজ নিহত হয়েছে। তিনি জাহেরীভাবে মাদ্রাসার কাজ করতেন আর গোপনে গোপনে ছিলেন মুজাহিদদের একজন চর ও আনোয়ার পাশার কমান্ডার। সরকারী ঘোষণার পর মাদ্রাসার কিছুসংখ্যক ওস্তাদ ও ছাত্ররা মিলে অনেক কৌশলে তাকে ধরে লাল ফৌজের কাছে সোপর্দ করেছে। সরকারী ঘোষণা মোতাবেক আমাদেরকে প্রচুর অর্থ পুরস্কার দেয়া হয়েছে।

দ্বাররক্ষী থেকে মোটামুটি অবস্থা জেনে দপ্তরে গিয়ে বসলাম। দপ্তরে তিন-চারজন হুজুর পেপার পড়ছিলেন। পেপারের হেড লাইনে বড় বড় অক্ষরে লিখা 'লাল ফৌজের সাড়াশি আক্রমণে বোখারার পতন'। এ সংবাদে হুজুররা খুশি হয়ে মিষ্টি বিতরণ করলেন।

আমি পেপারটি হাতে নিয়ে দেখলাম, গভীর রাতে বলসেভিকরা হাজার হাজার সৈন্য, বিপুল অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ নিয়ে দু'দিক থেকে আক্রমণ করে। একদল ট্রেনে চড়ে আর অপর দল পদাতিক বাহিনী। সন্ধ্যা থেকে গোলাবর্ষণ আরম্ভ করে। তারা বোখারার শহর রক্ষা দেয়াল ভেদ করে ভেতরে প্রবেশ করতে পারেনি। শহররক্ষা দেয়াল ছিল প্রায় ৭০ ফুট উঁচু আর চওড়া এত যে, ৭টি ঘোড়া পাশাপাশি হয়ে দেয়ালের উপড় দিয়ে দৌড়াতে পারত। প্রাচীন আমলের এ মজবুত দেয়াল ভেদ

করে ভেতরে ঢোকা ছিল অসম্ভব। তাই সৈন্যরা পরামর্শ করে সারিবদ্ধভাবে কামান বসিয়ে একই স্থানে গোলা নিক্ষেপ করতে লাগল। এমনিভাবে সারারাত একই জায়গায় গোলাবর্ষণ করতে করতে ফজরের আগ মুহূর্তে দেয়ালটি ফেটে যায়। সৈন্যরা হাল্কা অস্ত্র নিয়ে ভেতরে ঢুকতে থাকে। শহরের ভেতরের মুসলমানরা প্রতিরোধ করার চেষ্টা করলে হাজার হাজার সৈন্য নিহত হয়। মুসলমানদের সামান্য গোলা-বারুদ অল্প সময়ে শেষ হয়ে গেলে মহিলারা সৈন্যদের উপর দোতলা-তিনতলা থেকে গরম পানি নিক্ষেপ করে। আবার কোন কোন মহিলা মরিচের গুড়া ও মরিচ-মিশ্রিত পানি নিক্ষেপ করে অনেক ফৌজের ক্ষতিসাধন করল। মুসলমানরা আস্তে আস্তে দুর্বল হয়ে পড়লে বলসেভিকরা পুরো শহরের নিয়ন্ত্রণ হাতে নেয়। তাছাড়া কতিপয় গাদ্দার মুসলমানের সহযোগিতায় অনেক আগেই দেশের প্রায় সবগুলো স্থানই ওদের দখলে চলে যায়।

এ করুণ ও মর্মান্তিক সংবাদে আমি খুবই ব্যথিত হলাম। আমার চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগল। অনেক কষ্টে কান্না নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করলাম। কারণ, বোখারার পতনে যেখানে মিষ্টি খাওয়া হচ্ছে, সেখানে আমার কান্না প্রকাশ পেলে আর রক্ষা নেই।

একজন হুজুর আমার পরিচয় জানতে চাইলে আমি নিজেকে মুসলমান হিসেবে পরিচয় দিলাম। এর মধ্যে নামাযের সময় হয়ে এল। হুজুরগণ নামাযের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। আমিও তাদের সাথে নামায আদায় করলাম।

নামায সমাপ্ত করে একজন হুজুরের নিকট আনোয়ার পাশার ব্যাপারে জানতে চাইলে তিনি বললেন, বাবা! আনোয়ার পাশা একজন পরহেজগার, মুত্তাকি, খোদাভীরু ও দয়ালু ব্যক্তি তা আমরা মানি, কিন্তু সে ও তার অনুসারীরা যে সর্বনাশা কর্মকাণ্ডে লিপ্ত, তা আমরা মেনে নিতে পারি না বা সমর্থন করি না।

আমি বললাম, হুজুর! আমার বেয়াদবী মাফ করবেন। আমি শুনেছি জিহাদ আল্লাহর হুকুম। জিহাদ করা ফরয। যারা জিহাদ করে না বা জিহাদের বিরোধিতা করে, তারা মুনাফিক। তা কি সত্য?

হুজুর উত্তর দিলেন, হা, তা সত্য। তবে জিহাদ করতে হয়

কাফেরদের সাথে। আনোয়ার পাশা করছে বলসেভিকদের সাথে। বলসেভিকরা কি মুসলমান নয়, কেন তাদেরকে হত্যা করবে? তারা তো গরীবদের পক্ষে কথা বলে, তারা তো কমিউনিজম অর্থাৎ সমাজতন্ত্র মানতে বলে। আমরা যদি সমাজতন্ত্র মেনে নেই, তবে তো কোন দ্বন্দ্বই থাকে না। সমাজতন্ত্রের উপর বিশ্বাস করলেই কি একজন মুসলমান বেঈমান হয়ে যায়? তাহলে আনোয়ার পাশা কার বিরুদ্ধে জিহাদ করবে? আমরা কি তার চেয়ে কুরআন-হাদীস কম বুঝি?

আমি আবার প্রশ্ন করলাম, হুজুর! ওরা তো মসজিদ-মাদ্রাসা, আলেম-ওলামা, টুপি-দাড়ির উপর চরম আঘাত হানছে। মা-বোনের ইজ্জত নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। মুসলমানদের বাড়ীঘর দখল করছে। বস্তিতে আগুন জ্বালিয়ে দিচ্ছে। তা কি ঠিক করছে? তারা কি জালেম নয়? ওদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরা কি ফরয নয়?

হুজুর উত্তর দিলেন, তারা দেশ শাসন করছে। তাদের হুকুম মানা তো ফরয। যারা হুকুমত না মানে, তারা হল বাগী। বাগীদের হত্যা করতে শরীয়ত নির্দেশ দিয়েছে। যারা সমাজতন্ত্র মানে না, তারা বড় ফেৎনাবাজ। তাদেরকে হত্যা করা ঈমানের দাবী।

আমি বললাম, আনোয়ার পাশা সম্পর্কে বিস্তারিত জানালে ভাল হত। হুজুর একটু রেগে বললেন, আনোয়ার পাশা সম্পর্কে জানে না এমন লোক কমই আছে। সে মাদ্রাসার ভাল ভাল ছাত্রদের নিয়ে বেয়াদব বানাচ্ছে। এলমে দ্বীন শিক্ষা করা ফরয। আর সে ছাত্রদেরকে নিয়ে জিহাদের ট্রেনিং দিয়ে যুদ্ধে লাগাচ্ছে। এদের কি জীবনের কোন মূল্য নেই? এভাবে তো অনেক ছেলে নিহত হয়েছে। এসব ছেলে এখনো দ্বীন শিখেনি, আলেম হয়নি। এরা জিহাদের কি বুঝবে?

আমি বললাম, হুজুর! আলেম হওয়া ছাড়া কি জিহাদ করা যায় না? ছোটরা জিহাদ করলে কি জিহাদ হবে না? ছোট একটি ছেলে যদি সাপ হত্যা করে, তবে উপকার হবে কিনা? সাপ হত্যা করেছে বলে কি কেউ স্বীকার করবে না? ছোট ছোট বালকরা জিহাদে যেতে চেয়েছিল। হুজুর (সাঃ) তো তাদেরকে মন্দ বলেননি এবং এ কথাও বলেননি যে, তোমরা এলেম শিখে দ্বীন বুঝে জিহাদ করবে। তিনি শুধু এতটুকু বলেছেন, তোমরা আরো একটু বড় হও। তারপর জিহাদ করবে। আবার

অল্পবয়সী সাহাবাদের যুদ্ধে যাওয়ার অনুমতিও দিয়েছিলেন।

যেমন– হযরত আবদুর বিন ওমর (রাঃ), হযরত জায়েদ বিন ছাবেত (রাঃ), হযরত ওসামা বিন জায়েদ (রাঃ), হযরত জায়েদ বিন আকরাম (রাঃ), হযরত আমর বিন হাজাম (রাঃ), হযরত উছায়েদ বিন হোজায়ের (রাঃ), হযরত আরাবা বিন আউছ (রাঃ), হযরত আবু ছাঈদ বিন খুদরী (রাঃ), হযরত ছামুরা বিন জুনদুব (রাঃ), হযরত রাফে বিন খাদিজ (রাঃ) প্রমুখ।

কিশোর সাহাবাগণ যুদ্ধে যাওয়ার জন্য প্রতিযোগিতা করেছিলেন মহানবী (সাঃ)-এর সামনে। তিনি তো ধমক দেননি!

আমার কথায় হুজুর বিরক্ত হয়ে বললেন, বাবা! তোমার কথা আমি সবই বুঝি। জিহাদ ফরয তা মানি। কিন্তু আনোয়ার পাশার মত জিহাদ করা মানি না। কারণ, দেশে অনেক বড় বড় আলেম রয়েছেন। তারা কি বুঝেন না জিহাদ কখন করতে হবে? জিহাদ করলে আমীরের প্রয়োজন হয়। আনোয়ার পাশার আমীর কে? তার তো কোন আমীর নেই। আবার জিহাদ করতে হয় সামনা-সামনি। আর সে করে চুপি চুপি চোরের মত। সে বীর-বাহাদুর হলে সামনা-সামনি আসছে না কেন?

সে গোপনে কোন এক এলাকায় হামলা করে কিছু সৈন্য হত্যা করে চোরের মত পালিয়ে যায়। তারপর লাল ফৌজরা ঐ এলাকায় গিয়ে নিরীহ-নিরপরাধ মুসলমানদের উপর নির্যাতন চালায়, হত্যা করে। এর জন্য তো আনোয়ার পাশাই দায়ী।

আমি বললাম, হুজুর! আবু বাছির (রাঃ) সিরিয়াগামী রাস্তায় পাহাড় উপত্যকায় একা একা ব্যবসায়ী কাফেলার উপর আক্রমণ করেছেন। তিনি প্রকাশ্যে যুদ্ধ করেননি। তাহলে তাকে কি ফতোয়া দেবেন? তাছাড়া তার তো কোন আমীর ছিল না। তাহলে কি তার এভাবে গোপনে ও আমীর ছাড়া জিহাদ করাটা অন্যায় হয়েছে? এ ধরনের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে নবীর জামানায়। তখন নবী (সাঃ) বর্তমান ছিলেন।

হুজুর রাগে-ক্ষোভে অস্থির হয়ে বললেন, দেখ, সাহাবাদের সাথে আনোয়ার পাশার কোন তুলনা চলে না। এ ধরনের কথা বলা চরম বেয়াদবী। আমার অকাট্য প্রমাণাদিতে নিরুত্তর হয়ে তিনি

আবোল-তাবোল উত্তর দিতে লাগলেন।

আমি হুজুরকে আবারও প্রশ্ন করে জানতে চাইলাম, আপনি বলেছেন জিহাদ করতে হলে আগে ঈমান মজবুত করতে হবে। আমার প্রশ্ন হল, ঈমান মজবুতের মাপকাঠি কি? ঈমান মজবুতের মাপকাঠি যদি বড় আলেম বা বড় মুফতি হয়, তাহলে আপনাদের মত বড় বড় আলেমদের তো ঈমান অনেক পাকাপোক্ত হয়েছে। তবে ভীরু কাপুরুষের মতো মুখ গুজে ঘরে বসে আছেন কেন? পাকা ঈমান নিয়ে সম্মুখে দাঁড়িয়ে জিহাদ করা দরকার। আর যদি বলেন, আলেম হলেই ঈমান পাকা হয় না, তবে বলব, এসব ফালতু কথা বলে উম্মতকে জিহাদ থেকে ফিরিয়ে রাখবেন না।

এমন কিছু ছাহাবা ছিলেন, যারা ঈমান আনার সাথে সাথে যুদ্ধে চলে গেছেন। তারপর যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে গেছেন। হুজুর (সাঃ) তাদেরকে জান্নাতী হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন। তারা ঈমান আনার পর অন্য কোন আমল করার সুযোগ পাননি। তাহলে ঐসব সাহাবা কি ঈমানহারা অবস্থায় জিহাদ করেছেন?

আবার কোন কোন ছাহাবা জিহাদের ময়দানে ঈমান এনে সেখানেই কাফেরদের হাতে নিহত হয়েছেন। তাহলে কি এদের আমল বিনষ্ট হয়ে গেছে? তারা কি শহীদের মর্যাদা পাবে না? কাজেই, আপনাদের খোড়া ও কাল্পনিক যুক্তির দ্বারা মুসলমানরা বিভ্রান্ত হচ্ছে। এর পরিণাম হবে খুবই খারাপ। কাজেই, এ সমস্ত মিথ্যা যুক্তি দিয়ে যুবকদেরকে দাবিয়ে রাখা শয়তানী ছাড়া কিছুই নয়। আমার কথায় হুজুরগণ বিরক্ত হয়ে চলে গেলেন। আমি একটু বিশ্রাম নেয়ার জন্য অফিসেই শুয়ে পড়লাম।

[একত্রিশ]

আমি প্রত্যুষে ঘুম থেকে জেগে অযু-এস্তেঞ্জা সেরে নামায আদায় করে মাদ্রাসা থেকে বেরিয়ে এলাম। কোথায় যাব কি কবর খুব চিন্তায় পড়ে গেলাম। আজকের দিনটি অন্যদিনের মতো মনে হলো না। কেমন যেন এক নীরবতা বিরাজ করছে। চারদিকে কেমন যেন এক হাহাকার নিরানন্দ ছড়িয়ে আছে। কারো মুখে হাসি নেই। দিবালোকে যেন আঁধার হাবুডুবু খাচ্ছে।

পাখীরাও যেন গান গাইতে ভুলে গিয়ে সমবেদনায় অংশ নিয়েছে। পশুরাও যেন কোন্ বিরহে ঘাস খাওয়া ভুলে গিয়ে কি যেন ভাবছে। সমীরণ দিকে দিকে কার যেন বিদায়ের বাণী বহন করে ছুটে বেড়াচ্ছে।

আমি আনমনে একা একা হেঁটে চলছি আর ভাবছি, একি আমার বেদনাতুর হৃদয়ের খেয়াল মাত্র? নাকি বাস্তবতার সাথে এর কোন মিল রয়েছে? আনোয়ার পাশার বাড়ী এখান থেকে আট কিলোমিটারের মতো দূরে। মনস্থির করেছি পায়ে হেঁটেই যাব, কাঁচাপথে রিকশায় যাওয়া খুবই কষ্টকর। তাই পায়ে হেঁটে যাচ্ছি। আর কিছু পথ অতিক্রম করলেই আন্দরাবাদ বাজার। সেখানে নাস্তা করে একটু বিশ্রাম নিয়ে যোহরের সময় আনোয়ার পাশার বাড়ী উঠব। আন্দরাবাদ থেকে তার বাড়ী মাত্র দু'কিলোমিটার।

দশটার দিকে আমি আন্দরাবাদ এসে হাজির হলাম। পেটে প্রচণ্ড ক্ষুধা। তাই খানা খাওয়ার জন্য একটি হোটেলে ঢুকলাম। হোটেলে লোকজনের বেশ ভীড়। কারণ জানার জন্য একটু এগিয়ে গেলাম। সেখানে দেখি, পেপার নিয়ে কাড়াকাড়ি চলছে। আমি বুঝতে পারলাম, হয়ত বড় ধরনের কোন খবর এসেছে, তাই আজকের পেপারের এত টানাটানি।

আমি এসব চিন্তা বাদ দিয়ে খানা খেয়ে নিলাম। তারপর বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলাম, নিকটে কোন বুকস্টল বা সংবাদপত্র বিক্রয়কেন্দ্র আছে কিনা? লোকটি হাতের ইশারায় দেখিয়ে দিলেন। আমি কয়েক কদম এগিয়ে 'আখবারে নও' নামক একটি পত্রিকা ক্রয় করে একটি প্রাইমারী স্কুলের পাশে দেবদারু বৃক্ষের ছায়ায় বসে পড়তে লাগলাম।

পত্রিকাটির হেড লাইনে বড় অক্ষরে লেখা 'বলসেভিকদের হাতে তাসকন্দ, সমরকন্দ, বুখারা, তাজাকিস্তান, উজবেকিস্তান ও তুর্কমেনিস্তানের পতন।' তাছাড়া অন্য এক কলামে লেখা 'শত শত মুজাহিদ বলসেভিকদের হাতে বন্দী ও শতাধিক নিহত।' অপর এক কলামে লেখা, 'আনোয়ার পাশার বাহিনীর সাথে বলসেভিক ও লাল ফৌজদের তুমুল লড়াই'।

এ মর্মান্তিক সংবাদে আমার শিরার স্পন্দন স্তিমিত হয়ে আসছে। অশ্রুতে বুক ভেসে যাচ্ছে। প্রতিশোধের বহ্নিশিখা দাউ দাউ করে জ্বলছে। অশান্তির মহাপ্লাবন ভাসিয়ে নিয়ে গেল আমার জীবনের সব আশা-ভরসা। যা আমি বরদাস্ত করতে পারিনি, যা দেখতে চাইনি, যা শুনতে চাইনি, আজ তা-ই ঘটতে যাচ্ছে।

আমি কোন দিন ভাবতেও পারিনি এতবড় বড় মাদ্রাসা আর এত বড় বড় আলিম থাকতে, লাখ লাখ মুসলমান যুবক জীবিত থাকতে, এত এত ছাত্র-শিক্ষক-দ্বীনদার ও পরহেজদার লোক বেঁচে থাকতে ইসলামের বিপর্যয় ঘটবে!

আমি মাঠের কোণে বসে থাকতে থাকতেই সর্বস্তরের জনসাধারণ আনন্দ মিছিল নিয়ে রাস্তায় নেমে এল। 'মৌলবাদ নিপাত যাক, রুহানীরা ধ্বংস হোক' শ্লোগানে আন্দরাবাদের আসমান-যমিন কাঁপিয়ে তুলছে। এ মিছিলে অংশগ্রহণ করেছে কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতী, পুরুষ-মহিলা ও বৃদ্ধ-বৃদ্ধা। এরা সবাই মুসলমানদের সন্তান। একটু পরে আরো একটি মিছিল আমার পাশ দিয়ে চলে গেল। এরা সবাই আলেম সমাজের কলংক, নামধারী আলেম ও ছাত্র-জনতা। তাদের মুখেও একই শ্লোগান, দুনিয়ার মজদুর এক হও, কেউ খাবে আর কেউ খাবে তা হবে না তা হবে না, কমিউনিজম দিচ্ছে ডাক মৌলবাদ নিপাত যাক।

মুসলমানের মুখে এমন ঈমান বিধ্বংসী শ্লোগান শুনে আমার দিলে একীন হয়ে গেল, এ জাতির ধ্বংস অনিবার্য। আলেম-ওলামা ও মুসলমানরাই এ ধ্বংস ডেকে আনছে। নিজেরাই গোলামীর জিন্দেগী এখতিয়ার করে নিয়েছে। এ জাতিকে রক্ষা করা আর সম্ভব নয়। এদেশে আর বসবাস করা জায়েয নয়।

রাগে-ক্ষোভে অস্থির হয়ে আমি আনোয়ার পাশার বাড়ীতে চলে গেলাম। তখন বিকেল ৪টা। আঙ্গিনায় দাঁড়িয়ে কয়েকবার উচ্চস্বরে সালাম দিলে এক মহিলার কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে আসল ওয়াআলাইকুমুস সালাম। তারপর গৃহাভ্যন্তরে থেকে একটি কিশোর বেরিয়ে এসে আমাকে নিয়ে গেল মেহমানখানায়। অযু করে আছরের নামায আদায় করলাম।

আমার নামায শেষ হতে না হতে ছেলেটি খাবার এনে দস্তরখানে হাজির করল। আমার খানাপিনা তো ভেতরে ঢুকছে না। তবু মেজবানের ইজ্জত রক্ষার খাতিরে কিছু খেতে হয়। ভেতর থেকে আনোয়ার পাশার স্ত্রী নাজিয়া আস্তে আস্তে বললেন, মুসাফির ভাই! আমাদের ঘরে কোন পুরুষ লোক নেই। তাই কে তোমাকে যত্ন সহকারে খাওয়াবে? তুমি নিজে নিজে তৃপ্তির সাথে আহার কর।

কি আতিথেয়তা! কত সুন্দর আপ্যায়ন! আমি আজ একজন মুজাহিদের মেহমান হতে পেরে আনন্দে আত্মহারা। এমন ভাগ্য ক'জনের জোটে। বহু আশা-আকাঙ্খা ও চেষ্টার পর আজ আমি আনোয়ার পাশার মেহমান হতে পেরেছি বলে নিজেকে ধন্য মনে করলাম।

আমি মনের আনন্দে খেতে লাগলাম। নাজিয়া আবার কোমল সুরে বললেন, ওহে মুসাফির! তুমি পেট পুরে আহার কর। তারপর তোমার সাথে আলাপ হবে। আমি আমার সাধ্যমত খেয়ে বললাম, আমি আর পারছি না। কিশোরটি এসে বাকি খাবার নিয়ে গেল।

এবার সেনানায়ক আনোয়ার পাশার স্ত্রী নাজিয়া আমাকে প্রশ্ন করলেন, মুসাফির ভাই! তোমাকে তো অত্র এলাকার লোক বলে মনে হয় না। তুমি কোথা থেকে কি উদ্দেশ্যে এসেছ?

আমি বললাম, তা অবশ্যই বলব। আমি আমার পরিচয় দিয়ে অতীতের কিছু কর্মকাণ্ডের ইতিহাস আলোচনা করে এখানে আসার কারণ জানালাম। নাজিয়া আমার কথায় খুবই খুশী হলেন এবং বললেন, হে পথিক! তুমি সঠিক স্থানে এবং সঠিক সময়ে এসেছ। দু'দিনের মধ্যেই তোমাকে ময়দানে পাঠিয়ে দেব। তুমি যদি সকালের দিকে আসতে, তাহলে আজই পাঠিয়ে দিতে পারতাম। কারণ, ময়দান থেকে একজন ঘোড়সওয়ার আজই একটি পত্র নিয়ে এসেছিলেন। তিনি দুপুরের পূর্বেই পত্রটি রেখে চলে গেছেন। দু'একদিনের মধ্যে ময়দান থেকে লোক আসবে। ওদের সাথে তোমাকে পাঠিয়ে দেব। রাহবার ছাড়া সেখানে যেতে পারবে না।

আমি আরজ করলাম! পত্রটি কি আমাকে দেখানো যাবে?

নাজিয়া মুচকি হেসে বলল, হ্যাঁ, যাবে না কেন। এই বলে তিনি

লেফাফাবৃত একটি পত্র আমার নিকট পাঠিয়ে দিলেন। আমি আনোয়ার পাশার নিজ হাতের লেখা পত্রটি হাতে নিয়ে কয়েকবার চুমু খেয়ে খুলে পড়তে লাগলাম–

(খুনরাঙ্গা রণাঙ্গন থেকে নাজিয়ার নিকট আনোয়ার পাশার আখেরী চিঠি)

প্রিয় নাজিয়া!

খুনরাঙ্গা পিচ্ছিল পথ যুদ্ধের ময়দান থেকে তোমাকে জানাই আমার ভালবাসা ও শুভেচ্ছা। আশা করি বিশ্ব নিয়ন্ত্রণকারী মহাপরাক্রমশালী রাব্বুল আলামীনের রহমতে সবাইকে নিয়ে ভাল আছ। বিভীষিকাময় রক্তঝরা যুদ্ধের ময়দান থেকে কামনাও করি তাই। আমিও মহান রাব্বুল আলামীনের রহমতে ও দেশবাসীর দোয়ায় ভাল আছি এবং একের পর এক হামলা চালিয়ে যাচ্ছি। আমার সাথীরা শহীদ হচ্ছে, বন্দী হচ্ছে বটে; কিন্তু বলসেভিক ও লাল ফৌজদেরকে শৃগাল কুকুরের মতো হত্যাও করছে।

প্রিয় নাজিয়া! আমি আমার রবের পক্ষ থেকে মদদ ও নুছরত পেয়েছি শতবার। আর আমার স্বজাতি অধিকাংশ আলেম-ওলামা ও দেশবাসীর পক্ষ থেকে আঘাতের পর আঘাত পেয়েছি লক্ষবার। সমস্ত মুসলমান আজ আমাকে বা আমার বাহিনীকে বয়কট করেছে। তারা আমাকে কোন ধরনের সাহায্য-সহযোগিতা করছে না। আমি আজ অল্পসংখ্যক মুজাহিদ ও সামান্য সরঞ্জামাদি নিয়ে জিহাদের ময়দানে কাতরাচ্ছি। আমাদের খোঁজ নেয়ার মতো দেশে কোন আলেম ও মুসলমান নেই।

ওগো আমার প্রিয়তমা নাজিয়া! তোমার মতো আবেদা, ছাবেরা ও সুন্দরী স্ত্রীকে পেয়ে আমি গর্বিত। আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান বলে মনে করছি। তুমিও আমাকে হৃদয় উজাড় করে ভালবেসেছ।

ওগো মোর হৃদয়ের প্রশান্তি! দাম্পত্য জীবনে খুব অল্প সময়ই তোমার সঙ্গে কাটানোর সুযোগ হয়েছে। খুব অল্প সময় বাহুবন্ধনে মধুর রজনী অতিবাহিত করেছি।

প্রিয় নাজিয়া! আজ আমার হৃদয় সরোবরে শিউলির মতো তোমার কায়া, তোমার মায়া, তোমার ছায়া, তোমার দয়া ভেসে

বেড়াচ্ছে। আমার আঁখি দর্পনে শুধু তোমারই প্রতিচ্ছবি ভাসছে। তুমি তো জান, কার হুকুম মানতে গিয়ে, কার সন্তুষ্টি অর্জন করতে গিয়ে আজ তোমার বাহুবন্ধন ও নরম বিছানা ত্যাগ করে পাহাড়-জঙ্গলে, কংকরময় স্থানে, সাপ-বিচ্ছু আর হিংস্র প্রাণীদের সাথে বসবাস করছি। যতদিন দ্বীনকে বিজয়ী করতে না পারব, মা-বোনদের ইজ্জত রক্ষা করতে না পারব, মুসলমানদের জানমাল-ইজ্জতের নিরাপত্তা বিধান করতে না পারব; ততদিন আমার জিহাদ অব্যাহত থাকবে। হয়ত গাজী হয়ে তোমার কাছে ফিরে আসব, না হয় চরম কাঙ্খিত শাহাদাতের অমৃত সুধা পান করে জান্নাতের হুর-গেলমানদের সাথে মিলিত হব।

প্রিয় নাজিয়া! এটাই যদি হয় আমার জীবনের শেষ চিঠি আর এগুলোই যদি হয় আমার শেষ লিপি, এ-ই যদি হয় তোমার সঙ্গে আমার শেষ কথা; তবে তুমি আমাকে আল্লাহর ওয়াস্তে ক্ষমা করে দিও। আবার তোমার-আমার মিলন ঘটবে জান্নাতে। সেখানে তুমি রাণীর আসনে সমাসীন হবে।

ওগো মোর নাজিয়া! আমি যদি শহীদ হয়ে যাই, আর তুমি যদি ইচ্ছা কর দ্বিতীয় বিবাহ করতে, তাহলে আমার ভাই নূরী পাশাকে বিবাহ করে দাম্পত্য জীবনের সুখ-শান্তি উপভোগ করো। হয়ত আমার অভাব তার দ্বারা পূরণ হবে।

প্রিয় নাজিয়া! অনেক কথা বলার ছিল। কিন্তু ময়দানে প্রচণ্ড লড়াইয়ের কারণে সময় পেলাম না। তাই অনেক কথাই না বলা রয়ে গেল। দোয়া করি, তুমি সুখে থাক, শান্তিতে থাক, আল্লাহর খাছ বান্দীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাক। আল্লাহ হাফেজ।

ইতি
তোমারই
আনোয়ার পাশা।

পত্রখানা পাঠ করে আমি কেঁদে অস্থির হয়ে গেলাম। আমার মুখ থেকে কোন কথাই নির্গত হচ্ছিল না। পত্র পাঠে আমার অন্তরে প্রতীতি জন্মাল যে, হয়ত আনোয়ার পাশা বিশ্ববাসীকে কাঁদিয়ে শাহাদাতের শরাব পান করবেন। হয়ত এটাই তার জীবনের শেষ পত্র।

আমার কান্নার আওয়াজ শুনে অন্দর মহল থেকে নাজিয়া প্রশ্ন করলেন, মুসাফির! তুমি অমন করে কাঁদছ কেন? আমি তৎক্ষণাৎ তার প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে পারলাম না। এভাবে বাকি দিন ও রাত পার করলাম। চোখে কোন ঘুম নেই। কখন আনোয়ার পাশার সাথে সাক্ষাৎ করব, কথা বলব, এটাই ভাবছি।

পরদিন বিকেল বেলা এক অশ্বারোহী ঘোড়া হাঁকিয়ে এসে সংবাদ দিয়ে গেল, আনোয়ার পাশা শাহাদাতবরণ করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

❑

[প্রথম খণ্ড সমাপ্ত]